বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা খেলাঘর

শিল্পের দর্শন সংখ্যা

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই– সেপ্টেম্বর ২০০৮

প্রকাশকাল
১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শাহাবুদ্দিন-এর ‘পেগাসাস’ অবলম্বনে

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মূল্য
১৫০.০০ টাকা
১৫০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

মানুষ একমাত্র চিন্তাশীল প্রাণী। যদিও সে চিন্তার দিক থেকে পরিশীলিত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। মানুষকে যথার্থ চিন্তাশীল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে, প্রয়োজন পড়ে সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে উপযুক্ত সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

শিল্পে নন্দন বা সৌন্দর্য থাকবেই; কিন্তু শিল্পীর শিল্পকর্মে যদি কোনো চিন্তা বা মতাদর্শ না থাকে তাহলে সেই শিল্পকর্ম জীবনবাদী বা কল্যাণমুখী হয় না। কী ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শে শিল্পীর অবস্থান, তার ওপর নির্ভর ক'রে একজন শিল্পীর শিল্পকর্মে তার চিন্তা বা মতাদর্শ প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পীর এই চিন্তা বা মতাদর্শই হচ্ছে শিল্পের দর্শন। যে-শিল্পদর্শনের একটা রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি থাকা আবশ্যক।

শিল্পদর্শন হচ্ছে জনগণের মুক্তির দর্শন; শিল্পী যদি মতাদর্শিকভাবে দুর্বল হন, তখন তার পক্ষে জনগণের মুক্তি ঘটাতে পারে এমন শিল্প তথা মহৎ-শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

মতাদর্শের লালন ও চর্চার জন্য শিল্পীর প্রয়োজন সংগঠন। একমাত্র সংগঠন পারে শিল্পীর মতাদর্শকে দৃঢ়তম হওয়ার পরিবেশ করে দিতে। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো ইজম বা মতবাদ যেন শিল্পীর সৃষ্টিশীল-সত্তাকে স্থূল ছকে বেঁধে ফেলতে না পারে; এক্ষেত্রে শিল্পকর্মের প্রচার-মাধ্যমগুলো কোন্ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে কাজ করছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বজুড়ে শিল্পের সকল শাখার মধ্যেই চিন্তাশূন্যতা চলছে। এর প্রধান কারণ মানুষের ভেতর থেকে তার মতাদর্শকে অনেকটাই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে; এ জন্য আমরা সরাসরি পুঁজিবাদকেই দায়ী করব; কারণ পুঁজিবাদ এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিটি মানুষ যাতে নিজের থেকেই নিজেকে পণ্যে পরিণত করতে বাধ্য হয়, সেই পথ তৈরি করে দেয়।

আমাদের দেশে সহজ ও অতিপ্রচারের ফলে শিল্পের গুণগত দিকটির উৎকর্ষতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। আবার বিদেশি শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্য থেকে খারাপ ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো এসে দিন-কে-দিন আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির মহৎ গুণগুলোকে গ্রাস করে ফেলছে; আমরাও আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সর্বোপরি দেশপ্রেমকে হারাতে বসেছি যেন চিরতরে। এ-সব কারণেও শিল্প দর্শনশূন্য হয়ে পড়ছে।

শিল্পের দর্শন নতুন কোনো বিষয় না-হলেও আমাদের মধ্যে এ-বিষয়ে বিভ্রান্তির শেষ নেই; নতুন প্রজন্ম এবং অন্যরা, চলমান সেই বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যাতে জানতে পারেন– এবং সঠিক পথ বেছে নিতে পারেন– সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'হালখাতা'র এ-সংখ্যা প্রকাশ করা হল ।

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক
১৫.০৯.২০০৮

সম্পাদকীয়: দুই

শিল্প ব্যক্তি-মানুষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করে; শিল্পের এই প্রভাব ব্যক্তিকে ইতিবাচক দিকে নিয়ে যাবে এমন সবসময় না-ও হতে পারে; শিল্পের প্রভাব ব্যক্তিকে নৈরাশ্যবাদী ও বৈরাগ্যবাদীও করে তুলতে পারে । যে নৈরাশ্য ও বৈরাগ্যবাদের মূল ভিত্তি হল ভাববাদ । ভারতে এই ভাববাদের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 'উপনিষদ' সাহিত্যে ।

ভাববাদ, 'উপনিষদ' সাহিত্য দিয়ে শুরু করে তার অনায়াস থাবা বিস্তৃত করেছে আমাদের এ যুগেরও কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রশিল্প, চলচ্চিত্র, নাটকসহ শিল্পের সকল শাখার অন্তর অবধি । এ কালে ভাববাদী শিল্প হল সেই প্রক্রিয়া, যার কেন্দ্রীয় ভূমিকা, নিজের মনগড়া যুক্তির দ্বারা বিমূর্ত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা । উল্লেখ্য, ইয়োরোপের প্রভাব বিমূর্ততাকে আমাদের শিল্পে আরও দৃঢ় অবস্থান করে নিতে পরিবেশ করে দিয়েছে । এই বিমূর্ততা একইসঙ্গে বহুজনকে কমুনিকেট করার দাবি জানালেও, এর বাস্তবতা ভিন্ন রকম: বিমূর্ততার লক্ষ হল এক ধরনের অস্বচ্ছ অবস্থার সৃষ্টি করা; এটা করা হয় স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয় থেকে সত্যকে আড়াল করার কৌশল হিসেবে এবং জনগণের চিন্তা ও আবেগকে অনৈক্যের মধ্যে রাখার ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে । সকল শিল্পী এটা যে বুঝেসুজে করেন তা কিন্তু নয় । অনেক শিল্পী এটা করেন আরেক জন করছেন সেটা দেখে-দেখে এবং এটাকেই নিয়ম বলে কেউ-কেউ মেনে নেন ।
ভাববাদী শিল্প শ্রেণীভিত্তিক সমাজে প্রাধান্য পাবেই; একই কারণে ভাববাদী শিল্প শ্রেণীভিত্তিক সমাজকে উৎসাহিত করে থাকে । ফলে ভাববাদী বিমূর্ত শিল্পের বাধ্যবাধকতা হল শ্রেণীভিত্তিক সমাজের শাসক-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা ।

শিল্প কীভাবে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে?; রস আস্বাদনকারীদের কাছে শিল্পকে বিমূর্ত করে তোলা; জনগণ যাতে এর মর্মার্থ বুঝতে না পারে শিল্পকে সেভাবে

উপস্থাপন করা; এভাবে শিল্পের মর্মার্থকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা; সর্বোপরি রাষ্ট্র যারা চালায়– তারা অসন্তুষ্ট হতে পারে এমন শিল্প সৃষ্টির সকল সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলা।

আমাদের চারপাশে এত অধিক পরিমাণ বিমূর্ত শিল্পের প্রকাশ– প্রমাণ করে আমাদের গন্তব্যটা আসলে কোন দিকে। আমাদের দেশে কমিউনিজমের নামে বিশেষ করে কোনো কোনো প্রবন্ধ-লেখক ধর্মের বিরুদ্ধে অনেকটা অন্ধভাবে লিখে পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। এভাবে দেশে মৌলবাদের ক্ষেত্র তৈরিতে এরা সহযোগিতা করেছেন।

অনেক মৌলশিল্পের মর্মার্থকেও বোঝার এতটুকু প্রয়োজন অনুধাবন করেননি কথিত এ সকল কমিউনিস্ট শিল্পী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী; এদের ছকেবাঁধা মুখস্ত কিছু প্রথাগত ভীতিকর বুলি, বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এরা এভাবে কমিউনিজমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ইসলামের ঠিক বিপরীত জায়গায়; ফলে এদেশের মুসলমানদের কাছে 'কমিউনিস্ট' আর 'কাফের' একই অর্থে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে করে কোনো কোনো কথিত শিল্পী, বুদ্ধিজীবী নায়ক বনে গেছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছেন, কিন্তু আমরা যারা জনগণ– আমরা যারা মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন আশা করেছিলাম– আমাদের ক্ষতি হয়েছে সীমাহীন। নানা কারণে এদেশের হিন্দুদের হৃদয় ভেঙে খান-খান হয়েছে; জন্মভিটার শেষ মায়াটুকু ছেড়ে বিতাড়িত হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এসকল কথিত কমিউনিস্ট শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন প্রায় উদাসীন।

আমাদের এখানে যারা কবিতা-গল্প-উপন্যাস লেখেন, চলচ্চিত্র-নাটক তৈরি করেন, গান লেখেন, সুর ও কণ্ঠ দেন– এদের মধ্যে অনেকেরই প্রয়োজনীয় আবেগ ও ইচ্ছা থাকে, হয়তো সৃষ্টিশীলতা এবং অভিজ্ঞতাও থাকে; কিন্তু ইতিহাস, রাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় কিছু পড়াশুনা ও গাইডলাইনের অভাবে এদের শিল্পীসত্তা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে রাজনৈতিক চিন্তার স্বচ্ছতা না থাকায় এদের মধ্যে একসময় স্থবিরতা এসে যায়; ফলে বেশিদূর পর্যন্ত এদের চেষ্টা আগায় না। বয়স বেশি হলে তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনেকে আবার লজ্জায় চুপচাপ থাকেন।

যাদের পড়াশুনা ও চিন্তার স্বচ্ছতা থাকে তাদের মধ্যে কেউ-কেউ সবকিছু বুঝেও অর্থাভাবে কখনো আবার অর্থলোভের বশবর্তী হয়ে আদর্শচ্যুত হন। আদর্শচ্যুত শিল্পীদের মধ্যে কারও অনুশোচনাবোধ থাকে আবার অনেকের সেটাও থাকে না।

শিল্প স্বাধীন; এমন স্বাধীন যে একটা কিছু করলেই শিল্প হয়ে যায়; এর কোনো জবাবদিহিতার প্রয়োজন নেই, কোনো বৈশিষ্ট্য এর দরকার হয় না– এ রকম কথা ব'লে একটা শ্রেণী নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে ফাঁকি দেন, আরেকটা শ্রেণী ষড়যন্ত্রের চোরাবালির ফাঁদ তৈরি করেন। এদের মধ্যে কেউ-কেউ দু-একটা উন্নত শিল্প সৃষ্টি করে ফেলেন হয়তো, পুরস্কার-পদকও পেয়ে থাকেন; বাংলাদেশে এদের সংখ্যাই হয়তো বেশি। এরা যে ভাববাদের আওতায় থেকে নিকৃষ্ট মানের পুঁজিতন্ত্রের পথ অবলম্বনকারী তা-ও এরা বোঝেন না; এটা যারা বুঝেসুজে করেন তারা নিজেদের পুঁজিতন্ত্রের অনুসারী বলে দাবি করতে গর্ব বোধ করেন এমনও নয়; কিন্তু নিজেদের চিন্তার পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছাও এদের মধ্যে দেখা যায় না; এদেরই অবস্থান উন্মোচন করা 'হালখাতা'র এ-সংখ্যা প্রকাশের উদ্দেশ্য। এটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
১৫.০৯.২০০৮

সূচি

'ফিল্যানথ্রপি' সংখ্যার প্রতিক্রিয়া

ফিল্যানথ্রপি সংখ্যা: সুনির্দিষ্ট ও সমীহজাগানো লক্ষ্য
হা সা ন অ রি ন্দ ম ৯

হালখাতায় ফিল্যানথ্রপি: কটু-বাস্তবতা উন্মোচন
জা হি দ সো হা গ ১২

প্রবন্ধ

বাংলা কবিতা: মূলধারার দর্শন
য তী ন স র কা র ১৫

সাক্ষাৎকার

প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী মাত্রই নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করেন
সি রা জু ল ই স লা ম চৌ ধু রী ৩২

প্রবন্ধ

শিল্প-সাহিত্যে উত্তরাধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদ ও রেনেসাঁস
আ বু ল কা সে ম ফ জ লু ল হ ক ৪৭

অনুবাদ

মার্কসবাদ ও শিল্পের সমাজদর্শন/ গর্ডন গ্রাহাম
শ ও ক ত হো সে ন ৭০

প্রবন্ধ

শিল্প ও পরধনতন্ত্র
স লি মু ল্লা হ খা ন ৭৭

শিল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ
খা লি কু জ্জা মা ন ই লি য়া স ৮১

শিল্পের দর্শন: ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিরই দ্বারা
ফ রী দু ল আ ল ম ৮৬
প্রসঙ্গ শিল্পদর্শন
শা হ্ আ ল ম সা রো য়া র ৯৮
শিল্পের দর্শন: জীবনের সত্যানুভূতি
ম জি দ মা হ মু দ ১০২
শিল্পের লক্ষ্য: একটি দার্শনিক বিতর্ক
সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দ্দা র ১০৫
শিল্পের দর্শন: সংবেদনশীলতা ও অন্যান্য
শা হ দ ত হো সে ন ১১৭

প্রবন্ধ
ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্শন
আ মি নু ল ই স লা ম ১২৩
ডা. লুৎফর রহমানের প্রবন্ধ-সাহিত্যে মানবতাবাদী দর্শন
ই স রা ই ল খা ন ১৩৬

প্রবন্ধ
কবির বিশ্বাস ও কবিতার বস্তুভিত্তি
শা ন্ত নু কা য় সা র ১৪৮
উপন্যাসের দর্শন
সৈ য় দ আ জি জু ল হ ক ১৫০
স্থাপত্যশিল্পের দর্শন
র বি উ ল হু সা ই ন ১৫৬
বাংলার শিল্পচর্চা: গীতি, নাট্য ও দর্শন
সা ই ম ন জা কা রি য়া ১৬৪
প্রয়োজন, সম্পর্ক ও কবিতা
শ ও ক ত হো সে ন ১৭০

সাক্ষাৎকার
শিল্প নিজেই একটি দর্শন
আহমাদ মোস্তফা কামাল ১৭৮

অনুগদ্য
আচরণের শিল্পদর্শন
ফেরদৌসী সুলতানা ১৮৯
জীবন-শিল্পের দর্শন
বিভানূর মুন্সী ১৯৩
সাধারণের শিল্প ও তার দর্শন
মোহাম্মদ আলী ১৯৬
শিল্পে ভাবনার তাড়না
অমিতা চক্রবর্তী ১৯৮
শিল্পভাবনা: অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামোর নিরিখে
অপর্ণা হাওলাদার ২০০

ফিল্যানথ্রপি সংখ্যা: সুনির্দিষ্ট ও সমীহজাগানো লক্ষ্য

হাসান অরিন্দম

হালখাতার ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা হাতে পেয়ে প্রথমেই মনে হয়েছে বাজারকাটতি বিষয়ের প্রতি লোভকে সংবরণ করে এ পত্রিকা সুনির্দিষ্ট ও সমীহজাগানো লক্ষ্য নিয়েই পদসঞ্চালন করছে। এ সংখ্যার বিষয় *ফিল্যানথ্রপি*, শব্দটিকে এখনও অবশ্য বাংলা ভাষা যথেষ্ট নিজের করে নিতে পারেনি বা নেয়নি। সম্পাদক তার বক্তব্যে শব্দটি গ্রহণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব রেখেছেন সময়ই তার জবাব দেবে। তবে সমগ্র পত্রিকাতেই এর বাংলা প্রতিশব্দ এড়িয়ে গিয়ে উক্ত মূল শব্দটি ব্যবহার করে এ সংখ্যার নামকরণের যথার্থতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সত্যিই যদি জনহিতৈষণা, লোকহিতৈষণা, বদান্যতা, দানশীলতা প্রভৃতি শব্দ ফিল্যানথ্রপির অর্থকে ধারণ বা প্রকাশ না করতে পারে তবে এ শব্দ কৃতঋণরূপে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হতেও পারে।

ফিল্যানথ্রপি: সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নামক লেখায় অনুপম সেন ফিল্যানথ্রপির প্রাচ্য ঐতিহ্য, এনজিও-র ভূমিকা, ক্ষুদ্রঋণের কার্যকারিতা আলোচনা করেন। রচনার তৃতীয় অংশে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন তা যে-কোনো মঙ্গলকামী মানুষকে সংক্ষুব্ধ করে তোলে। *হালখাতা* এ পর্যন্ত যতগুলো সাক্ষাৎকার ছেপেছে সেগুলোর মধ্যে বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে আলাপচারিতাটি অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর বক্তব্যের বেপরোয়া ভঙ্গি, স্পষ্টভাষিতা আর সাহস এখানেও উপস্থিত। তিনি মনে করেন ফিল্যানথ্রপি ব্যাপারটি কালচার-সংশ্লিষ্ট, কেউ যদি শিল্প-সাহিত্য চর্চা করেও দুরাচারী হয় তবে সে লো-কালচারের লোক। এনজিও-র ভূমিকা নিয়ে উমরের বক্তব্য, অনেক বিষয়ে আমাদের গোড়া থেকে ভাবতে বাধ্য করায়। এ সম্পর্কে তাঁর কথাকে কেউ কেউ একপাক্ষিক হয়তো ভাবতে পারেন, বিশেষত অনেক সমালোচনামূলক বক্তব্যেরই ব্যাখ্যা এখানে আসেনি। যেমন, 'এনজিওর ধারা ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণা থেকে সম্পূর্ণ একটি আলাদা বিষয়। এনজিওর সেক্টর তৈরি হয়েছে বদমায়েশির জন্য।' মিথ্যাবাদী সম্পর্কে তিনি যে পরিসংখ্যানটি দিয়েছেন তার ভিত্তি যাই হোক একে বাস্তব বলেই মনে হয়েছে। সত্যিই– মিথ্যা বলা যে অনুচিত সে-কথা

পণ্ডিত-মূর্খ কোনো লোকই অন্তর থেকে আজ আর মানে না, মিথ্যেকে আমাদের সমাজের বেশিরভাগ লোকই অপরিহার্য সঙ্গী করে নিয়েছে।

'এই যুগে সৎ লোক বলতে বোঝায়, ফিন্যানশিয়ালি যে চোর নয়। কিন্তু এটা হচ্ছে লোয়েস্ট কাইন্ড অব অনেস্টি। আর্থিকভাবে সে অনেস্ট হয়েও অন্যদিক থেকে ডিজঅনেস্ট হতে পারে।' বদরুদ্দীন উমরের এই সংক্রান্ত বক্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে এই দিকটা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারীদের মুখেও এখনও অনুচ্চারিত। আমার মনে হয় এ আলোচনায় জনাব উমরের সবচেয়ে বিতর্কযোগ্য উক্তি হল 'এটা তো বহু পুরনো ভণ্ডামী; বলা হয়ে থাকে যে শিল্পের জন্য শিল্প।' অনেকেই জীবনের জন্য শিল্প' তত্ত্বে বিশ্বাসী হতে পারেন, কিন্তু বদরুদ্দীন উমরের এ উক্তিতে তারাও বিস্মিত হবেন নিঃসন্দেহে, কারণ এর পাল্টা মতটি যে কতখানি শক্তিশালী –শিল্পসাহিত্য জগতে বিচরণকারী মাত্রই তা জানেন। এ নিয়ে এখানে কথা বলছি না এজন্যই যে বিষয়টি নিয়ে একটি প্রবন্ধ নয়, ঢাউস-ঢাউস বই লেখা সম্ভব, এ যাবৎ বিভিন্ন ভাষায় লেখাও হয়েছে অনেক, বদরুদ্দীন উমর কি শিল্পের সে স্বীকৃত আদৃত আদর্শটিকে এক কথায় নাকচ করে দিতে পারেন? কেননা রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়াও মানুষের মনোজাগতিক অনেক বিষয়েরই মুক্তির বিষয় সেসব শিল্পে হয়তো থাকে, সেগুলোর সবটাই কিন্তু সমাজবাদের বিরুদ্ধে যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোনো কবিতা বা গানের আসরে কিংবা নাট্য অডিটোরিয়ামে, পেইন্টিং এক্সিবিশনে বা কোনো সিনেমা প্রদর্শনীতে উমর সাহেবদের দেখা গেলে অন্তত তরুণ সমাজ উৎসাহই বোধ করত। পক্ষান্তরে এদেশের শিল্পাঙ্গন যে বহু রকম ব্যবসায়ী ও ভাঁড়ে পূর্ণ হয়ে আছে তার ফলাফল নিয়ে নিশ্চয়ই এদেশের চিন্তাবিদরা ভাবেন কিন্তু এদের কেউই দায়িত্ব নেন না, পাছে এদের ব্যক্তিত্বকে তত্ত্ব থেকে উঠে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। এদেশে এনজিও আর ব্যবসায়িরাই যেন শিল্পের প্রধান সমঝদার, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের রাজনীতিতে আজ ক্রিয়াশীল। কাজেই দায়িত্বও নেয়ার ব্যাপার রয়েছে বলে আমি মনে করি।

বদিউর রহমানের *জনহিতৈষণা ভাবনার* প্রথমেই ধর্মীয় দৃষ্টিতে জনহিতৈষণাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন '...ইহজাগতিক ভাবনাই লোকহিতৈষণার মূল উৎস। ধর্মীয় নির্দেশে বাধ্যবাধকতামূলক যে দান তাকেও লোকহিতৈষণার বাইরে রাখা যায় না।' আমরা লক্ষ করি এই সংখ্যাতেই একাধিক লেখক এর বিপরীত বক্তব্য দিয়েছেন। শোয়েব শাহরিয়ার লিখেছেন *ফিলানথ্রপি; সাহিত্যে ও পুরাণে*। রচনাটি উৎকৃষ্ট তবে পুরাণ বলতে পাঠক এখানে কেবল পাশ্চাত্য পুরাণই পেয়েছে, ভারতীয় পুরাণের প্রসঙ্গ আসেনি। ফরীদুল আলমের প্রবন্ধে ফিল্যানথ্রপির অর্থনীতি নয়, সংস্কৃতি প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলেন, 'জনসাধারণকে সুসংস্কৃত করা– তাদের মনে জ্ঞান, স্বাধীনচিন্তা, বিচারশক্তি, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণকে বিকশিত করা হচ্ছে একজন ফিল্যানথ্রপিস্ট-এর অবশ্য কর্তব্য।' এখানে লেখক ব্যাখ্যা করেন

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের দীনতার কারণ। পরবর্তী আলোচনায় লেখক আরও স্পষ্ট করে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন, 'বিত্ত, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করে; বিরোধ ক্ষতি এবং শাস্তির ভয়কে উপেক্ষা করে যে মনীষীরা সাধনার ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকতে সমর্থ, তারাই সংস্কৃতির যথার্থ রক্ষক– তারাই প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট।' ফরীদুল আলম মনে করেন বেশিরভাগ এনজিও জনকল্যাণের ছদ্মবেশে প্রতারণামূলক মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। *ফিল্যানথ্রপি: মোটিভ বিশ্লেষণ* আলোচনায় হালখাতার মুখোমুখি হয়েছেন মঈন চৌধুরী ও আনু মুহাম্মদ। মঈন চৌধুরী দার্শনিক ও ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে বিষয়টিকে দেখেছেন অন্যদিকে আনু মুহাম্মদ আলোকপাত করেছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এনজিও সম্পর্কে আনু মুহাম্মদের বক্তব্যটি অনেকাংশেই বদরুদ্দীন উমরের সাথে মিলে যাওয়ায় পাঠকও এ বিষয়ে যথার্থ ভাবনাটি গ্রহণ করতে অনেকটাই সংশয়মুক্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আনু মুহাম্মদের এই বক্তব্যটি উদ্ধরণীয়: 'ফজলে হাসান আবেদ বা মুহম্মদ ইউনুস– ওনারা তো প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই সকল ক্ষমতার মালিক হয়ে আছেন; অর্থাৎ একজন সালমান এফ রহমান যে মালিক তার সাথে ওনাদের কোনোই পার্থক্য নেই।' জাকির তালুকদারের রচনা *লোকহিত? কোন লোক? কিভাবে?*-এর যে শিরোনাম তার সাথে বিষয়বস্তু মিলাতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। রচনার অর্ধেক অংশের কথাবার্তা চলেছে মিথ প্রসঙ্গ ধরে। এতে লেখক জ্ঞানের বহর প্রকাশে যতখানি সমর্থ হয়েছেন বিষয়ের গভীরে ঢুকতে তাকে ততটাই অনীহ মনে হয়েছে। 'ঋত' শব্দের ভূমিকার সঙ্গে উপসংহারের সম্বন্ধ স্থাপনই যেন এখানে লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল। তাড়াহুড়ো করে তিনি সেদিকেই ধেয়েছেন। মাঝখান থেকে নিরীহ পাঠকের পক্ষে কিছু জ্ঞানবৃদ্ধির খানিক সুযোগ ঘটেছে বটে। আহমাদ মোস্তফা কামাল লোকহিতৈষী কাজ সম্পর্কে গতানুগতিক কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। তার তত্ত্ব, তথ্য বা উপস্থাপনায় কোনোক্ষেত্রেই বিশেষত্ব লক্ষ করা যায় নি। সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দারের লেখায় ফিল্যানথ্রপির মৌলিক দার্শনিক দিকগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে। শাহাদুজ্জামানের সাক্ষাৎকারটি পড়েও মনে হয়েছে তাকে তো সেরকম কোনো প্রশ্ন করা হয়নি, নাকি প্রশ্নগুলোর গতানুগতিক জবাব দিয়েছেন তিনি? জয়নাল আবেদীন তার তথ্যসমৃদ্ধ রচনার মাধ্যমে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ফিল্যানথ্রপিস্টের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছের, যে কাজটি আরও ব্যাপকভাবে করা প্রয়োজন। ফেরদৌসী সুলতানা আত্মনিষ্ঠ ধাঁচে লেখেন, সহজ-সাদা ভাষায় বাস্তব কিছু ঘটনা ও বিষয় বর্ণনা করেন যা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। ফলে অতি সাধারণ পাঠকও তার লেখার সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারেন। তবে এ-জাতীয় রচনাতেও ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ থাকে; লক্ষণীয় যে, 'অবদমন সংখ্যা'র লেখাটির ভাষার তুলনায় এ সংখ্যায় তার ভাষা অনেক সংহত হয়েছে।

মাসুদুল হক তার প্রবন্ধে ভারতীয় লোকাচার এবং রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিল্যানথ্রপিকে তুলে ধরেন। বিভানূর মুন্সীর লেখাটি তেমন সুচিন্তিত বা সুপরিকল্পিত

মনে হয়নি। এটির শিরোনাম *জাতিসত্তায় ফিল্যানথ্রপি*, অথচ রচনাটিতে সে-সবের সুস্পষ্ট গভীর বিশ্লেষণ নেই, আছে কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবনার অভিব্যক্তি। গভীর রচনা হয়ে ওঠার উপাদান তার লেখায় রয়েছে, যা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় সেগুলোর ভালো সমন্বয় দাবি করে। বার্জার এ. পিয়ারসনের অনূদিত লেখাটি এ সংখ্যার অত্যন্ত গুরুত্ববহ রচনা। কারণ এ প্রসঙ্গসমূহ অন্য কোনো রচনায় বা বক্তব্যে আসেনি। এ অনুবাদে শওকত হোসেন আড়ষ্টতাকে অনেকটাই এড়াতে পেরেছেন। হালখাতার পূববর্তী সংখ্যাগুলোর মতো এ সংখ্যার প্রচ্ছদ অতখানি নজরকাড়া হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমার ধারণা, কেননা চিত্রশিল্প যে আমি খুব বুঝি তা নয়। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাঁতরে হালখাতার সামগ্রিক অগ্রসরমানতা সত্যিই আনন্দের। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিরিয়াস পাঠককে আকৃষ্ট করেছে এ পত্রিকা, নতুন কিছু পাঠকও তৈরি হয়েছে এর মধ্যে। রইল সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা এবং পরবর্তী সংখ্যার জন্য প্রতীক্ষা...।

হাসান অরিন্দম
গল্পকার
প্রভাষক, সরকারি কে.সি কলেজ, ঝিনাইদহ।

হালখাতায় ফিল্যানথ্রপি: কটু-বাস্তবতা উন্মোচন

জা হি দ সো হা গ

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র 'ফিল্যানথ্রপি' সংখ্যা এমন এক রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রকাশিত হল যার সাথে ১/১১ পরবর্তী শাসকবর্গের চরিত্র উদঘাটনে– আমার বিবেচনায়– একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্র জনগণের মনের মধ্যে তাদেরই অবচেতনে ক্রিয়াশীল। গত এক দশকে রাজনীতিকে মার্জিনের

বাইরে রেখে সুশীল-এনজিও'র যে 'শাদা মুখ' শাসনকাঠামোর মূল অংশে জড়ানোর মতলব চরিতার্থ হচ্ছে তার পেছনে সমাজসেবা তথা ফিল্যানথ্রপির ব্যানারে নানা প্রকল্প বিদ্যমান ছিল এখনো আছে। এই নয়াবর্গ নিজেদের একটি আদর্শরূপ প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে থেকে জনগণের মনে সুপারম্যানিজম হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে; তাদের এই নাক-গলানো পরোপকার ছাড়া যেন কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। এই উপকার গেলাবার জন্য ক্যান্টনমেন্টকেও সারেঙ্গি হিসেবে দেখা যায়। তারা নিজেদের বানোয়াট ফিল্যানথ্রপিকে এক ধরনের দেশপ্রেম বলেও চালিয়ে দিচ্ছে। 'হালখাতা'র 'ফিল্যানথ্রপি' সংখ্যায় এই কটু-বাস্তবতা সর্বাংশে উন্মোচিত না হলেও উন্মোচনের বিবিধ চিহ্ন রয়েছে বিশেষত বদরুদ্দীন উমরের সাক্ষাৎকারে।

ফিল্যানথ্রপির পারিভাষিক শব্দ হিসেবে অধিকতর ব্যবহার করা হয়েছে 'লোকহিতৈষণা' শব্দটি। পাশাপাশি লেখকদের লেখায় দেশহিতৈষণা, মানবপ্রেম, জনসেবা ইত্যাদি শব্দেরও বহুল ব্যবহার দেখা যায়, যা বাংলা একাডেমীর অভিধানে উল্লেখ রয়েছে। বাংলা একাডেমীর অভিধানে যে শব্দসমূহ রয়েছে সেগুলোর সাথে অবশ্য 'ফিল্যানথ্রপি' শব্দটির কোনো যোগ নেই। আমরা বিদেশী শব্দকে অসচেতনতাবশত দেশীয় সাংস্কৃতিক বোধ থেকে অনুবাদের চেষ্টা করি; একই কথা মার্কস্ও বলেছেন; ফলে অনেক ক্ষেত্রে মূল ভাষার বোধকে ধরতে ব্যর্থ হই। এক্ষেত্রে এম. এম. আকাশ তার প্রবন্ধে ফিল্যানথ্রপির সংজ্ঞা নির্ধারণে সমস্যার কথা বলেছেন। তিনি এর অর্থ হিসেবে 'বদান্যতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যাকে আমরা সহজে 'করুণা' বলে ফেলতে পারি; আমরা ফিল্যানথ্রপির যে ইতিহাস পাই তা হয়তো এমনই। কৃষিভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রম বিভাজনের সাথে সাথে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছিল তার দীর্ঘ মুনাফা-দৌড়ে পিষ্ট নিম্নবর্গের মধ্যে উদ্ভূত বিক্ষোভ প্রশমনে একটা ভারসাম্য তৈরি করার লক্ষ্যে শাসকবর্গের এই করুণার প্রয়োজন ছিল। যার ধারাবাহিকতাতেই আধুনিককালে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ফাউন্ডেশন গড়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যার অস্তিত্ব থাকে না বলে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন। এম. এম. আকাশ লিখেছেন "ফিল্যানথ্রপি" বা বদান্যতার মহত্ত্ব তখনই চরিতার্থ হয় যখন বদান্যতার অর্থ হয় বদান্যতার প্রয়োজন বিলুপ্ত করা।" এই কথার মধ্যে একটু ঋষি-ক্যাচাল থেকে যায়, কারণ বদান্যতা যারা করে থাকেন তারা সমাজের শোষক-শ্রেণী আর বদান্যতার প্রয়োজন দেখা দেয় সমাজে বৈষম্যের কারণেই। ফলে বদান্যতা কখনই বদান্যতার অবসান ঘটাতে পারে না। আর ফিল্যানথ্রপি সম্পর্কে 'কোনো কিছু পাওয়ার আশা ছাড়াই মানুষের কল্যাণে যা কিছু করা হয় তা-ই 'ফিল্যানথ্রপি', এটি বায়বীয় কথা। যেহেতু কার্যের পেছনে অবশ্যই কারণ নিহিত থাকে; এখানে বৃহৎ পুঁজি বা ধনিক শ্রেণী পরিচালিত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আর রমা চৌধুরী বা পলান সরকার যা করেছেন তার সাথে পার্থক্য কোথায়? এই পার্থক্য এম. এম. আকাশ অনেকাংশে উন্মোচন করেছেন তাঁর লেখায়।

বদরুদ্দীন উমরের সাথে 'হালখাতা'র এক প্রাণবন্ত আলোচনায় উঠে এসেছে ফিল্যানথ্রপির বিভিন্ন দিকসহ বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও বৈপ্লবিক রাজনীতির নানাবিধ সংকট এবং উত্তরণের নানা উপায়ও। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে একজন ব্যক্তি ফিল্যানথ্রপিক কাজ করতে পারে কিনা– হালখাতার এই জিজ্ঞাসায় উমর বলেছেন, 'সমাজতন্ত্র তো হচ্ছে মানুষের চিন্তার একটি উচ্চতম পর্যায়। মানুষ যে স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে অন্যের উপকার করতে চায় তারই উচ্চতম সাংগঠনিক রূপ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।' অন্যত্র তিনি এনজিও'র কর্মকাণ্ডকে ফিল্যানথ্রপিক বলতে নারাজ, কারণ তা সাম্রাজ্যবাদীদের জনস্বার্থ বিরোধী প্রপাগান্ডার নিম্নতম সাংগঠনিকতা। তবে এই আলাপচারিতায় ফিল্যানথ্রপি নিয়ে পাঠকের মনোজিজ্ঞাসার কোষ্ঠ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। হালখাতা ফিল্যানথ্রপির স্বরূপ উন্মোচনে যতটা নজর দিয়েছে মান্যবর উমর যেন এই ব্যাপারটিকে কিছুটা বিরক্তির সাথেই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। হালখাতার এ সংখ্যাটির প্রবন্ধ শুরু হয়েছে অনুপম সেনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে। এই বিশ্লেষণটি আর্ন্তজাতিক পরিসরেও আলোচিত হয়েছে। বিশেষত টঘউঝঈঙ, ঋঅঙ, ডঐঙ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো যে ফিল্যানথ্রপিক কাজ করছে তা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোরই দাতব্য-রাজনীতিবান্ধব। এদের কর্মকাণ্ড একটু খতিয়ে দেখলেই এর সত্যতা মেলে।

'হালখাতা'র এই সংখ্যায় আরো লিখেছেন বদিউর রহমান, শোয়েব শাহরিয়ার, ফরীদুল আলম, মঈন চৌধুরী, জাকির তালুকদার, আহমাদ মোস্তফা কামাল, সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, জয়নাল আবেদীন, ফেরদৌসী সুলতানা, মাসুদুল হক, বিভানূর মুন্সী। এছাড়াও পাশ্চাত্য ফিল্যানথ্রপির প্রাচীন উৎস সন্ধানে বার্জার এ. পিয়ারসন'র একটি প্রবন্ধের অনুবাদ করেছেন শওকত হোসেন। রয়েছে শাহাদুজ্জামানের ফিল্যানথ্রপির কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করা যায় তা নিয়ে আরও একটি সাক্ষাৎকার। চিন্ত াশিল্পে হালখাতার মূল্য অনেক এ কথা অনস্বীকার্য। অপরদিকে সংগ্রহে রাখার মতো কাগজ হওয়া সত্ত্বেও এর মূল্যের কারণে অনেকের পক্ষে এটি ক্রয় করা কষ্টসাপেক্ষ। এই দিকটি আমার মতো অনেক পাঠকেরই হয়তো সমান মনোবেদনার কারণ হয়েছে।

জাহিদ সোহাগ
কবি, সাংবাদিক, মাদারীপুর।

প্র ব ন্ধ

বাংলা কবিতা: মূলধারার দর্শন

য তী ন স র কা র

আমরা, 'শিক্ষিত' মানুষজন, আসলে কতকগুলো দুর্মর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এগুলো 'আধুনিকতা'র কুসংস্কার। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাই আমাদের মস্তিষ্ককোষে সেইসব কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়ে নিদারুণ মানস-প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করেছে। সে রকম মানস-প্রতিবন্ধের দরুনই আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসকেও আমরা খণ্ডিত করে ফেলেছি, একটা খণ্ড অংশকেই সমগ্রের মর্যাদা দিয়েছি। বাংলা সাহিত্যের মূলধারা বলে আমরা ধরে নিয়েছি ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের সৃষ্ট সাহিত্যকে। এর বাইরে বিশাল বাংলায় গ্রামীণ কৃষিজীবী বা অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের মধ্য থেকে উঠে এসেছেন যে-সব কবি, শতকরা নব্বই জন মানুষ যাঁদের কবিতা বা গান তথা সাহিত্যের উপভোক্তা– তাঁদের তো আমরা গণনায়ই বিবেচনা করিনি। অথচ এঁরাই আবহমান বাংলার গণকবিতার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যের এক অদ্ভুত ইতিহাস আমরা রচনা করেছি। এবং এ-রকম অদ্ভুতত্ব কেবল সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, অন্যত্রও। ইতিহাসে 'আধুনিক' যুগ বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটির অবস্থান যেন সকল প্রকার ধারাবাহিকতার বাইরে। দেশের মাটিতে তার কোনো শিকড় বা উৎস নেই, দেশের বাইরে থেকে আনা কলমের চারা যেন তা। এই 'আধুনিক যুগ' যেন এক 'বৃন্তহীন পুষ্প'। এ যুগের নামকরণেও, তাই, বৃন্তহীনত্বের ও ধারাবাহিকতা-বর্জনের ছাপ। আগের যুগের নামগুলো ধর্মসাম্প্রদায়িকতা-চিহ্নিত– হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, মুসলিম যুগ। কিন্তু এর পরের যুগটি খ্রিস্টান যুগ নয়, ব্রিটিশ যুগ বা আধুনিক যুগ। ব্রিটিশ আর আধুনিক এখানে সমার্থক।

সাহিত্যের ইতিহাসেও প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ– এ-রকম যুগবিভাগ আমরা করেছি। রাজনৈতিক ইতিহাসে যাকে 'বৌদ্ধ-হিন্দু যুগ' বলা হয়েছে, সাহিত্যের ইতিহাসে সেটিই হয়েছে প্রাচীন যুগ, আর 'মুসলিম যুগ' হলো মধ্যযুগ। কেন যে এর নাম মধ্যযুগ, তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বাংলা সাহিত্যের কোনো ইতিহাসকার দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ইতিহাসকারদের ভাবনায় ভেতরে ভেতরে কাজ

করেছে ইউরোপ-মনস্কতা। ইউরোপের ইতিহাসে যেমন মধ্যযুগ আছে, সে-রকমই মধ্যযুগ থাকতে হবে আমাদের ইতিহাসে। ইউরোপের মধ্যযুগে ছিল ধর্মান্ধতার নিরেট অন্ধকার, আমাদের ইতিহাসকেও তারই সঙ্গে খাপে খাপে মেলাতে গিয়ে এখানেও বানানো হল এক মধ্যযুগ। ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটে আধুনিক যুগ এসেছে সেখানেই উদ্ভূত রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-এনলাইটেনমেন্টের মধ্য দিয়ে, কিন্তু আমাদের মধ্যযুগটির কোনো নড়ন-চড়ন নেই। অতঃপর এক সময় ইউরোপ থেকে আধুনিক ব্রিটিশরা আমাদের কাছে এল, শ্বেতমানুষেরা তাদের মহান দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিল, তাদের আধুনিকতা দিয়ে আমাদেরকে মধ্যযুগ থেকে টেনে তুলল! তাই এ-যুগ আমাদের ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগ, এবং ব্রিটিশ যুগই হলো আমাদের জন্য আধুনিক যুগ!

এই যে ইতিহাস, এর সবটাই মিথ্যা—এমন কথা অবশ্যই বলব না। শুধু বলব: সত্যের এক খণ্ডাংশই এ-ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে, এবং খণ্ডকেই অখণ্ড বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়। কেশের আড়ালে পাহাড় লুকানোর মতো করে খণ্ডের আড়ালে অখণ্ড এখানে চাপা পড়েছে। ইউরোপীয় আধুনিকতা আমাদের দেশে অবশ্যই এসেছে। সে-আধুনিকতায় আলোকিত হয়েছে নতুন-জেগে-ওঠা নগরে নতুন-সৃষ্ট এক মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী। সে-গোষ্ঠীসঞ্জাত তরুণরাই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে 'ইয়ং বেঙ্গল' হয়েছে, বহু বদ্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছে। ইউরোপীয় আধুনিকতার ধারাতেই আমাদের পূর্বতন সাহিত্যের থেকে গুণগতভাবে পৃথক এক বিশ্বমানের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আমাদের সাহিত্যে যে-যুগান্তর ঘটে গেল তাকে 'আধুনিক যুগ' বলতে আপত্তি করার কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। কিন্তু এই 'আধুনিক যুগ' যে দেশের বৃহত্তর ভূখণ্ডের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নাগালের বাইরে থেকে গেছে, সেই নির্মম সত্যকেও তো অস্বীকার করতে পারি না। এখন প্রশ্ন: এই নাগরিক মধ্যবিত্ত-অধ্যুষিত আধুনিকতার বাইরে গরিষ্ঠসংখ্যক কৃষিজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী মানুষগুলো কোন যুগে অবস্থান করছে? কালের বিচারে আধুনিক হয়েও ভাবের জগতে কি তারা মধ্যযুগেই রয়ে গেছে? না কি তারা নিজেদের মতো করেই নিজেদের আধুনিকতা সৃষ্টি করে নিয়েছে? নাগরিক মধ্যবিত্ত যখন ইউরোপীয় ধারায় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করছে, তখন কি পল্লীর মানুষের সাহিত্যের প্রবাহ একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেছে? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে সে-সাহিত্য কোন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য আমাদের অবশ্যই সংস্কারমুক্ত হতে হবে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকালেই আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা মননের ইতিহাসের প্রকৃত রূপটি আমরা অবলোকন করতে পারব। তখন দেখব: ব্রিটিশ রাজসৃষ্ট আধুনিক নগর ও নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে অবস্থিত বিশাল দেশ ও বিপুল জনসমষ্টিতে মননের ধারাপ্রবাহটি অত্যন্ত বেগবান রূপেই প্রবহমাণ থেকেছে। এবং আজও আছে। নিরক্ষর বা প্রায়-নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষেরা অশিক্ষিত নন মোটেই, মননশীলতাতেও তাঁরা শহুরে আধুনিক শিক্ষিতদের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো নন।

এঁদের ভেতর সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী মানুষের সংখ্যাও মোটেই কম নয়। এই মানুষেরা তাঁদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটান যে-সৃষ্টিকর্মে তা তো তাঁদের আশপাশের মানুষদের ভাব-ভাবনা-আশঙ্কারই ভাষারূপ। তাঁদের ভাব-ভাবনা আশপাশের মানুষদের ভাব-ভাবনা থেকে পৃথক নয় অবশ্যই, আবার পুরোপুরি অভিন্নও নয়। 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'র অধিকারী যাঁরা, তাঁদেরই তো বলে প্রতিভাবান। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা নিতান্তই অন্য দশজনের একজন নন, দশের বাইরে এগারো। তবু, এগারো হয়েও, দশের আশা-আশঙ্কা-আনন্দ-বেদনার তাঁরা অংশীদার। এবং সে-কারণেই সেই 'এগারো' 'দশ' কে অনায়াসে জানিয়ে দিতে পারেন যে 'আমি তোমাদেরই লোক'।

এই এগারো-স্বরূপ প্রতিভাবান কবি-শিল্পী-সাধকগণ প্রতিযুগেই চিরন্তন আধুনিকতাকে ধারণ করেছেন, অন্য দশজনকে সেই আধুনিকতার পথে চলার জন্য ডাক দিয়েছেন। আদিপর্ব থেকেই বাঙালি সমাজেও এ-রকম আধুনিকতার ধারক-বাহকদের আবির্ভাব ঘটেছে। চর্যাপদের কবি কিংবা দোহাকোষের সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে আমরা প্রবল ও প্রচণ্ড আধুনিকতাকে প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁদের আধুনিকতা ছিল একান্তই প্রতিবাদী ও বিপ্লবী। ব্রাহ্মণ্য এস্টাব্লিশমেন্টকে তাঁরা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, অভিজাতদের ধর্মদর্শন ও ধর্মানুষ্ঠানকে তাঁরা বিদ্রূপবিদ্ধ করেছেন। ব্রাহ্মণরা দাবি করতো যে তারা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 'মুখ' থেকে জন্ম নিয়েছে, সমাজে তাই তারা মুখ্য, তারা বর্ণশ্রেষ্ঠ। আর ক্ষত্রিয়ের জন্ম ব্রহ্মার বাহু ও বৈশ্যের জন্ম ব্রহ্মার ঊরু থেকে হওয়ায় তারা ব্রাহ্মণের সমান হতে পারে না কিছুতেই, বর্ণগত অবস্থানে তারা অবশ্যই গৌণ। সবার নিচে হচ্ছে শূদ্রের অবস্থান, কারণ তাদের জন্ম ব্রহ্মার পা থেকে। তাই শূদ্র কোনোরূপ সামাজিক মর্যাদা পেতেই পারে না, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের সেবা করেই তাদের তৃপ্ত থাকতে হবে। ব্রাহ্মণ-সৃষ্ট এ-রকম সামাজিক বিধানই মান্যতা পেয়ে আসছিল বহুকাল ধরে। কিন্তু সে-মান্যতা যে নিরঙ্কুশ ছিল না, ইতিহাসে তারও সাক্ষ্য আছে। লোকায়তিকরা, বৌদ্ধরা, জৈনরা, ব্রাহ্মণ্যবিধানকে অমান্য করে এসেছে খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই। সেই অমান্যতারই ধারা বহন করে এসেছেন এখন থেকে হাজার বছর আগেকার আদি বাঙালি সমাজের চর্যা ও দোহাকোষ-রচয়িতা কবিবৃন্দ। তাঁদের বক্তব্য ছিল মোটামুটি এ-রকম : কোনো এক সময় ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম যদি হয়েও থাকে, এখন ব্রাহ্মণদের জন্মপ্রক্রিয়ায় অন্য সকলের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই; এখন ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের জন্ম যেভাবে হয়, ব্রাহ্মণেরও হয় সেভাবেই। কাজেই এখন কেন ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ থাকবে? ব্রাহ্মণরা যে তাদের চার বেদের মহিমা প্রচারে পঞ্চমুখ, বেদকে যে তারা বলে অপৌরুষেয়, বেদপাঠের ফলেই যে তারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পেরেছে বলে গর্ব করে বেড়ায়– সে সবেরও কোনো ভিত্তিই নেই। বেদের অনেক কথাই অর্থহীন, বাজে কথা, বিশেষ করে চতুর্থ বেদ-বলে-প্রচারিত অথর্ববেদের তো কোনো প্রামাণ্যতাই নেই। আবার, সকল বেদকেই ব্রাহ্মণরা রেখেছে নিজেদের কুক্ষিগত করে। শূদ্রদের তো তারা বেদপাঠ বা শ্রবণের অধিকার

থেকেই শুধু বঞ্চিত করেনি, এর জন্য শাস্তিরও বিধান রেখেছে। বেদপাঠের দরুনই ব্রাহ্মণসন্তান যদি ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকারী হয়ে থাকে, তবে শূদ্র কেন বেদপাঠ করে ব্রাহ্মণ হতে পারবে না? আগুন জ্বেলে তাতে ঘি ঢেলে যজ্ঞ নামের যে-অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণরা, তাতে কারো কোনো লাভ হয় না, কেবল এর ধোঁয়ায় চোখের পীড়া হয় মাত্র।

এ-ধরনের কথা সবচেয়ে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন দোহাকোষের কবি সরহপাদ। অন্য অনেকে নানাভাবে নানা কায়দায় বলেছেন। বলা যেতে পারে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মই হয়েছে এ-রকম এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধী বক্তব্যকে ধারণ করে। এস্টাব্লিশমেন্ট যখন যত বেশি গণবিরোধী হয়েছে প্রাকৃতজনের কবি-শিল্পীরা তখন তত বেশি জনগণের অধিকারের পক্ষে দৃঢ়তর অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সৃষ্টিতে জনগণের মনের কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। দ্বাদশ শতকের বাংলায় বিভাষী সেনবংশীয় শাসকরা যখন সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে থাকে, দেশীয় প্রাকৃতজনের মাতৃভাষা বাংলার বিকাশকে রুদ্ধ করে দিতে চায়, এমনকি সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষায় পুরাণ বা শাস্ত্রকথা শ্রবণের বিরুদ্ধেও ধর্মীয় ফতোয়া জারি করে যখন, তখনও প্রাকৃতজনের কবিরা কর্তৃত্বশীলদের প্রতাপের সামনে শির অবনত করেননি। ব্রাহ্মণ্যবিধানের প্রতিবাদে তাঁরা সতত নিজেদের শাস্ত্রপুরাণ সৃষ্টি করে চলেছেন, পুরনো শাস্ত্র-পুরাণে নবতর ব্যাখ্যা-ভাষ্য সংযোজন করে তার নবায়ন ঘটিয়েছেন, অভিজাতদের তথাকথিত শিষ্টধর্মের বিপরীতে লোকধর্মের মুক্তধারায় অবগাহন করেছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় সেনরাজাদের পর ইসলামধর্মীয় সুলতানদের আমলেও যে এর ব্যত্যয় ঘটেনি তার প্রমাণ বাঙালি প্রাকৃতজনের হাতে 'লৌকিক ইসলাম'-এর সৃজন। লৌকিক হিন্দু, লৌকিক বৌদ্ধ, লৌকিক ইসলাম– এ-রকম সকল লৌকিককে নিয়েই গড়ে ওঠে বাঙালি জাতিসত্তা। এই লৌকিক অনভিজাত তথা প্রাকৃত বাঙালিই হচ্ছে প্রকৃত বাঙালি। এই বাঙালিরাই, অন্তত আঠারো শতক পর্যন্ত, বাংলাভাষায় যে-সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তাতে বিষয় ও ভাবনার বৈচিত্র্য ছিল অবশ্যই, তবে সে-সাহিত্য উপভোগ্য ছিল সকল বাঙালিরই। এমন কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বাংলায় রূপান্তরিত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-মহিমাজ্ঞাপক পদাবলি, চৈতন্যের জীবনী, নবী-রসুলদের চরিতকথা, দৌলত কাজি বা আলাওলদের রচিত রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী, –এবং এ-রকম সকল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজসভার অভিজাত পরিবেশে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, সে-সাহিত্যের উপভোগ্যতাও কেবল অভিজাতদের মধ্যে সীমিত থাকেনি। কিংবা অভিজাতরাও এমন কিছু সৃষ্টি করেননি বা করতে পারেননি যার মর্মগ্রাহিতায় অনভিজাতরা অক্ষম হবে। অর্থাৎ তথাকথিত মধ্যযুগের বাংলায় সামাজিক বৈষম্য যতই প্রকট থাকুক, মোল্লা-পুরুতের দাপট যতই অকরুণ হোক, সময়ে-অসময়ে সমাজের

নিম্নবর্গের মানুষের ওপর সমাজপতিদের উৎপীড়ন যতভাবেই নেমে আসুক– সে যুগের বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রাকৃতজনেরই ছিল আধিপত্য। সে-কালের বাংলার পণ্ডিত কবিরাও পাণ্ডিত্যের গজদন্তমিনারে আশ্রয় নিয়ে লোকসাধারণের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাননি; তাঁদের পাণ্ডিত্যের নির্ঝরে অপণ্ডিত লোকেরাও যাতে অনায়াসে স্নাত হতে পারে, সেদিকেই বরং সতত মনোযোগী ছিলেন এই পণ্ডিত কবিবৃন্দ। যেমন– নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কৃত্তিবাস তাঁর আত্মবিবরণীতে রামায়ণ-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

বাংলায় ভাগবত-রচয়িতা মালাধর বসুরও একই কথা–

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালী রচিয়া॥

এবং

ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।

বোঝা যায়: 'লোক বুঝাইতে' বা 'লোক নিস্তারিতে' 'লৌকিক করিয়া' 'লৌকিকের মতে' কবিতা সৃষ্টিই যে-যুগের কবিদের লক্ষ্য, সে-যুগে প্রাকৃতজন-সংস্কৃতজন নির্বিশেষে সকলের জন্য সাহিত্যের একটিই ছিল মূলধারা। তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের জল-অচল বিভাজন তখন সৃষ্টি হয়নি, কোনো কবিকে আলাদাভাবে 'লোককবি' বলে চিহ্নিত করার কথা কেউ ভাবতেই পারেনি, সকল কবিই ছিলেন সে-সময়ে লোকসাধারণের কবি।

দুই

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এই একক অভিন্ন ধারাটির বিলুপ্তির সূচনা ঘটে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, এবং উনিশ শতকে ঘটে তার পূর্ণ বিলুপ্তি। একালের সব কিছুই তৈরি হয়ে এল বিদেশী রাজার কাল থেকে, পণ্ডিতরাও বেরিয়ে এলেন বিদেশী বিদ্যার পাঠশালা থেকে। কবিরাও তা-ই। কবিদের সামনে এখন নতুন এক পাঠক সমাজ; সে-পাঠকরা কবিদের মতোই বিদেশী বিদ্যার পাঠশালার শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই 'লোক বুঝাইতে' বা 'লোক নিস্তারিতে' 'লৌকিকের মতে' কবিতা বা সাহিত্য রচনার দায় একালের কবিসাহিত্যিকরা বহন করতে রাজি হলেন না, একটি নির্বাচিত পাঠক সমাজের রসপিপাসার নিবৃত্তি ঘটানোই হলো তাঁদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা একেবারে অভিনব ও একান্ত সমৃদ্ধ সাহিত্যের সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারাপ্রবাহের সৃষ্টি করে ফেললেন। এ-ধারার সাহিত্য জাতীয় গণ্ডিভেদ

করে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে মননের ঐশ্বর্য আহরণ করতে মনোযোগী হল, বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মান অর্জনের প্রয়াস পেল এবং সে-প্রয়াস উত্তরোত্তর ফলপ্রসূও হতে থাকল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসাধারণ বঞ্চিত হয়ে রইল সাহিত্যের এই নতুন ধারাপ্রবাহে অবগাহন করার অধিকার থেকে। এ-রকম অধিকার-বঞ্চিত লোকসাধারণ রসপিপাসা-নিবৃত্তির জন্য কোন পথে অগ্রসর হল, তাদের মননচর্চা কোন কোন মাধ্যম বা রীতিপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করল, তারা অন্যতর কোনো সাহিত্যধারার সৃষ্টি করল কিনা, করে থাকলে সেটির প্রকৃতি ও স্বরূপই-বা কী এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন 'আধুনিক' 'শিক্ষিত' বাঙালি অনুভব করল না, –অন্তত নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টির প্রথম পর্বে তো নয়ই। তখনকার 'শিক্ষিত' বাঙালির দৃষ্টিতে ইংরেজ-অধিকারের পূর্বেকার বাংলা ছিল নিতান্তই স্থূল, অমার্জিত ও গ্রাম্য; সেই গ্রাম্যতার সকল উত্তরাধিকারকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত তারা সূক্ষ্ম, মার্জিত ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে চাইল। সদ্যলব্ধ নাগরিকতার দম্ভে তারা গ্রামীণ পূর্বপুরুষের সকল কৃতিকেই অস্বীকার করে বসল।

তবে, বিষয়টি অবশ্যই পুরোপুরি একমাত্রিক হয়ে থাকেনি। শিক্ষিত ও অনুভূতিপ্রবণ নাগরিকদের কেউ কেউ কখনো কখনো বিচ্ছিন্নতার বেদনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, এবং সে-বেদনা নিরসনের লক্ষ্যেই নাগরিকতা ও আধুনিকতার দম্ভ ও উন্নাসিকতাকে পাশ কাটিয়ে দেশীয় ঐতিহ্য সন্ধানে মনোযোগ দিয়েছেন, বিস্মৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে গোড়াতেই আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচেতনা-সমৃদ্ধ সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে যেতে দেখি সে-সময়কার বিশিষ্ট কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। ১৮৫২ সালের এপ্রিল মাসে হরচন্দ্র দত্ত নামক এক নব্যশিক্ষিত বাঙালি যুবা বাংলা সাহিত্যের প্রচুর নিন্দামন্দ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রবন্ধে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকরতার কথা তুলে ধরেছিলেন; তখনকার দিনে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর ও কবিগানের স্থূলতা ও রুচিহীনতা তাঁকে পীড়িত করেছিল, এ-সবকেই বাংলাসাহিত্যের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যরূপে অবলোকন করে এ-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এ-রকম হতাশ আত্মনিন্দার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে নগরবাসী নব্যশিক্ষিত সমাজেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে-সমাজেরই অন্যতম মুখপাত্ররূপে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সে-বছরের মে মাসেই 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামে যে-রচনাটি বিটন সোসাইটিতে পাঠ করেছিলেন সেইটি দিয়েই, বলা যেতে পারে, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের শুভ যাত্রারম্ভ। রঙ্গলাল দূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরাম ও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদক কৃত্তিবাস-কাশীরামের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অনেক রচনা যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের চেয়ে অনেক বেশি কুরুচিপূর্ণ সে-কথার বিশেষ উল্লেখ করে তিনি হরচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন। তবে ইতিহাস-আশ্রয়ী হলেও রঙ্গলালের এই প্রবন্ধে চণ্ডীদাস-

জ্ঞানদাসের মতো বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলির কাব্যসৌন্দর্য আলোচিত হয়নি। কিংবা বাংলা সাহিত্যের পুরো ইতিহাসও এতে বিধৃত হয়নি। তবু ওই প্রবন্ধটিতেই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-অনুসন্ধানেরও সূচনা ঘটে গিয়েছিল। পুরো ইতিহাস-উদ্ধারে অবশ্যি এরপর আরো অনেক সময় লেগেছিল। বিশ শতকে 'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর আবিষ্কার, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের ও বৈষ্ণবসাহিত্যের পুনরুদ্ধার, এবং মুসলিম কবিদের রচিত সাহিত্যের বিপুল সম্ভারকে জনসমক্ষে উদঘাটনের মধ্য দিয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ মনীষী সাহিত্যের ইতিহাসকারদের হাতে যে-সব উপাদান তুলে দিলেন তাই দিয়ে রচিত হল তথাকথিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। আর উনিশ-বিশ শতকের নাগরিক সাহিত্য নিয়ে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'। এ-রকম 'মধ্যযুগ' ও 'আধুনিক যুগ' নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং তাঁদের অনুসারী ও উত্তরসূরিদের হাতে রচিত হয়েছে ও হয়ে চলছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসকারদের প্রায় সবার দৃষ্টিতেই মধ্যযুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি হলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, আর আধুনিক যুগের প্রবর্তক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এঁদের মাঝখানে ঈশ্বরগুপ্ত হলেন 'যুগসন্ধির কবি'। 'প্রাচীন যুগের ভগ্নদূত ও আধুনিক যুগের অগ্রদূত' বলেও তিনি চিহ্নিত হয়ে থাকেন কখনো কখনো। ইতোমধ্যেই উদ্ভব ঘটে যায় বাংলা গদ্যের। উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই নবীন গদ্য বিচিত্রবিধ ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে। গদ্যই হয়ে ওঠে আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বাহন।

মোটামুটি এ-রকমই হল এতাবৎকাল-চর্চিত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ছক। কিন্তু বাংলার যে-সব কবি 'আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তে'র পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেননি বা করতে পারেননি, নগর পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে গানে ও কবিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির আর্তি ও প্রাপ্তির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন যাঁরা, বাংলা সাহিত্যের কোনো পর্বে বা অধ্যায়েই তাঁদের স্থান হল না। এঁরা যেন ত্রিশঙ্কু– না স্বর্গের, না মর্ত্যের। মধ্যযুগেরও নন, আধুনিকও নন।

অথচ এ-রকম কবিদের কৃতিকে একেবারে অস্বীকার বা উপেক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। উনিশ শতকের শেষ দু-দশকেই শিক্ষিত নাগরিক বাঙালিদের নজর পড়লো পল্লীর কবিদের দিকে। তাঁরা লক্ষ্য করলেন: পল্লীর এই কবিদের অনেকেই নিরক্ষর হলেও– কিংবা কেউ কেউ নিরক্ষরতার সীমা অতিক্রম করে সাক্ষরতার এলাকা স্পর্শ করলেও– তাঁরা কেউই ইংরেজের পাঠশালায় 'আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত' হননি। অথবা সংস্কৃত-আরবি ভাষার ধ্রুপদী শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে ধর্মদর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করেননি। একরকম 'অশিক্ষিত'ই বলা চলে তাঁদের। অথচ তাঁদের সৃষ্টিতে (কবিতায়-গানে) ও মননে কী অসাধারণ দ্যুতি! তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা না-নিয়েও তাঁদের

বচনে আধুনিকতার প্রকাশ কতই-না গভীর! 'বাউল' নামে পরিচিত কবিদের– বিশেষ করে লালন ফকির নামক এক কবির– সৃষ্টিতে গভীর মননশীলতা, দার্শনিকতা, চিরন্তন আধুনিকতা ও অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো আধুনিকোত্তম কবি-দার্শনিকও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। ক্রমে সে-বিস্ময় নাগরিক বুধমণ্ডলীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আবিস্কৃত হন লালনের মতোই আরো-আরো কবি। বিশ শতকে সে-আবিষ্কারের পরিধি অনেক প্রসারিত হতে থাকে। নব-আবিষ্কৃত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র মাধ্যমে নাগরিক পরিমণ্ডলের বাইরের অনক্ষর কবিদের বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়ে যান বিদেশের রসিকজনও। ময়মনসিংহের মনসুর বয়াতি নামক এ-রকমই এক অনক্ষর পলীকবি-রচিত 'দেওয়ানা মদিনা'র কাহিনী পড়ে 'অশ্রু সংবরণ' করতে পারেন না রম্যাঁ রলাঁর মতো বিশ্বনাগরিক মনীষীও।

তবু, যতই বিস্ময়কর প্রতিভা বলে বিবেচিত হোন না কেন, লালন ফকির কিংবা মনসুর বয়াতি কিংবা এ-রকম আরো সব নগরান্তবাসী প্রাকৃতজনের কবিদের কেউই 'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে' নাগরিক কবিদের সঙ্গে একই পংক্তিতে আসন গ্রহণের অধিকার পান না। তবে বিশ শতকে 'লোকসাহিত্য'-চর্চার প্রসারের সুবাদে ওই সব কবিদের জন্য অন্য একটি নিরাপদ স্থান নির্ধারণের ব্যবস্থা করে দেন বিদগ্ধ সাহিত্যশাস্ত্রীগণ। তাঁরা এঁদের জন্য বরাদ্দ করেন 'লোককবি' অভিধাটি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: লোকসাহিত্যের যে-সংজ্ঞা ও চরিত্র একালের সাহিত্যশাস্ত্রীগণ নিজেরাই নির্দেশ করেছেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তাঁরা কি কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট কবিকে 'লোককবি' আখ্যা দিতে পারেন? লোককবিতা তথা লোকসাহিত্য তো, তাঁরাই বলেন, লোকসমাজের সমবায়ী সৃষ্টি (Collective creation of the folk)। ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, সংগীত, কিংবদন্তি, রূপকথা ইত্যাদি যে-সব সৃষ্টি কোনো ব্যক্তি-রচয়িতার পরিচয় বহন করে না, লোকসাধারণের যৌথ বা সমবায়ী যে-সব রচনা বংশানুক্রমে শ্রুতিপরম্পরায় চলে এসেছে, সে-সবই লোকসাহিত্য (Folk literature is simply literature transmitted orally)। এ-রকম এক কষ্টিপাথরে বিচার করেই লোকসাহিত্য-তাত্ত্বিকরা লোকসমাজে রচিত ও প্রচলিত 'কবিগান'কেও লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বলে বিবেচনা করতে রাজি হন না। কারণ কবিগানের রচয়িতা একেক জন ব্যক্তিকবি [যদিও সেই কবি বা কবিয়াল আসরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মুখে-মুখেই (orally) কবিগান রচনা করে থাকেন]। ব্যক্তি-রচয়িতায় ভণিতাযুক্ত বলেই তত্ত্বসংগীতকে লোকসংগীত বা লোকসাহিত্য বলা হয় না। তাহলে লালন, দুদ্দু শাহ, পাগলা কানাই, হাছন রাজা, জালাল খাঁ কিংবা দ্বিজদাস, হরিচরণ, মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখ স্পষ্ট ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত কবিকে লোককবি বলা হবে কোন যুক্তিতে বা কোন নিরিখে? এ-ছাড়া এঁদের রচনা যে কেবল মুখে-মুখেই রচিত এবং শ্রুতিপরম্পরা-বাহিত, তা-ও নয়। এঁদের অনেকেই নিজে অথবা অন্য লিপিকারদের দিয়ে আপন

আপন রচনা কলমবন্দি করে রাখেন, অনেকেই মুদ্রিত রূপেও প্রকাশ করেন। তাই, এঁদের রচনাকে কোনোমতেই নৈর্ব্যক্তিক লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। তবু এঁরা লোককবি?

দেখা যাচ্ছে: 'লোককবি' কথাটিই একালীন সাহিত্যশাস্ত্র-সম্মত নয়। তাহলে ওই সব শক্তিমান কবিকে ও-রকম একটি অসঙ্গত আখ্যা দিয়ে অবমানিত করা হবে কেন?

তিন

'লোককবি'র প্রসঙ্গ নিয়ে আরো কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

এক শ্রেণীর কবিকে 'অবমানিত করা'র সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই 'লোককবি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে– এমন বললে নিশ্চয়ই তা হবে অতি সরলীকরণ। আসলে 'লোককবি' ছাড়া অন্য কোনো জুৎসই অভিধা এঁদের জন্য খুঁজে পাওয়াই শক্ত। একালের সাহিত্যশাস্ত্রীদেরও তাই নিরুপায় হয়েই এঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে 'লোককবি' শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, একালে ইংরেজি folk -এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হলেও আমাদের ভাষায় 'লোক' শব্দটির তাৎপর্য বহুমাত্রিক। সেই বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনায় রাখলে 'লোককবি' কথাটির একটি সদর্থক তাৎপর্য নিষ্কাশন করা যাবে এবং এক বিশেষ কবিবর্গকে 'লোককবি' আখ্যা দেবার যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

প্রাচীন ভারতে 'লোকায়ত' দর্শন বলা হয়েছে সেই দর্শনকে, যে-দর্শন বেদের প্রামাণ্যতা ও ব্রাহ্মণের আধিপত্য অস্বীকার করেছিল। যা 'লোকেষু আয়ত' অর্থাৎ লোকের ভেতর যা বিস্তৃত তাই লোকায়ত। 'লোক' শব্দের অর্থ এখানে দ্বিবিধ – ১. সাধারণ লোকজন বা লোকসাধারণ (public) এবং ২. ইহলোক বা বাস্তব ও পার্থিব (temporal) বিষয়। লোকসাধারণের মধ্যে যা বিস্তৃত, লোকসাধারণের চিন্তা-চেতনাকে যা ধারণ করে, এবং যা একান্ত ইহলোক-সম্পৃক্ত–সে রকম দর্শনই যদি হয় লোকায়ত দর্শন, তবে সে-রকম সাহিত্যও অবশ্যই লোকায়ত সাহিত্য। লোকায়ত সাহিত্য অর্থেই আমরা 'লোকসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। এবং এ-ক্ষেত্রে আধুনিক কালের ফোকলোরিস্টদের দেওয়া লোকসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ বা চরিত্রলক্ষণকে ('collective creation of the folk' এবং 'orally transmitted') অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়ার কোনো দায় আমাদের নেই।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণদের অভিজাত দর্শনের বিপরীতে যেমন ছিল লোকায়ত দর্শন, তেমনি অভিজাত ধর্মের প্রতিবাদে উদ্ভূত হয়েছিল নানা লোকায়ত বা লোকধর্মও। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম এবং এই দুটো ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্বে বা তাঁদের সমসাময়িককালে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রমণপন্থাও ছিল এ-রকমই লোকধর্ম। এ-সব লোকধর্মের অনুসারী লোকসাধারণ তাদেরই ভাব-ভাবনা নিয়ে,

তাদেরই আপন মাতৃভাষায়, সেই প্রাচীন কালেও যে-সাহিত্যের চর্চা করেছে– তা-ই ছিল সে-কালের লোকসাহিত্য। অভিজাত ব্রাহ্মণদের তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে লোকসাধারণের অবোধ্য কৃত্রিম ভাষা সংস্কৃতে, আর অনভিজাত লোকসাহিত্যের বাহন হয়েছে লোকসাধারণ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা। মৌখিক ও লিখিত– দু-রীতিতেই রচিত হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাকৃতজনের লোকসাহিত্য এবং এ-রকম লোকসাহিত্যের ওপর ভর করেই প্রাকৃত ভাষা এমন এগিয়ে যায় যে এক সময় সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য হয়ে পড়ে রুদ্ধস্রোত। প্রাকৃত ভাষারই স্বাভাবিক বিবর্তন থেকে সারা উপমহাদেশে উদ্ভূত হতে থাকে নানা ভাষা। সে-সব ভাষারই একটি বাংলা।

প্রাকৃত ও প্রাকৃতজ সকল ভাষার মতোই বাংলাকে যে জন্মলগ্ন থেকে অনভিজাত লোকসাধারণই লালন-পালন করে এসেছে এবং অভিজাত ক্ষমতাধররা যে একে আঁতুড়েই মেরে ফেলতে সচেষ্ট থেকেছে, তবু কয়েক শতাব্দী ধরে যে লোকসাধারণের সাহিত্য রূপেই বাংলা ভাষার রচিত সাহিত্যের জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে– এ-সব বিষয় আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। সে-সঙ্গে আমরা এ-ও দেখেছি: অন্তত আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার সাহিত্যের যে-অভিন্ন ধারাটি প্রবাহিত ছিল, উনিশ শতক থেকে সেটি আর অভিন্ন থাকেনি। বিদেশী শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি সংখ্যালঘু নাগরিক মধ্যবিত্তগোষ্ঠীর হাতে রচিত সাহিত্যেই তখন থেকে প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠে।

তবু নাগরিক সাহিত্যের এই নতুন ধারাটি যতই প্রতাপান্বিত হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যের সনাতন ধারাটির প্রবাহ কিন্তু কখনো রুদ্ধ হয়নি, আগের মতোই প্রাকৃতজন বা লোকসাধারণের মধ্যে তা যথারীতি প্রবহমান থাকে। বাংলার সনাতন ধারার এ-সাহিত্য যেহেতু একান্তরূপেই 'লোকায়ত', তাই 'লোক' কথাটির সনাতন অর্থের বিচারে তাঁদের 'লোককবি' অবশ্যই বলা যেতে পারে। তবে 'লোককবি' আখ্যা দিয়ে তাঁদের প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া একান্তই অন্যায়। বরং বলা উচিত : এঁরাই বাংলা সাহিত্যের সনাতন ধারার বা মূলধারার কবি।

উনিশ-বিশ শতকের 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের সমান্তরালে বহমান এই 'সনাতন' ধারার কয়েকজন কবির নামের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন ডক্টর সৈকত আসগর। {দ্রষ্টব্য : বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ'(কলিকাতা ১৯৯৫) পৃ: ৬১}। তালিকাটি এ-রকম: লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০), শীতালং শাহ (১৮০০-১৮৮৯), পাগলা কানাই (১৮০৯-১৮৮৯), দেওয়ান রশিদ (১৮৩০-১৯৪০), দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১১), নেধু শাহ (১৮৪৩-১৯৬৮), শাহ আরকুম (?), পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪), হাছন রাজা (১৮৫৫-১৯২২), শাহ আজাহার (আজাহার বয়াতি) (১৮৬৫-১৯৬০), রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭), মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪), মনোমোহন দত্ত (১৮৭৮-১৯১০), কানাইলাল শীল (১৮৯৫-১৯৭৪), ভবা পাগলা (১৮৯৭-১৯৮৪)।

এ-তালিকা অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ নয়। আসলে বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা এ-রকম কবিদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা রচনা করা খুবই কঠিন; প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। তবু সৈকত আসগর রচিত এই তালিকাটিকে মোটামুটি প্রতিনিধিত্বশীল বলে আমরা ধরে নিতে পারি। লালন শাহের থেকে ভবা পাগলা পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের শেষ অবধি সময়-পরিসরে যতসংখ্যক নাগরিক কবির অভ্যুদয় ঘটেছে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি কবি সক্রিয় থেকেছেন নাগরিক পরিমণ্ডলের বাইরে বৃহত্তম লোকসমাজে। শুধু সংখ্যায়ই এঁরা গরিষ্ঠ নন, বৈচিত্র্যও এঁদের রচনায় প্রভূত। সে-বৈচিত্র্য রূপেও যেমন, ভাবেও তেমনি। এঁদের কবিতা (তথা গান) নানাবিধ রূপাঙ্গিককে আশ্রয় করে এসেছে। সে-সবের মধ্যে কাহিনীধর্মিতা যেমন আছে, তেমনি আছে গীতিধর্মিতাও। কোনো কোনো রচনা নাট্যগুণ-সমৃদ্ধ, কোনোটাতে তত্ত্বধর্মিতা প্রবল। কোনোটা কল্পনার জগতের অভিসারী, কোনোটায় বিধৃত আকাঁড়া বাস্তবতা। ওই কবিদের কেউ কেউ রূপকথা ও ইতিহাসের জগতে যেমন অভিসার করেন, তেমনি অনেক কবি ভীষণভাবে আলোড়িত হন আপন আপন সমকালীন সমাজের সমস্যায়-সংকটে-সম্পদে-সম্ভাবনায়। তবে এসব কবিদের রচনায় সকল প্রকার আঙ্গিক ও ভাববস্তুই সকল বাঙালি লোকসাধারণের অনুভববেদ্য ও হৃদয়বেদ্য– ঠিক যেমনটি ছিল আগের শতকগুলোর কবিদের রচনা। তাই– উনিশ শতকে 'নাগরিক আধুনিক কবিতা'র ভিন্ন একটি ধারার উদ্ভব হওয়ার পরও– লোকসাধারণের ভেতরে সক্রিয় থেকে আবহমান বাংলা কবিতার সনাতন ধারাটিকে প্রবহমান রেখেছেন যে-কবিরা, সেই কবিদেরই কি মূলধারার কবি বলে গণ্য করা সংগত নয়? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে যে এই কবিদের বাংলা কবিতার সনাতন প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত না করে নিতান্ত ব্রাত্য বানিয়ে ত্রিশঙ্কু অবস্থানে রাখা হয়েছে, সেটি কি একান্তই অসংগত হয়নি?

চার

'আবহমান বাংলা কবিতার সনাতন ধারা' বলছি যাকে, তার 'সনাতন' শব্দটি স্থবিরতার দ্যোতক নয় নিশ্চয়ই। কিংবা নয় রক্ষণশীলতার সমার্থক বা 'প্রগতি' ও 'আধুনিকতা'র বিরোধী। চিরকাল ধরে চলমান যা, তা-ই তো সনাতন। যা চলমান, রক্ষণশীলতা তাতে বাসা বাঁধতে পারে না; তাই তা প্রগতির ধারক, আর প্রগতি ও আধুনিকতা তো অভিন্ন। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা কবিতার সনাতন ধারা এই প্রগতি ও আধুনিকতাকে অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে যেখানে এই ধারাটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় (অর্থাৎ ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ পর্যন্ত), প্রকৃতপক্ষে তারপরও যে এই ধারাটি অব্যাহত থেকেছে, অষ্টাদশ শতকে লালন শাহের অভ্যুদয়ই তার প্রমাণ। লালনের জন্মবর্ষ বলে নির্ধারিত হয়েছে ১৭৭৪ সালটি। ওই সালটিই রাজা রামমোহনেরও জন্মবর্ষ বলে কথিত। (অবশ্যি লালন ও রামমোহন উভয়েরই সঠিক

জন্মবর্ষ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবু এই দুজনের জন্ম যে কাছাকাছি সময়ে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।) রামমোহনের মৃত্যু ১৮৩৩ সালে। অন্যদিকে দীর্ঘজীবী লালন মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯০ সালে। অর্থাৎ প্রায় সমগ্র উনিশ শতক ছিল লালনের সৃষ্টি ও সাধনার কাল। রামমোহন অবশ্যই উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও আধুনিকতার পথিকৃৎ ছিলেন, এবং সে-শতকেই তাঁর উত্তরসূরি বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর দানে নাগরিক বাংলার মধ্যবিত্তের নবজাগরণ তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল। কিন্তু সেই একই সময়-পরিসরে গ্রামবাংলার নিম্নবর্গীয় লোকসাধারণের অবস্থা কেমন ছিল? তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত নয়া সামন্ততন্ত্র, ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের মার খেয়েছে, নতুন বিজ্ঞান-দর্শনের আলো থেকে বঞ্চিত থেকেছে, পেটের ক্ষুধা ও মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির স্বাস্থ্যসম্মত সকল উপকরণ উচ্চবর্গের সমাজ-বিধায়করা তাদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। অথচ এ-রকম একান্ত বিরূপ পরিবেশেও যে লোকসাধারণের মনীষার প্রবাহ শুকিয়ে যায়নি, আবহমান বাংলার গান-কবিতা-শিল্প-সংস্কৃতির সনাতন ধারাটি যে সঞ্জীবিত থেকেছে, লোকসাধারণের ভেতর থেকে উদ্ভূত দার্শনিক-চিন্তকরাই যে চিরায়ত ও লোকায়ত বিদ্রোহী চিন্তার অনুশীলন করে চলেছেন, লালন ফকির ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সৃষ্টি ও সাধনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রামমোহন আর তাঁর অনুসারিবৃন্দের হাতে ছিল আধুনিক তথা পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের আলোর মশাল, লালন ফকিররা সে-আলোর প্রত্যক্ষ স্পর্শ থেকে ছিলেন বঞ্চিত। তবু লালন ফকির ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা তাঁদের বক্তব্যে যে-সব তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন, সে-সবকে রামমোহনদের প্রচারিত তত্ত্বের চেয়ে পশ্চাৎবর্তী বলা যাবে না কোনোমতেই।

বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এহিমত দেখ সবে নরবস্তু ধরি॥
ওজঃবীর্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাঁইজিকে সেই জন জানে॥

লালনদের এ-রকম বক্তব্যে তাঁদের তো বস্তুবাদী বলেই শনাক্ত করা যায়। হতে পারে তাঁদের এই বস্তুবাদ নিতান্তই প্রাক-আধুনিক কালের একান্ত সরল বস্তুবাদ। তবু বুদ্ধির মুক্তিসাধনার নাগরিক পুরোহিত রামমোহনের ব্রহ্মবাদের চেয়ে এ-বস্তুবাদকে বেশি অবৈজ্ঞানিক বলতে পারি কি? বাংলার নগরজীবনে মুক্তবুদ্ধির বিস্তার ঘটানোর যে-কাজটি রামমোহন ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা করে চলেছিলেন, গ্রামীণ জীবনে মোল্লা-পুরোহিতদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মৌলবাদী ধর্মচেতনা-বিরোধী লালন ও তাঁর সহযোগীরা সেই একই কাজ যে চালু রেখেছিলেন– সে-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। প্রাচীন ক্লাসিক শাস্ত্রসমূহের আধুনিক ব্যাখ্যা ছিল রামমোহনের উপজীব্য। আর লালন ফকিররা আবহমান বাংলার লোকসাধারণের সংস্কৃতির বিদ্রোহী উপাদানকে

সংহত করে নিয়ে গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনে এক ধরনের মুক্তবুদ্ধির তরঙ্গপ্রবাহ বইয়ে দিতে থাকেন।

রাজা রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলদের মুক্তবুদ্ধিচর্চার আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আধুনিক নাগরিক বাংলা সাহিত্যে দেব-বিরোধিতা ও মানব-মহিমার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটান মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু তারই সমান্তরালে প্রবাহিত মূলধারার সাহিত্যে লালন ফকির যখন বলেন– 'রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি, চোরেরও সে শিরোমণি', তখন তা শুধু দেব-বিরোধিতা থাকে না, একেবারে স্বয়ং বিশ্বপালক ঈশ্বরের প্রতিই অভিযোগের আঙুল তুলে ধরেন। পাশ্চাত্য-থেকে-আনীত বুর্জোয়া মানবতাবাদের দৃষ্টি দিয়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নায়করা সকল মানুষের সমান মর্যাদার বিষয়টি অবলোকন করেছিলেন, আর লালন-দুদ্দু-পাগলা কানাই প্রমুখ লোকসাধারণের কবিরা আবহমান বাংলার লোকায়ত ভাবনা থেকেই নিয়েছিলেন মানবতার পাঠ– 'নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ/জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।' লালন যখন সুন্নত দিয়ে মুসলমান বা পৈতা দিয়ে ব্রাহ্মণ চিহ্নিত হওয়াকে বিদ্রূপবিদ্ধ করেন, তখন কি তাঁর এই বক্তব্যকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক নাগরিক বাঙালিদের চেয়ে অনেক বেশি র‍্যাডিক্যাল মনে হয় না? শুধু এ-ক্ষেত্রেই নয়। বাংলার সনাতন ধারা তথা মূলধারার সকল কবিই আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক তথা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করেছেন। অন্যদিকে নাগরিক বিদগ্ধ কবিরা (অন্তত উনিশ শতকের মাইকেলোত্তর কবিদের একটি বড় অংশ তো বটেই) একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যকেই আশ্রয় করেছেন এবং কখনো কখনো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদনের মতো মহৎ কবি, যাঁকে বলা যায় শতকরা একশত ভাগ অসাম্প্রদায়িক, যিনি অনায়াসে পৈতৃক হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কার পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যেতে পেরেছিলেন, কাব্যে তাঁরও অবলম্বন হয়েছিল হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যই। 'মেঘনাদবধ কাব্য'র এই কবি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন: 'আমাদের' (অর্থাৎ হিন্দুদের) এপিক রচনার মতো কোনো বিষয়বস্তু নেই, অথচ 'কারবালার ট্র্যাজেডি'র মতো মহাকাব্যের উপাদান আছে মুসলমানদের। তাই তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন যে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটলে তাঁরই হাতে মহরম নিয়ে যথার্থ মহাকাব্য রচিত হতে পারে। বাংলা কাব্যের মূলধারার কবিদের কিন্তু এ-রকম সাম্প্রদায়িক বিভাজন করতে হয়নি। গরিবুল্লাহর মতো মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কবির 'জঙ্গনামা'র পাশাপাশি 'হিন্দু' কবি রাধাচরণ গোপও কারবালার ট্র্যাজেডি নিয়ে অনায়াসে 'ইমামের জঙ্গ' লিখে ফেলতে পারেন। 'মুসলমান' কবিও লিখতে পারেন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি বা শ্যামাসংগীত। যে হাছন রাজা আকুল হয়ে বলেন– 'হাছন রাজায় কান্দে কান্দে রে/আল্লাজির লাগিয়া।/ স্বপনে দেখিলাম তারে/ না দেখি জাগিয়া,' তিনিই ব্যাকুল চিত্তে কৃষ্ণ বা কানাইকে ডেকে বলতে পারেন– 'দয়াল কানাই, দয়াল কানাইরে/ পার করিয়া দাও কাঙালিরে।/ ভবসিন্ধু পার

হইবার/ পয়সা কড়ি নাই ।/ দয়া করিয়া পার করিয়া দাও/ বাড়ি চলে যাই ।' যিনি জন্মসূত্রে হিন্দু, তেমন কবিও পারেন ইসলামি বিষয়বস্তুকে তাঁর রচনায় অবলম্বন করতে । যেমন– নেত্রকোনার কবি শরৎচন্দ্র নাথ রচনা করেছেন 'দীন শরতের এসলাম সংগীত' । রচনায় হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্যের চমৎকার সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন কুমিল্লার মনোমোহন দত্ত । নরসিংদির কবি বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী 'দ্বিজদাস' ছদ্মনামে যে-সব সঙ্গীত রচনা করেছেন তাতে আবহমান বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন ঘটেনি শুধু, প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় ভাবনার তীব্র সমালোচনাও তাতে ফুটে উঠেছে । অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে পুরো বাঙালি জাতির লোকসাধারণের ঐতিহ্যকে একই আধারে ধারণ করেই প্রবাহিত হয়েছে বাংলা কবিতার মূলধারাটি । নবোদ্ভূত নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির হাতে রচিত নতুন ধারাটির সঙ্গে বাংলা কবিতার মূলধারার আসল পার্থক্য এখানেই ।

পাঁচ

বিশ শতকে যখন বাংলার নাগরিক সাহিত্যে হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম রিভাইভ্যালিজমের সাম্প্রদায়িকতা প্রকট হয়ে উঠেছে, তখনও কিন্তু মূলধারার কবিরা সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও রিভাইভ্যালিজমের কু-প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছেন । শুধু তাই নয় । নাগরিক মধ্যবিত্তের বাংলা কবিতায় যখন কলাকৈবল্যবাদেরই প্রাধান্য, তখন বাংলা কবিতার মূলধারার অনুসারী কবিদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বশীল রূপে অন্তত চারজন কবির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি । এঁরা হচ্ছেন হরিচরণ আচার্য, মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল ও নিবারণ পণ্ডিত । মূলধারার কবিতা তথা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ এঁরা অবলম্বন করেছেন বটে, কিন্তু স্থবিরতা ঘুচিয়ে সে-সব প্রকরণকে জীবন্ত ও গতিশীল করে তুলেছেন । হরিচরণ আচার্য ও রমেশ শীল 'কবিগান' নামক প্রকরণটিতে অভিনবত্বের সঞ্চার ঘটিয়েছেন । 'যাত্রা'র আঙ্গিকে ও বক্তব্যে বিপ্লব নিয়ে এসেছেন মুকুন্দ দাস । আর নিবারণ পণ্ডিত প্রাচীন পাঁচালির খোলনলচে পালটে দিয়েছেন, পাঁচালি তাঁর হাতে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার বাহন হয়ে উঠেছে । মূলধারার কবিতার যে একটি বিশেষ প্রকরণ কবিগান, সেই প্রকরণটি আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতায় মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে । তখনকার নতুন নগরে উদ্ভূত 'হঠাৎ নবাব' রাই সে-সময়ে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকরূপে মঞ্চাবতীর্ণ হন । পৃষ্ঠপোষকদের অসুস্থ চেতনা ও অশ্লীল জীবনাচরণ থেকেই কবিগানে অসুস্থতা ও অশ্লীলতার সঞ্চার ঘটে । তবে এই বিকৃতমতি পৃষ্ঠপোষকদের আওতা যেখানে প্রসারিত হতে পারেনি, নগরসীমার বাইরে অবস্থিত সেই সনাতনী গ্রামগুলোতে– বিশেষ করে সে-সময়কার পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে– কবিগান তার সুস্থতা ও শ্লীলতা বহুল পরিমাণেই বজায় রাখতে পেরেছে । শুধু বজায় রাখতে পারাই নয়, এই ধারাটিকে আরো বলিষ্ঠ করে তুলেছে । কবিগানে এ-রকম বলিষ্ঠতা সহকারে

যাঁরা অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাঁদেরই একজন হরিচরণ আচার্য ও অন্যজন রমেশ শীল।

কবিগানের আরেক নাম কবির লড়াই। মুখে মুখে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করে তা-ই দিয়ে দুই কবি 'লড়াই'য়ে অবতীর্ণ হন বলেই এর এ-রকম নাম। কবির লড়াই তো কবিতাকে একেবারে জনতার ভেতরে নিয়ে যায়, কবি আর কবিতা-রসিকের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা এখানে থাকে না। শুধু তাৎক্ষণিক কবিতার লড়াই নয়, কবিগানের আসরে কবিরা অন্যরকম গান বা কবিতাও পরিবেশন করেন ও করতেন। সেইসব কবিতা-গানের আঙ্গিক আর ভাববস্তু বাংলার মূলধারার কবিতারই বিবর্তনজাত। সেই বিবর্তনে কবিরা বারবার প্রথাবদ্ধতাকে ভেঙেছেন, সামাজিক জড়তাকে আঘাত করেছেন। অথচ এই কবিরা নাগরিক অভিজাতদের হাতে রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি বলেই স্বীকৃতি পাননি। যাঁরা এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁরাও এঁদেরকে 'কবি' বলেননি, বলেছেন– 'কবিওয়ালা' বা 'কবিয়াল'। কেন এই অবজ্ঞাসূচক 'ওয়ালা' বা 'আল' প্রত্যয়ের ব্যবহার?

আসলে শিক্ষিত নাগরিক মানুষেরা সহজে তাঁদের শিক্ষাভিমান ত্যাগ করতে পারেন না, এক ধরনের উন্নাসিক ও উঁচকপালে মনোবৃত্তির বৃত্তাবদ্ধ হয়ে থাকতেই তাঁরা স্বস্তি বোধ করেন। তাঁদের পরিমণ্ডলের বাইরেকার মানুষদের কৃতিকে যখন স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন, তখনও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরা করে যান। লোকসাধারণের প্রতিভাবান কবিকেও 'কবি' না-বলে 'কবিওয়ালা' বা 'কবিয়াল' বলাটাও তাঁদের সেই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা-প্রয়াসেরই পরিচয়বহ।

কবিয়াল কিংবা এ-রকম অন্য যা কিছু আখ্যা দিয়েই আলাদা করে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, হরিচরণ আচার্যের মতো অসাধারণ শিল্পী-মনীষীর কবিকৃতিকে কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। অনুসন্ধানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে : বাংলার নাগরিক কবিতায় যখন রবীন্দ্রযুগ, নাগরিক পরিমণ্ডলের বাইরে লোকসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মূলধারার কবিতায় তখন অসামান্য কৃতির স্বাক্ষর রাখছেন হরিচরণ আচার্য। এখানে একটি তথ্য খুবই কৌতূহল-উদ্দীপক যে রবীন্দ্রনাথ ও হরিচরণের জন্ম একই বছরে (১৮৬১), এবং রবীন্দ্রনাথের যে-বছর জীবনাবসান ঘটে সে-বছরে (১৯৪১) মৃত্যুবরণ করেন হরিচরণ আচার্যও। রবীন্দ্রনাথ ও হরিচরণের জন্মবর্ষ ও মৃত্যুবর্ষ অভিন্ন হয়ে যাওয়াটা যে নিতান্তই আপতিক ব্যাপার, নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোনো হেতু নেই। একান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হলে আমরা কেউই এ-ঘটনার পেছনে কোনো অলৌকিক বা অদৃশ্য শক্তির সচেতন পরিকল্পনা খুঁজতে যাব না অবশ্যই। তবু প্রলুব্ধ হই এ-ঘটনাটিকে ইতিহাসের অমোঘ বিধানের একটি নিদর্শন বলে ভাবতে। ইতিহাস যে কেবল তথাকথিত ভদ্রজন বা মুষ্টিমেয় নাগরিক শিক্ষিতজনদের জন্যই সংস্কৃতি-সম্পদের জোগান নিয়ে আসে না, ব্রাত্যজন তথা অনক্ষর গ্রাম্যজনের জন্যও যে রয়েছে তার দাক্ষিণ্য– বাংলার সংস্কৃতি-জগতে রবীন্দ্রনাথ ও হরিচরণের আগমন-নিষ্ক্রমণ যেন

তারই প্রমাণ বহন করে। অসাধারণ উৎকর্ষমণ্ডিত রবীন্দ্র-কবিতা তথা সাহিত্যের রসোপভোগের ক্ষমতা-বঞ্চিত লোকসাধারণ অনায়াসে তাদের স্বাভাবিক কাব্যরস-পিপাসার তৃপ্তি ঘটাতে পেরেছে হরিচরণের কবিতায় বা গানে। তাদের অনেকেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ নামক কোনো কবির নামই শোনেনি, কবিয়াল-বলে-পরিচিত হরিচরণরাই তাদের কবি। এ-বিষয়ে খুবই কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করেছেন একজন লেখক। তিনি লিখেছেন–

"রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর বছরের গল্প শুনছিলাম। কোনো নিতান্তই অজ পাড়াগেঁয়ে শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তাদের বিপন্ন করে এক কৌতূহলী মানুষ নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাপু এই যে কবি কবি বলছ, এই কবি রবি ঠাকুরটি কে? কই আমাদের গাঁয়ের দিকে তো কোনদিন গান গাইতে আসেনি।' অবাক হওয়ার কিছু নেই এই গল্পে, কারণ এমনকি আজকের দিনেও গ্রামের মানুষের এক বিশাল অংশের কাছে কবি মানেই কবিয়াল। মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির নায়ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিয়াল রমেশ শীল, গোমানি দেওয়ানদের পার্থক্য খুবই মৌলিক, একেবারে শ্রেণী-অবস্থানের। গ্রামীণ সংস্কৃতির কবি তাই অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত কবিয়ালেরাই। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ নন।"–পুলক চন্দ {'গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান' কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-এক}

নাগরিক কবিতার অতিসমৃদ্ধ রবীন্দ্রযুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রাত্যদের মধ্যে মূলধারার বাংলা কবিতায় যিনি 'হরিচরণ-যুগে'র সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন, সেই হরিচরণ আচার্যের কবিকৃতি শুধু কবির লড়াইয়ের আসরেই স্ফুলিঙ্গের মতো 'উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে' যায়নি। 'কবির ঝংকার' নামক দুই খণ্ডের একটি বইয়ে তিনি তাঁর কবিতা তথা গানের সংকলন করে রেখে গেছেন। তাঁর শেষ বয়সের চিন্তা-চেতনার পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'অমিয় লহরী' নামক সংকলন গ্রন্থটিতে। এছাড়া তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলার কবিগানের আসরের বর্ণনা আছে তাঁর গদ্যে রচিত 'বঙ্গের কবির লড়াই' বইয়ে। বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকের একটি চমৎকার দলিল এই বইটি। হরিচরণ ছাড়াও আরো অনেক কবি নাগরিক কবিতার রবীন্দ্রযুগেও বাংলা কবিতার মূলধারাকে সঞ্জীবিত রেখেছেন, হরিচরণের বইয়ে তারই কিছুটা আঁচ পাই আমরা। হরিচরণ-যুগ তো বাংলায় স্বদেশী-চেতনার উদ্বোধনেরও যুগ।

তবে হরিচরণও স্বয়ম্ভু নন নিশ্চয়ই। মূলধারার কবিতা ও সংগীতের যে-প্রকরণটিতে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সে-প্রকরণটিতে তাঁর গুরু ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। 'দ্বিজদাস' ছদ্মনামে রচিত বৈকুণ্ঠনাথের অনেক সংগীত একসময় অসাধারণ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সে লোকপ্রিয়তার কারণ দ্বিজদাসের লোকায়ত মুক্তবুদ্ধিচর্চা, তাঁর প্রতিবাদী চেতনা, তাঁর সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মনোভঙ্গি। দ্বিজদাস, এমনকি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ধর্মশাস্ত্র মেনে চলার সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহকেও তাঁর

সংগীতের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরকে সম্বোধন করে রচিত সংগীতেই তাঁর সেই সন্দেহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি–

কেউ বলে আছ তুমি কেউ বলে নাই
আমি বলি থাকলে থাকুক না থাকিলে নাই।
যারে নয়নেও দেখি নাই শ্রবণেও শুনি নাই
আছে কি না আছে মেলে না প্রমাণ।
পাগল দ্বিজদাসের গান . . . . .
হিন্দুগণের বান্ধা আছে ত্রিসন্ধ্যা কাজ
মুসলমানের বান্ধা আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।
যে-জন সপ্তাহ পরেতে যায় গীর্জাতে
তাহারাই এ-জগতে মানুষ প্রধান ॥
পাগল দ্বিজদাসের গান . . . . .
বেদ পুরাণ বাইবেল আদি যত ইতি পুঁথি
মানি বলেই মোদের এতই দুর্গতি।
মানতে মানতে শাস্ত্র পাই না অন্নবস্ত্র
ঘটি বাটি লাঠি বেচে কর্মে দিছি দান ॥
পাগল দ্বিজদাসের গান . . . . .

শুধু দ্বিজদাসের গানে নয়, এ-রকম বক্তব্য প্রাকৃত বাংলার আরো অনেক কবির কবিতা-গানেই পাওয়া যাবে। এ-চেতনা তো, আমরা জানি, বাঙালির মূলধারার কবিতার একেবারে গোড়া থেকেই বিদ্যমান। সেই ধারাটিই বাংলায় 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর যুগে এক বিশেষ পরিণতি পায় হরিচরণ আচার্য ও মুকুন্দ দাসের হাতে। এরপর এদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী ভাবনার বিস্তার যখন ঘটতে থাকে, তখন এই মূলধারাটিতে তারও স্পর্শ লাগে। সেই স্পর্শেই রমেশ শীল ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের প্রয়াসে কবিগানে যুক্ত হয় অন্যতর মাত্রা, এবং পুরনো পাঁচালির আধারে বিপ্লব-ভাবনার নতুন আধেয় ভরে দেন কবি নিবারণ পণ্ডিত।

সা ক্ষা ৎ কা র

প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী মাত্রই নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করেন

সি রা জু ল ই স লা ম চৌ ধু রী

[আজ ২৩ আগস্ট ২০০৮। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি বাংলাভাষার বরেণ্য লেখক, শিক্ষাবিদ, সংগঠক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর। তাঁর কাছ থেকে 'শিল্পের দর্শন' বিষয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব আমরা জানতে চাইব। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ২৩ জুন ১৯৩৬, বাড়ৈখালী, বিক্রমপুরে। অবসর নিয়েছেন ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৭৫। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ: প্রবন্ধ ও গবেষণা: অন্বেষণ ১৯৬৪, দ্বিতীয় ভুবন ১৯৭৩, নিরাশ্রয় গৃহী ১৯৭৩, আরণ্যক দৃশ্যাবলী ১৯৭৪, অনতিক্রান্ত বৃত্ত ১৯৭৪, প্রতিক্রিয়াশীলতা, আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে ১৯৭৫, শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ ১৯৭৫, আমার পিতার মুখ ১৯৭৬, বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক ১৯৭৬, কুমুর বন্ধন ১৯৭৭, উপরকাঠামোর ভেতরেই ১৯৭৭, বেকনের মৌমাছিরা ১৯৭৮, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি ১৯৭৯, একই সমতলে ১৯৮০, ঊনবিংশ শতাব্দির বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ ১৯৮০, স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয় ১৯৮১, বাঙালী কাকে বলি ১৯৮২, বাঙালীকে কে বাঁচাবে ১৯৮৩, বৃত্তের ভাঙ্গা-গড়া ১৯৮৪, টলস্টয় কয়েকটি প্রসঙ্গের একটি ১৯৮৫, নেতা, জনতা ও রাজনীতি ১৯৮৬, গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ ১৯৮৭, শেষ মীমাংসার আগে ১৯৮৮, উদ্যানে এবং উদ্যানের বাইরে ১৯৮৯, শ্রেণী, সময় ও সাহিত্য ১৯৯০, স্বপ্নের আলোছায়া ১৯৯১, কেউ বলে কৃষ্ণ কেউ বলে নদী ১৯৯০, দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্য-মিথ্যা ১৯৯২, লেনিন কেন জরুরী ১৯৯২, আপনজন ১৯৯৪, অপরিচিত নেতা, পরিচিত দুর্বৃত্ত ১৯৯৪, বাঙালীর জয়-পরাজয় ১৯৯৪, লিঙ্কনের বিষণ্ন মুখ ১৯৯৪, এর পথ ওর প্রাচীর ১৯৯৫, ভয় পেয়ো না, বেঁচে আছি ১৯৯৫, মাঝখানের মানুষেরা ১৯৯৫, দুই বাঙালীর লাহোর যাত্রা ১৯৯৬, পতঙ্গ, ভৃত্য ও দৈত্য ১৯৯৬, রাষ্ট্রের মালিকানা ১৯৯৭। গল্প: ভালো মানুষের জগৎ ১৯৯০। অনুবাদ: এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব ১৯৭২, ইবসেনের বুনো হাঁস ১৯৬৫, হাউসম্যানের কাব্যের স্বভাব ১৯৬৫। সম্পাদনা: আনোয়ার পাশা রচনাবলী (৩ খণ্ড)।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা। তিনি এ ধরনের লেখার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সরাসরি ভূমিকা রেখে চলছেন। তাঁর রচনা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম অন্যদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে হাতেগোনা যে ক'জন চিন্তাবিদ পশ্চাৎপদ মুসলমানদের অনুভূতিতে অন্ধভাবে আঘাত না-করে মার্কসবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে অব্যাহত রেখেছেন, তাদের মধ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অন্যতম।]

হালখাতা

আপনি আপনার 'প্রতিক্রিয়াশীলতা, আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে' গ্রন্থে লিখেছেন, বাংলাভাষী মানুষ ইংরেজি চর্চায় যে পরিমাণ উৎসাহ, শ্রম ও সাধনা নিয়োগ করেছেন তা যদি মাতৃভাষার চর্চায় ব্যয় হত তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে লেখা হত। এর মূল কারণটা সাহিত্যিক নয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। সাহিত্যের আলোচনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে কারণ দু'টির কথা আপনি লিখেছেন, এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ দু'টি নিয়ে খানিকটা ব্যাখ্যা করবেন কি?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

'প্রতিক্রিয়াশীলতা, আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে' নামক আমার ঐ ছোট্ট বইটিতে আমি দেখাতে চেয়েছি আধুনিককালে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকরা উদারনৈতিক হয়েছেন– যে সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শুরু করে আধুনিককাল শুরু পর্যন্ত– এই সময়কালে পাঠকরা যুদ্ধ দেখেছেন, ফ্যাসিবাদ দেখেছেন এবং তারা উদারনৈতিক হয়েছেন। কিন্তু লেখকরা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছেন, তারা তখন বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন এবং পেছনের দিকে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ ওই যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, যে রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়েছিল, সেটা হচ্ছে পুঁজিবাদের সঙ্কট। এটা কোনো সাধারণ মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ ছিল না; এটা পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যকার সংঘর্ষ, এটা তাদের আধিপত্য বিস্তারের সংঘর্ষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও তাই। এজন্য এ দুটি যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও বলা হয়। কথা হল এর থেকে বেরিয়ে আসবার পথটা তাহলে কী ছিল? পথ ছিল দুটো; একটা পথ ছিল সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়া– ততদিনে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, রুশ বিপ্লব হয়ে গেছে– তো সেই দিকে যাওয়া; আরেকটা পথ ছিল পেছনের দিকে যাওয়া; অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা, ভাববাদ, ধর্মান্ধতা– সেদিকে যাওয়া। আমার ঐ ছোট বইটিতে আমি দেখাতে চেয়েছি, এটা কোনো আবিষ্কার নয়, এটা একটা সত্য যে, সেকালের বড় লেখকরা সকলেই পেছনের দিকে যাচ্ছিলেন; কেননা সামনে যেতে অর্থাৎ কমিউনিজমের দিকে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন, সেটাকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না, কাজেই সেই বড় কবিরা সেটা এলিয়ট

বলি, ইয়েটস বলি বা বড় লেখকরা অর্থাৎ জেমস জয়েস বলি, ডি. এইচ. লরেন্স বলি– তাঁরা পেছনের দিকে চলে যাচ্ছিলেন– আমি ওটাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছি। এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা বিষয়টি হচ্ছে রাজনৈতিক। যার পেছনে অর্থনীতিও কাজ করেছে। অথচ তখন অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মানুষ মুক্তি চাচ্ছিল। আমাদের দেশেও রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয় দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয় দুটিকে আমাদের এখানে মোটেও গুরুত্ব দেয়া হয়নি; আমাদের দেশের লেখকরাও তখন পেছনের দিকে ছুটছিলেন। নজরুল ইসলাম রুশ বিপ্লবের পক্ষে লিখেছেন, এছাড়া আর কাউকে তেমন চোখে পড়েনি। ইংরেজি সাহিত্যের বড় বড় লেখক, তারা বড় লেখক কিন্তু তারা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল– আমাদের দেশের লেখকরাও ঐ প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকেই ঝুঁকে পড়ছিলেন। ফলে আমাদের অঞ্চলেও বড় ধরনের হতাশা নেমে এল এবং সেটা বিশেষ করে তরুণদের মনে; তাদের স্বপ্ন ব্যাহত হল, চরমভাবে বেকারত্ব নেমে এল। যুদ্ধ আমাদেরকে যেটা দিল– সেটা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুটোতেই মানুষ নিষ্ঠুরতা দেখল, মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক সেটাকে ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখল– আমাদের সাহিত্য এবং অন্যান্য শিল্পও প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে অর্থাৎ পেছনের দিকেই চলতে লাগল। যার পেছনের কারণ ছিল রাজনৈতিক এবং সেই রাজনৈতিক কারণের পেছনে ছিল অর্থনৈতিক কারণ।

হালখাতা

সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিতান্ত্রিক যে ধারা, সেই ধারার শিল্পের ইতিহাস তো হাজার হাজার বছরের। সে কারণে ওই ধারার শিল্পের গুণগত মান এক বিশেষ পরিপক্কতা পেয়েছে। সেদিক থেকে সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার শিল্পের ইতিহাস তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ের। ফলে এ ধারার শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক গুণগত মানও তুলনামূলকভাবে কম ম্যাচিউরিটি পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সাহিত্য তথা শিল্পে তো নন্দনতাত্ত্বিক গুণ থাকতেই হবে। সবার আগে শিল্পকে শিল্প হতেই হবে। এরপর অন্যান্য বিষয়গুলো আসবে। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কিন্তু উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিয়ে নয়। আমার বক্তব্য শিল্পের মতাদর্শ নিয়ে। মতাদর্শগতভাবে সাহিত্য বা শিল্প সমাজতান্ত্রিক হলেই যে সেটা উন্নত হবে তা নয়, আবার প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার হলেই শিল্প খারাপ হবে সেটাও নয়– আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের যে নন্দনতাত্ত্বিক গুণ সেটা স্বীকার করে নিয়েই তাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার কথা ঐ ছোট্ট বইটিতে লিখেছিলাম। তো শিল্পে নন্দন থাকতেই হবে, এটা হল একটি বিষয়, কিন্তু দেখতে হবে যে তার মতাদর্শটা কী; সেখানে মতাদর্শের গুরুত্ব কতটা।

হালখাতা
এখানে 'মতাদর্শ' বলতে আমরা আসলে কী বুঝব?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
আমি এক্ষেত্রে মতাদর্শ বলতে বোঝাতে চাচ্ছি, যে, কোনটা প্রগতিশীল আর কোনটা প্রতিক্রিয়াশীল সেই পার্থক্য প্রকাশ করার অর্থে।

হালখাতা
আমরা কি বুঝব, আপনার মতে সমাজতন্ত্রই প্রগতিশীলতা?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাই সবসময় প্রগতিশীলতা হবে, তার বাইরে আর কিছু প্রগতিশীলতা হবে না– বিষয়টি এমন নয়। কথা হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রগতির উচ্চতম একটি স্তর কিন্তু এর বাইরে থেকেও প্রগতিশীলতা শিল্পে থাকতে পারে।

হালখাতা
একটু খুলে বলবেন কি?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ধরা যাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট হওয়ার আগেই তার সবচেয়ে সফল উপন্যাস দু-টি লিখেছিলেন। যার একটি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' অপরটি 'পদ্মা নদীর মাঝি'। পদ্মা নদীর মাঝিতেই নিম্নবর্ণের মানুষ পদ্মাপাড়ের জেলেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন, তাতে যে প্রগতিশীলতা ফুটে ওঠে সেটা তো তিনি কমিউনিস্ট হওয়ার আগেই লিখেছিলেন। কাজেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বাইরেও শিল্পে প্রগতিশীলতা থাকতে পারে। বরং এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে যে, তিনি পক্ষে ছিলেন সমাজ পরিবর্তনের। কাজেই মতাদর্শ খুব জরুরি। মতাদর্শ ছাড়া কোনো সাহিত্য তৈরি হয় না। তাছাড়া সমাজতন্ত্র তো শিল্পে নানাভাবে থাকতে পারে– মানিক কমিউনিস্ট হয়েছেন পরে কিন্তু তার আগেই পদ্মা নদীর মাঝিতে তার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ছাপ লক্ষ করার মতো। এটাই প্রগতিশীলতা।

হালখাতা
আপনি যে সাহিত্যে বা শিল্পে মতাদর্শের গুরুত্বের কথা বলছেন, তো শিল্পের ব্যঞ্জনা, ছন্দ, রঙ, ভাষা, লাইট, বাদ্য, মিথ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা প্রায়ই বিভিন্ন

জনের লেখায় পড়ি বা নানাজনের বক্তব্যে শুনে থাকি কিন্তু শিল্পের মতাদর্শের কথা সে অর্থে আলোচিত হয় না বললেই চলে। আপনি আমাদের কিছুটা বিস্তৃতভাবে বলবেন কি, শিল্পে মতাদর্শের গুরুত্ব আসলে কতখানি?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সাহিত্য ও শিল্পে মতাদর্শের গুরুত্ব অসাধারণ; সাহিত্যসহ সকল শিল্পই হচ্ছে অত্যন্ত গভীর বিষয়। এটা জীবনেরই একটি রূপায়ণ; এই রূপায়ণকে গভীরতা দেয়া সম্ভব নয়, যদি সাহিত্যিক তথা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরতা না থাকে, যদি শিল্পী-জীবনের চলমানতাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে না পারেন। সে কারণে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে এমন কোনো বড় সাহিত্য বা শিল্পকর্ম নেই যার মধ্যে মতাদর্শ তথা দর্শন নেই। প্রকৃত শিল্প শুধুমাত্র বিনোদন নয়, তার ভেতর দার্শনিকতা বা মতাদর্শ থাকবেই। এবং সে কারণেই শিল্প কালোত্তীর্ণ হয়। যেমন ধরা যাক শেক্সপিয়রের কথা; তার জীবনে কোনো দর্শন ছিল না এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু সেকালে তো সমাজতন্ত্র ছিল না। শেক্সপিয়রের শিল্পকর্মের ভেতরে মতাদর্শিক অবস্থান ছিল। অর্থাৎ ভালো-মন্দ, পক্ষ-বিপক্ষ ছিল। শেক্সপিয়র তার শিল্পে মানুষকে রূপায়িত করতে গিয়ে দেখলেন, মানুষের মনে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে এবং শুভের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা জাগছে, সে আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তিনি রূপায়িত করলেন গভীরভাবে। সে জন্য তার চরিত্রগুলো কালজয়ী হল। সে কারণে একজন হ্যামলেট শুধুমাত্র শেক্সপিয়রের কালের মানুষ না, ডেনমার্কের একজন রাজপুত্র না; হ্যামলেট হয়ে গেলেন সর্বকালের মানুষ। হ্যামলেটের ভেতর ন্যায়-অন্যায়ের যে দ্বন্দ্ব চলছে, বোধের যে দ্বন্দ্ব– তিনি কোন পথ নেবেন, তা নিয়ে প্রশ্নের বোধ– সেই বোধটা একটা সর্বজনীন বোধ, সর্বজনীন সমস্যা। সে কারণে শেক্সপিয়রকে মানুষের জীবন বোঝার জন্যে একটি মতাদর্শকে অবলম্বন করতে হয়েছে। এবং সেটা হল মানুষের ভেতরকার সকল ভালো, মঙ্গল বা শুভর প্রতি পক্ষপাত এবং অশুভ ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে অবস্থান। সে কারণেই তার শিল্পকর্ম কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

হালখাতা

আপনি শিল্পের দর্শন ও শিল্পের মতাদর্শ– বিষয় দুটিকে কি আলাদা করে দেখছেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

না, আমি বিষয় দুটিকে আলাদা করে দেখছি না। শিল্পের দর্শন ও শিল্পের মতাদর্শ বিষয় দুটিকে আমি একই অর্থে ব্যবহার করছি।

হালখাতা

শিল্প এবং দর্শনকে অনেকেই এক করে ফেলেন। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শিল্প এবং দর্শন এক নয়। দর্শন ছাড়া সাহিত্য বা অন্য কোনো শিল্প গভীর হতে পারে না। দর্শনশূন্য সাহিত্য বা শিল্প কখনোই সর্বজনীন এবং চিরায়ত হতে পারে না। কাজেই শিল্প এবং দর্শনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। কিন্তু এ দুটো বিষয় কোনোভাবেই এক নয়।

হালখাতা

দর্শন নিয়ে যে কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায়, সে কথা সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই বলা যায়; এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হ্যাঁ একথা ঠিক। সাহিত্যের দর্শন বলতে যা বোঝায়, শিল্পের সকল মাধ্যমের ক্ষেত্রেই সেই একই দার্শনিক গুরুত্বের কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। চলচিত্র, নাটক, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প এরকম সকল শিল্পমাধ্যমেই দর্শনের গুরুত্ব অপরিহার্য। আর আমি তো বলেছি দর্শন মানেই হল মতাদর্শ। মতাদর্শ ব্যতীত কোনো শিল্পমাধ্যমই দাঁড়াতে পারে না।

হালখাতা

আমাদের মতো রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্নসম্বলিত শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে যে বাধা আসে, সেটা অতিক্রম করতে হলে কী কী উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? যেমন গত ৩৬ বছরেও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, শ্রেণীবৈষম্য বা শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে সেধরনের কোনো চলচ্চিত্র আমাদের দেশে তৈরি হয়নি। কিন্তু এর কারণ কী বলে আপনি মনে করনে?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শিল্পের সৃষ্টি এবং শিল্পের সংরক্ষণ-প্রচার-প্রতিষ্ঠা এ দুটো বিষয়ের মধ্যেই রাজনীতি থাকে। এই রাজনীতি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে নানাভাবে, শিল্পীকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ ক্ষেত্রে শিল্পী কতটা স্বাধীনতা পাবেন কিংবা কতটা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাবেন সেটা ঠিক করে দেয় রাষ্ট্র। তখন শিল্পী তার মর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না কিন্তু যিনি বড় শিল্পী তিনি রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত ঐ সীমানার ভিতরে থেকেও একটি নিজস্ব ক্ষেত্র তৈরি করে নেন, যার মধ্যে থেকেও তিনি এক ধরনের আপেক্ষিক স্বাধীনতা

আদায় করে নিয়ে কাজ করতে পারেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শক্তিমান শিল্পীরা রাষ্ট্রের বেঁধে দেয়া এই সীমানা গুঁড়িয়ে ফেলেন, সীমানাকে অস্বীকার করে নতুন রাষ্ট্র তৈরির পথ প্রশস্ত করেন। এটা ঘটে শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে। দ্বিতীয়ত, শিল্প সংরক্ষণ বিষয়ে বলা যায়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উঁচু শ্রেণীর অর্থাৎ যারা ধনী তারাই অন্যান্য সুযোগসুবিধার মতো শিল্পেরও ভোক্তা হয়। ওখানেও কিন্তু রাজনীতিই প্রধান কারণ। যেমন একটি ভালো চিত্রশিল্প যেখানে সংরক্ষণ করা হয় সেখানে তো সাধারণ জনগণ যেতে পারছে না, তাহলে তারা ঐ শিল্পকর্মটি দেখবে কীভাবে? দরিদ্র শ্রেণীর তো সেখানে যাওয়ার, মতো ক্ষমতা নেই। কাজেই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে, শিল্পের সংরক্ষক ও ভোক্তা– উভয়েই ধনী শ্রেণীর, সেখানে দরিদ্রেরা শিল্পের ভোক্তা হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক। যে রাজনীতি সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে, শ্রেণীর সৃষ্টি করে সে ধরনের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এটা ঘটতেই থাকবে।

হালখাতা

তাহলে একটি প্রশ্ন কিন্তু চলেই আসে, শিল্পসৃষ্টির যে রাজনীতি আর শিল্পের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার রাজনীতি কিন্তু আলাদা বিষয়। কাজেই একজন শিল্পী শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হলে কিন্তু চলছে না, সেই শিল্প প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে যে লড়াইটা প্রয়োজন সেটাও জরুরি হয়ে পড়ছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হ্যাঁ, শুধু শিল্প সৃষ্টি করাই শেষ কথা নয়, সেই শিল্পের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইটা জরুরি। প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে নিয়ম বা প্রথাকে যিনি উপস্থাপন করেন বা প্রতিফলিত করেন তিনি কেবল সাংবাদিক হন। আবার এই প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে-চুরে যে শিল্পী তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে নতুন চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করেন, সমাজকে বদলাতে চান সেই শিল্পীর শিল্পের ভেতরেই বিশেষ ধরনের বিদ্রোহ থাকে। শিল্পকর্ম শুধু সৃষ্টি করলেই হবে না, ঐ শিল্পের সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে যে চলমান আন্দোলন, রাজপথে মিছিল– সেখানেও তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা শিল্প প্রতিষ্ঠার রাজনীতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিবর্তনেরই রাজনীতি। কাজেই শিল্পী যদি বোঝেন শুধু শিল্পসৃষ্টি করেই কাজ হবে না, এই শিল্পের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাও সমানভাবে জরুরি, তাহলে একজন প্রকৃত শিল্পী অর্থাৎ যে শিল্পী দায়বদ্ধতা বোধ করেন সেই ধরনের শিল্পী চলমান আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন। কেননা কেবল শিল্পসৃষ্টি করেই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বদলানো যাবে না। আর সেটা পারা না গেলে সাধারণ জনগণের মুক্তিও কোনোভাবে আসবে না। কাজেই শিল্পসৃষ্টি– এটা একটি কাজ এবং শিল্পের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা সেটা আরেকটি কাজ। এদুটি কাজই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে কল্পনা করলে হবে না।

হালখাতা

কিন্তু আমাদের দেশের কথা যদি ধরি, তাহলে দেখা যায়, হয়তো কেউ ভালো কবিতা লিখছেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তার কোনো চরিত্র নেই। কেউ কেউ আছেন কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের কথাই হয়তো তারা বলছেন না, কিন্তু কেউ আছেন উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে মানুষের হৃদয় জয় করছেন কিন্তু প্রচলিত রাজনৈতিক যে দলগুলো আছে ব্যক্তিগতভাবে প্রায় সকল দলের কাছ থেকেই পর্যায়ক্রমে সুবিধা নিয়েছেন এবং এখনও নিচ্ছেন। প্রশ্ন হল উৎকৃষ্ট কবিতা লেখা আর একইসঙ্গে এরকম বৈশিষ্ট্যহীন আদর্শের হওয়া কী করে সম্ভব?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হ্যাঁ, শিল্পের বেলায় এমনটি ঘটতে দেখা যায়। অনেক শিল্পীই আছেন যারা সামাজিকভাবে দৃশ্যত দায়বদ্ধতার ধার ধারেন না কিন্তু শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এদের অনেকেরই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ হল ব্যতিক্রম। সাধারণত মানুষ যা কিছু নিজের অধীন করে বা মানুষ যা কিছুর অধীনস্থ হয় তার সৃষ্টিকর্মের ভেতরে সেটাই প্রাধান্য পায়। কাজেই কেউ সমাজবিরুদ্ধ হয়ে মানববিদ্বেষী হয়ে সফল সৃষ্টি করবে এটা অসম্ভব। বড় শিল্পী হওয়ার জন্য অবশ্যই আদর্শ লাগে। এবং সেই আদর্শের কারণেই একজন শিল্পী শুধু সৃষ্টি করেই বসে থাকবেন না তার শিল্পকর্মের সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখবেন। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন শেষ বলতে কোনো কথা নেই একইভাবে এই আন্দোলনেরও শেষ কোথায় তা কেউ জানে না। এটা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া।

হালখাতা

কিন্তু আমাদের এখানে বিভিন্ন সেক্টরে যারা শিল্পচর্চা করছেন, তাদের মধ্যে এক-দুই জন বাদে প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকেই শোনা যায় যে, শিল্পসৃষ্টি করছি কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা কি আমার কাজ নাকি? এমনকি শিল্পের সঙ্গে যে রাজনীতি-অর্থনীতির সম্পর্ক রয়েছে সেটাও তারা মনে করতে বা মেনে নিতে রাজি নন। তারা বলেন যে, রাজনীতির সাথে কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা সিনেমার সম্পর্ক কিসের? কিংবা পেইন্টিং, সিনেমা বা গানের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ আসবে কেন? এই যে নিজেদের দায়মুক্ত মনে করা বা মূল জায়গা থেকে নিজেদের আড়াল করা– এর কারণ কী বা এর পেছনে তাদের কী ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করে থাকে?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এটা অবশ্য ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবেই ঘটে। এটা গোটা ব্যবস্থারই একটি প্রতিফলন। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক যে নিয়ন্ত্রণ, সে নিয়ন্ত্রণেরই একটা রূপ। অর্থাৎ আমরা যে ব্যবস্থার মধ্যে আছি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে আত্মস্বার্থসর্বস্ববাদী করে তোলে। যিনি শিল্পী তিনি যেহেতু এই ব্যবস্থার ভেতরেই বসবাস করেন তাই তার অজ্ঞাতেই তার ভেতরে এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা এবং স্বার্থবাদিতা প্রবেশ করে। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, যখন পৃথিবীতে পুঁজিবাদের বিকাশ যখন ঘটেছিল তখন একটা পর্যায়ে মানুষ ভয় পেয়ে গেল; বিশেষ করে ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডে দেখা গেল যে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে এক ধরনের বাণিজ্যপ্রবণতা জন্ম নিচ্ছে, সমস্ত কিছু পণ্যে পরিণত হচ্ছে, শিল্পকলাও পণ্যে পরিণত হচ্ছে। শিল্পী শুধু টাকার কথা মাথায় রেখেই তার শিল্পকর্ম বিক্রি করে দিচ্ছে না, শিল্পী বিক্রেতায় পরিণত হচ্ছেন। শিল্পী শুধু শিল্প সরবরাহকারীতে পরিণত হচ্ছেন অন্যের ভোগের জন্যে। তখন যে আওয়াজটা তোলা হয়েছিল, সেটা আবার শিল্পীরাই তুলেছিলেন, 'শিল্পের জন্যেই শিল্প'। তখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এ বক্তব্যটি কিন্তু একটি প্রগতিশীল বক্তব্য!

হালখাতা

আপনার জবাবের ফাঁকে আরেকটি প্রশ্ন করার প্রয়োজন দেখা দিল; সেটা হল আমরা তো এতদিন জেনে এসেছি 'শিল্পের জন্য শিল্প' এটা একটি নেতিবাচক বা প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য, কিন্তু আপনি যে বললেন, এটা একটি প্রগতিশীল বক্তব্য, সেটা কীভাবে? বলবেন কি?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমি একটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা বলছি। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরিস্থিতি। ইংল্যান্ডে শিল্পীরা যখন শুধু টাকার বিনিময়ে শিল্পকর্ম বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে দিচ্ছিলেন তখন এ কারণে এই আওয়াজ উঠেছিল যে আসলে বাণিজ্যের জন্য শিল্প নয়। তখন শিল্পীদের মধ্য থেকেই এই বক্তব্য উঠে আসে যে আমরা শিল্প করব বাণিজ্যের জন্য নয়, আমরা শিল্প করব শিল্পের জন্য।

হালখাতা

পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে যেসব চিত্রশিল্পী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানে গিয়েছেন তাদের অধিকাংশের শিল্পী-সত্তাই মার্কিনকেন্দ্রিক চিত্রবৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তাদের কাজের মধ্যে প্রকৃতি স্বদেশ যেভাবে আছে, দেশের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনচেতনা বা সংগ্রাম সেভাবে স্থান

পায়নি। যতটা স্থান পেয়েছিল জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পে। এ সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হ্যাঁ জয়নুল আবেদীন শিল্পী হয়েছেন বিদেশে না গিয়েই, নিজের জীবন শিক্ষা নিয়ে। তার গ্রামীণ জীবনের যে অভিজ্ঞতা, কলকাতা জীবনের অভিজ্ঞতা– এগুলোই তাকে শিল্পী করে তুলেছে। আর জয়নুল আবেদীনের ছাত্ররা অর্থাৎ পরবর্তীকালে যারা আধুনিক শিল্পী হতে চেয়েছেন তারা ঠিক জয়নুলের মতো করে শিল্পী হননি। এরা আর্ট স্কুল-কলেজে পড়েছেন কিন্তু এদের মধ্যে নিজস্ব সেই ভিত্তিটা ছিল না, দাঁড়াবার শক্ত জায়গা ছিল না। তারা আবার গেলেন বৃত্তি নিয়ে দেশের বাইরে, সে বৃত্তিগুলো এল পুঁজিবাদী দেশ থেকে; সেখানে তারা ইউরোপের তথাকথিত আধুনিক শিল্পকলাগুলো দেখলেন। তখন এদের বয়স অল্প ছিল, অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না, সে কারণে তারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে গেলেন। এদের অনভিজ্ঞতার কারণে বিষয়-নির্বাচন ও আঙ্গিকের দিক থেকেও সে সমস্ত তথাকথিত আধুনিকতা এদের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

হালখাতা

শিল্পের বিমূর্ততা নিয়ে আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো যে, বিমূর্ত শিল্প কোন্ পথ অবলম্বন করে, কোন্ পথের সমর্থক বা কোন্ মত পথের বিরুদ্ধে তার অবস্থান বিষয়টি বেশির ভাগ সময়ই বোঝা যায় না। কোনটাকে ভালো বলছে বা কোনটাকে মন্দ বলছে তা বোঝা যায় না, আপনি অবশ্য সেটাকে পলায়নবাদিতা বললেন। বিমূর্ত শিল্প সম্পর্কে আমরা আপনার মন্তব্য পেয়েছি তারপরও যদি আরেকটু ব্যাখ্যা করেন ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রথম কথা হচ্ছে একটা অবস্থান নেয়া; এই অবস্থান নিতে হলে সবার আগে সাহস প্রয়োজন; আমি যদি আমার অবস্থানকে পরিষ্কার করে ফেলি বা কোনো পক্ষ নিয়ে নেই তাহলে আমি চিহ্নিত হয়ে যাব– চিহ্নিত হয়ে গেলে আমি হয়তো গ্রহণযোগ্যতা হারাব, ফলে আমার স্বার্থ নষ্ট হবে, স্বার্থ নষ্ট হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। এই ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে রাজনীতির যে ধারা সেই ধারার সঙ্গে শিল্পকলার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে অবলম্বন করে নিজের পক্ষকে পরিষ্কার করতে হয়। কাজেই এখানে নিজের নৈতিকতা, রাজনৈতিক দর্শন এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল না হলে নিজের অবস্থানকে কোনো শিল্পী পরিস্কার করতে চান না বা পারেন না। প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী মাত্রই নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করেন। নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করতে না পারার কারণ থেকেও এই বিমূর্ততাকে অনেকে বেছে নিয়েছে। আমাদের এখানকার তথাকথিত আধুনিক শিল্পীদের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে।

হালখাতা

শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর যেমন দায়-দায়িত্ব রয়েছে– একইভাবে শিল্পী যে রাজনীতিকে সমর্থন করেন, ধরা যাক কমিউনিজমে আস্থাশীল কোনো শিল্পী যে শিল্পকর্ম তৈরি করছেন সে ক্ষেত্রে চলমান রাজনীতির যে গতি সেই গতিধারারও কোনো দায়িত্ব বা অবদান ঐ শিল্পীর শিল্পকর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে রয়েছে কিনা?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমস্ত দায় শিল্পীর একার নয়। শিল্পী যদি সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল হন তাহলে ঐ ধারার রাজনীতিটা এগুচ্ছে কিনা, গতিশীলতার মধ্যে আছে কিনা– সেটা বিবেচ্য। কেননা রাজনীতিরও সমর্থন প্রয়োজন হয় একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে কেবল শিল্পীকে দোষ দিলে চলবে না। শিল্পী সাহস সঞ্চার করবেন যে পরিপার্শ্ব থেকে সেই পরিপার্শ্ব শিল্পীর অনুকূলে আছে কিনা বা শিল্পীকে সাহস যোগাচ্ছে কিনা সেটাও বিবেচ্য। যেমন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারা প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত; একটি আওয়ামীলীগ ও অন্যটি বি.এন.পি.। এ দুটি ভাগই পুঁজিবাদী ধারার; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধারার যে রাজনীতি সেটা এখানে শক্তিশালী নয়, সে কারণে এই ধারার শিল্প খুব একটা সাহস বা উৎসাহ প্রদান করার সুযোগ পাচ্ছে না, অর্থাৎ শিল্পীরাও এই ধারার একটি শক্ত জায়গায় দাঁড়াতে পারছে না।

হালখাতা

সকল শিল্পমাধ্যমেই লক্ষণীয় যে, নারীকে শারীরিকভাবে যতটা উপস্থাপন করা হয় পুরুষকে ঠিক ততটা উপস্থাপন করা হয় না। এর পেছনে কি পুরুষতান্ত্রিকতাই কারণ? যদি তাই হয়, এমনও দেখা গেছে নারী শিল্পীরাও পুরুষের তুলনায় নারীকে তাদের শিল্প কর্মে বেশি উপস্থাপন করে থাকে, তাহলে এমনটি ঘটে কেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হ্যাঁ, সে বিষয়টি আছে। আমরা যদি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বা মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র শিল্পের কথা বলি, সেখানে দেখব যে তাদের পেইন্টিংসে যে পুরুষের ছবি আঁকা হয়েছে, সেই পুরুষ হল পৌরুষদীপ্ত, বীরত্বপূর্ণ। কিন্তু এ যুগের পেইন্টিংসে পুরুষের সেই পৌরুষদীপ্ত উপস্থাপন তো নেই-ই বরং সেটা দখল করেছে পিতৃতান্ত্রিকতা। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রশিল্পে সেই পুরুষতান্ত্রিকতা ছিলো না যাকে আমি বলছি পিতৃতান্ত্রিকতা। কিন্তু এখন চিত্রশিল্পসহ সকল শিল্পমাধ্যমে এবং আমাদের সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতা চলে এসেছে। এই পিতৃতান্ত্রিকতা চলে আসাতে পুরুষ তার পৌরুষত্ব হারিয়েছে। পুরুষের সেই যে শক্তি, সেটা আর নেই– এখন

অবশ্য দৈহিক শক্তির যুগও নেই– আর যে মানসিক শক্তি সেই মানসিক শক্তির যুগও এখন আর নেই। শারীরিক এবং মানসিক দুটোর কোনোটাই না থাকার কারণে হয়তো বিকল্প হিসাবে সবক্ষেত্রে নারী অধিক উপস্থাপিত হচ্ছে। নারীকে অধিক উপস্থাপনের প্রধানত দুটো কারণ আছে: এক হচ্ছে নারীর 'সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ' প্রদর্শন, দ্বিতীয় হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতাকে কোনোভাবেই এড়াতে না-পারা। পুঁজিবাদ হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে পিতৃতান্ত্রিক।

হালখাতা

পিতৃতান্ত্রিকতা বলতে কি পুরুষতান্ত্রিকতাকে বোঝাচ্ছেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পুরুষতান্ত্রিকতার তুলনায় আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে 'পিতৃতান্ত্রিকতা' বলছি; পুরুষের যে কর্তৃত্বপরায়ণতা সেটাকেই বোঝাচ্ছি; সমস্ত কিছুর ওপরই সে নিয়ন্ত্রণ করবে, সমস্ত কিছুর সিদ্ধান্ত সে-ই নেবে, যেমন পরিবারে একজন পিতা সিদ্ধান্ত নেয়। সমস্ত কিছুর ওপর শুধু কর্তৃত্বই করবে না সমস্তকিছুকেই সে ভোগ করতে চায়। একই কারণে নারীকে সে প্রধানত ভোগবাদী চিন্তা থেকেই দেখে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একদিকে সে শক্তিহীন, অন্যদিকে তার লোলুপ ভোগবাদিতা; এর কারণেই প্রচণ্ড বিকৃতি থেকে নারীকে সে যত্রতত্র উপস্থাপন করছে। নারীকে সিনেমা, কবিতা, নাটকে পুরুষ তার ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করছে। এই যে নারীকে এভাবে ব্যবহার করছে এরও একটি দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে– যে দর্শন মানবতাবাদী নয়, পুরোপুরি ভোগবাদী। এটা পুঁজিবাদী দর্শনেরই ফল।

হালখাতা

পুরুষ যে সকল শিল্প সৃষ্টি করে সে সকল শিল্পের ভেতরে পুরুষ নারীকে অধিক উপস্থাপন করছে ভোগবাদীতার কারণে কিন্তু নারী কেন পুরুষকে উপস্থাপন না-করে নারী শিল্পীরাও নারীকেই উপস্থাপন করছে?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

নারী সেটা করছে পুরুষেরই প্রভাবে। পুরুষ যা করছে সেটা পুঁজিবাদের প্রভাব, আবার নারী শিল্পীরা নারীকে যে উপস্থাপন করছে সেটাও সেই একই প্রভাবের কারণে। এটা একটা সার্বিক প্রভাব যা থেকে নারীও মুক্ত হতে পারছে না। নারী কর্তৃক সৃষ্ট পেইন্টিং, চলচিত্র এবং বিশেষ করে বিজ্ঞাপনে নারীকেই যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটা ঐ পিতৃতান্ত্রিকতার কারণে। খোঁজ নিলে জানা যাবে নারী যেসব শিল্প সৃষ্টি করছে সেখানেও সে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল।

হালখাতা

আপনি যে বিজ্ঞাপনের কথা বললেন, সেই রেশ ধরে বলি, কয়েকদিন আগে একটি মোবাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপনে এক নারী মডেল বলছে, 'আমার কলরেট আমার মতো'– এর চেয়ে নোংড়া অপমানকর কোনো কথা তো আর হতে পারে না! এরকম নানা বিজ্ঞাপনে আমাদের প্রচারমাধ্যমগুলো সয়লাব হয়ে আছে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি শিক্ষাঙ্গন বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ডে ঢেকে দেয়া হয়েছে। দেখে মনে হয় এটা কোনো শিক্ষাঙ্গন নয় এটা একটা বিজ্ঞাপনকেন্দ্র। পুরো দেশটার চেহারাই প্রায় এরকম। তো এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সারা দুনিয়াটাকেই পুঁজিবাদ তথা ভোগবাদিতা গ্রাস করে ফেলেছে। আমাদের এখানেও পুঁজিবাদ– তবে আরো নিম্নস্তরের পুঁজিবাদ। কাজেই পুঁজিবাদের যে ধর্ম, সবকিছুকে পণ্য করে ফেলা– এ প্রক্রিয়া আমাদের এখানে আরো কুৎসিত ও বিকৃতভাবে ক্রিয়াশীল। পুঁজিবাদের মধ্যেও একটা উৎপাদনশীলতা থাকে, আমাদের মধ্যে সেই উৎপাদনশীলতাও নেই; আমাদের এখানকার এরা চাচ্ছে উৎপাদন করবে না শুধু ভোগ করবে; শুধু ব্যবহার করবে। এরা শুধু ভোক্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এরা পণ্য উৎপাদন না করে শুধু পণ্য কিনবে আর পণ্য বিক্রি করবে। তো এই পুঁজিবাদই আমাদের এখানে চলছে। যে কারণে পণ্যের চেয়েও পণ্যের বিজ্ঞাপন এদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এটা একটা বিকৃত, অসাড় ও ফাঁপা প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদের মধ্যেও ভালো যে কিছু বিষয়-আশয় থাকে সেটাও এখানে অনুপস্থিত। এই অত্যন্ত নিচু প্রক্রিয়াটি আমাদের গোটা সমাজকে ক্রেতা এবং বিক্রেতায় পরিণত করছে।

হালখাতা

তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে, উৎপাদন থাকলে তো বিজ্ঞাপন থাকবেই– এটা উন্নত পুঁজিবাদেরও কথা। কিন্তু আমাদের অবস্থা হয়েছে, উৎপাদন নেই কিন্তু বিজ্ঞাপন আছে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
হ্যাঁ, ঠিক তাই।

হালখাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গনে যে অসংখ্য বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমার ধারণা বিষয়টি এরকম যে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, শুধু ছাত্রদের বেতন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যেন চলছে না, সে জন্যে কিছু আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি এলাকাকে বিজ্ঞাপনদাতাদের ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা শুধু আয়টাকেই দেখছেন কিন্তু কীভাবে আয় হচ্ছে সেটা তারা বিবেচনা করছেন না।

হালখাতা

এবার আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে আরেকটি প্রশ্ন করব; সেটা হল, লেনিনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার মতে কোন ধরনের শিল্প মহৎ? লেনিন জবাব দিয়েছিলেন যে শিল্পের মধ্যে ক্লাস-স্ট্রাগল নেই সে ধরনের শিল্প নয় বরং যে শিল্পের মধ্যে ক্লাস-স্ট্রাগল আছে অথচ নন্দনতাত্ত্বিক গুণ কিছুটা কম আছে সে ধরনের শিল্পই মহৎ। এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমি মনে করি শিল্পকে সবার আগে শিল্প হতে হবে। এরপর সে শিল্পকে মহৎ হতে গেলে তার ভেতর গভীরতা থাকতে হবে; সেই গভীরতা শ্রেণী-সংগ্রামের উপলব্ধি হতে পারে কিংবা সমাজ পরিবর্তনের অন্য কোনো ধারণা থেকেও আসতে পারে।

হালখাতা

একটা সময় ছিল যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা তত্ত্ব হিসেবে আবিষ্কৃত হয়নি। তখন সমাজ পরিবর্তনের যে কোনো ধরনের প্রক্রিয়া বা প্রবণতা শিল্পে থাকলেই হয়তো সেটাকে মহৎ শিল্প বলা যেত। কিন্তু যখন থেকে সমাজ পরিবর্তনের সর্বাধিক উচ্চমানের একটি প্রক্রিয়া তথা সমাজতন্ত্র 'মার্কসবাদ' হিসেবে আমাদের সামনে এল, যার ওপর বিশ্বব্যাপী বহু মানুষ প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলছে এবং এর চেয়ে উন্নততর কোনো মানবমুক্তির থিওরি আমাদের সামনে এখনও আসেনি; সেই শ্রেণী-সচেতনতা, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত চিন্তা বা দর্শন শিল্পে উপস্থিত না থাকলে তাকে কি আপনি মহৎ-শিল্প বলবেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বর্তমান সময়ে শ্রেণীসংগ্রাম কথাটিকে আলাদা করে আর বলবার দরকার নেই। কেননা এখন সমাজ-পরিবর্তন মানেই শ্রেণীগত আধিপত্যকে ভাঙা ও শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কাজেই এটাকে তত্ত্বের মধ্যে আর রাখার দরকার নেই। এটি নিয়ে এখন আর কারোর দ্বিমত নেই। এটি এখন আর বিতর্কের বিষয়ও নয়। অবশ্যই শিল্পকে

মহৎ হতে হলে তার মধ্যে শ্রেণী-চেতনা নানা রূপে থাকতে হবে। সেটা না থাকলে তার নন্দনগত উৎকর্ষ যতই তৈরি হোক না কেন তার মধ্যে মানবমুক্তির একটি প্রধান শর্ত এবং ইতিহাসের চেতনা – দুটোই অনুপস্থিত থাকে। এরকম শিল্পকে মানুষ গ্রহণ করবে না। আর মানুষ যদি গ্রহণ না করে সেটা মহৎ শিল্পও হবে না।

হালখাতা

লিটলম্যাগাজিন নিয়ে নানা রকম অপপ্রচার রয়েছে। আপনি বলবেন কি লিটলম্যাগাজিন বলতে আমরা কোন্ ধরনের প্রকাশনাকে বুঝব? অর্থাৎ কোনো প্রকাশনাকে লিটলম্যাগাজিন হতে হলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় বলে আপনি মনে করেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

লিটলম্যাগাজিন হল পুঁজিবাদী প্রকাশনার বিরূদ্ধে একটি প্রতিবাদী চিন্তার মুখপত্র। বড় পত্রিকা যারা বের করে তারা তো পুঁজির মালিক; প্রতিবাদীরা দেখে অতবড় জায়গায় গেলে সে হারিয়ে যাবে– সে কারণে ঐ পুঁজিতান্ত্রিক প্রচারমাধ্যমের বিরুদ্ধে ছোট ছোট প্রকাশনা হচেছ লিটলম্যাগাজিন।

হালখাতা

লিটলম্যাগাজিন-এর মতো 'প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা' বিষয়টি নিয়েও নানা রকম অপব্যাখ্যা রয়েছে। 'প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা' বলতেই-বা আমরা কী বুঝব?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা হল পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে এবং লড়াই করবার জন্যে পাল্টা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য থেকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আলাদা। তা না হলে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তো দাঁড়ানো যাবে না, লড়াই করা যাবে না। আবার এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে গেলে তখন কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রয়োজন হবে না, তখন পাল্টা-প্রতিষ্ঠান তৈরিরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। আর পুঁজিবাদের অবসান ঘটে সে জায়গায় যদি নতুন আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলেও কিন্তু প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার দরকার হবে।

কাজেই চূড়ান্ত অর্থে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা মানে এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রয়োজনকে নস্যাৎ করা ।

হালখাতা

ব্যস্ততার মধ্যেও হালখাতাকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

তোমাদের সাথে কথা বলে ভালো লাগল । হালখাতা দীর্ঘজীবী হোক । হালখাতা'র উদ্দেশ্য সফল হোক । তোমাদেরকেও ধন্যবাদ ।

প্র ব ন্ধ

শিল্প-সাহিত্যে উত্তরাধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদ ও রেনেসাঁস

আ বু ল কা সে ম ফ জ লু ল হ ক

সৃষ্টিবৈরী বাস্তবতা

No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher. – ***S.T.Coleridge***

বাংলাদেশের চিন্তাজগত ও শিল্প-সাহিত্য নিয়ে ভাবতে গেলে অনেক কথা মনে জাগে যেগুলো লিখে প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় । কিন্তু পারিনা । চারপাশের দৃশ্যাবলির দিকে তাকিয়ে এ-বিষয়ে লেখা খুব কঠিন মনে হয় । কেমন যেন ভীষণ উন্মাদনার মধ্য দিয়ে চলছেন খুব সক্রিয় লোকেরা, আর অধিকাংশ উদাসীন । এই পরিমণ্ডলে সৃষ্টি কি সম্ভব? বাংলাদেশে চিন্তার ও সাহিত্যের জগতে এখন পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি কোথায়? ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাও কি এখন সৃষ্টিশীল? দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোতে উত্তরকে অন্ধভাবে অনুসরণ

করবার প্রবণতা এখন অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে প্রবল। প্রশ্ন হল, অন্ধ অনুসরণ দ্বারা কি কখনো সৃষ্টি সম্ভব হয়? ইউরো-মার্কিন আধিপত্যমদমত্তরা দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের ওপর হীন উদ্দশ্যে নানা কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীসমূহ এই চাপের মধ্যে পড়ে একেবারেই বিকারপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ অভিহিত হয়েছে 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বলে। এ-নিয়ে বাংলাদেশের লেখক-সমাজে – কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, রাষ্ট্রচিন্তায়, সমাজচিন্তায়, ইতিহাসে, দর্শনে বিশেষ কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কিংবা অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করা যায় না। কী ভীষণ সময় যাচ্ছে ! অক্ষয়দত্ত-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমের কাল, রবীন্দ্র-শরৎ-রোকেয়া-নজরুলের কাল, বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-সুধীনদত্তের কাল, হুমায়ুন আজাদ-তসলিমা নাসরিন-হুমায়ুন আহমেদদের এই কাল – সিভিল সোসাইটি সমূহের বুদ্ধিজীবীদের এই কাল – কত বিভিন্ন! জীবনের অন্তিম পর্যায়ে, আধুনিকতাবাদীদের সামনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি,
ভালো নয় ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি'।

আধুনিকতাবদীদের নৈরাশ্যবাদে রবীন্দ্রনাথ সত্য খুঁজে পেতেন না। আজকের অবস্থা দেখার সুযোগ পেলে কী লিখতেন তিনি?

যখন কোনো লেখক আধুনিকতাবাদী, উত্তরাধুনিকতাবাদী, পরাবাস্তববাদী, অস্তি -ত্ববাদী, মার্কসবাদী, রেনেসাঁসপন্থী (রেনেসাঁসের স্পিরিট আমার অবলম্বন) ইত্যাদির কোনোটি বলে নিজের পরিচয় দেন, তখন তিনি নিজের মানসিক অবস্থাই প্রকাশ করেন। এক-একটি মতবাদের অনুসারী হয়ে এক-একজন ব্যক্তি এক-এক রকম মানসিক অবস্থায় থাকেন। দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপার আজকাল দেখি না, তবে খুব সহজেই অনেকে কোনো-না-কোনো মতবাদের অনুসারী হয়ে পড়েন। যিনি কোনো মতবাদ অনুসরণ করে চলেন তিনি কি নিজের মানসিক অবস্থার স্বরূপ কখনো বুঝতে চেষ্টা করেন? আত্মজিজ্ঞাসা কোথায়? 'আত্মা নং বিদ্ধি' , know thyself– এই বাংলাদেশে এসব কথা ভুলেও এখন কেউ উচ্চারণ করেন না। লেখক-সমাজে সকলেই পরের ত্রুটি সন্ধানে বা পরচর্চায় ব্যস্ত থাকেন। মতবাদ অনুসরণ করতে গিয়ে এখন প্রত্যেকেই অনুসরণ করেন আলোহীন চিন্তার এক-একটি ছকবাঁধা ধারা। সদর রাস্তা খোঁজ না করে কানাগলি দিয়ে চলতে পছন্দ করেন অনেকে। কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠে 'মুক্তবুদ্ধি চর্চা'-র কথা বলেন বটে কিন্তু তাঁদের মধ্যেও স্বাধীন চিন্তাশীলতা একেবারেই দুর্লভ – অন্যদের কথা উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাধীন চিন্তাশীলতা যাঁর মধ্যে নেই তিনি কী করে সৃষ্টি করবেন। সৃষ্টি কি চিন্তা-কাঠামোর কোনো ছাঁচে সম্ভব হয়? সৃষ্টির পূর্বনির্ধারিত কোনো নিয়ম কি তৈরি আছে? সৃষ্টি কি সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত?

জীবন ও জগত, অহং ও ইদং, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ', সুন্দর ও অসুন্দর এবং ন্যায়-অন্যায় ও শুভ-অশুভ ইত্যাদির প্রতি পূর্বোক্ত মতবাদসমূহের

প্রতিটিরই রয়েছে বিঘোষিত বা অঘোষিত আলাদা আলাদা মনোভঙ্গি – আলাদা আলাদা বক্তব্য – আলাদা আলাদা বিচারপদ্ধতি। প্রতিটি মতবাদের মনোভঙ্গি ও বক্তব্য কি তার অনুসারীকে মহৎ সৃষ্টির পথে নিয়ে যায়?

কোনো কোনো দিক দিয়ে এক মতবাদের সঙ্গে অন্য মতবাদের মিলও থাকে। তবে সেটা বড় কথা নয়, স্বাতন্ত্র্যটাই মূল; সেজন্যই একই দেশ-কালের হয়েও তারা আলাদা। বাস্তবে তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। এইসব মতবাদ একে অন্যের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে, সৃষ্টির পক্ষে তা কতটা অনুকূল?

লেখার জগতে যখন কোনো কেউ ঘরানায় কিংবা দলে যোগ দিয়ে গতানুগতিক চিন্তা-চেতনা, চলমান আবেগ-উত্তেজনা, অন্ধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও জয়-পরাজয়ের উন্মত্ততায় ডুবে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেন, তখন তিনি প্রচারমাধ্যমে ও লোকমুখে প্রভুত আলোচনার বিষয় হলেও লেখক হিসেবে আর উল্লেখযোগ্য থাকেন না। সময়ের ব্যবধানে সৃষ্টির ইতিহাসে তিনি বড় জোর নাম উল্লেখের দাক্ষিণ্য মাত্র আশা করতে পারেন – তাও সৃষ্টির জন্য নয়, সৃষ্টির পরিমণ্ডলকে প্রভাবিত করার জন্য। শুভ প্রভাব কি?

লেখার জগতে জয়-পরাজয়ের প্রতিযোগিতায় নেমে কেউই নিজের সৃষ্টিশক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারেন না। সৃষ্টিশক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য মূলত দরকার হয় সত্যসন্ধ গ্রহিষ্ণু মনোভাব। প্রত্যেক কালে প্রত্যেক ভাষাতেই বহু লেখক থাকেন। প্রত্যেকেই নিজের কর্মের মাধ্যমে নিজের অনুভূতি, উপলব্ধি, চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করবেন – এটাই স্বাভাবিক। সকলের অধিকার স্বীকার করতে হবে। নানা মত প্রকাশের সুযোগ রাখতে হবে। সেখানে অন্যকে পরাজিত করার মনোভাব কতটা বাঞ্ছনীয়। নিছক জয়-পরাজয়ের মনোভাব কি আদৌ বাঞ্ছনীয়? লেখক-সমাজে দরকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সত্যের সন্ধান। সত্যের সন্ধানে কোনো পর্যায়ে যিনি নিজেকে নির্ভুল প্রমাণ করেন তিনি যেমন অবদান রাখেন, তেমনি যিনি ভুল করেন তিনিও অবদান রাখেন। কেবল একজনের কিংবা এক পক্ষের দ্বারা সত্যের পথে অগ্রগতি হয় না। সত্যসন্ধ হলে উভয়েই কিংবা উভয়পক্ষই সৃষ্টিশীল ও শ্রদ্ধাযোগ্য। সৃষ্টিশীল সত্যনিষ্ঠ প্রয়াসে সরূপ-বিরূপ আলোচনা অনিবার্য ও অপরিহার্য। সংগ্রামের যেমন দরকার আছে, তেমনি আপোসেরও দরকার আছে। একপক্ষ অন্যপক্ষকে নির্মূল করে দিতে চাইলে তা পারবে না। মূলোৎপাটন করার
কিংবা উৎখাত করার ধারণা ঠিক নয়। অনুতাপহীন অপরাধীদের কথা ভিন্ন।

পরম সত্য হল এমন একটা কিছু যার মধ্যে সকলের জন্য পরম কল্যাণ, পরম সুন্দর, পরম ন্যায় অস্তিমান। সত্য বাস্তব নয়, কল্পিত। সত্য বাস্তব নয়, আদর্শ। আদর্শ হল কল্পিত বাস্তব, বর্তমান বাস্তবে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের যে বাস্তবে মানুষ উত্তীর্ণ হতে চায় সেই বাস্তব। চিন্তা দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, সম্ভাব্যতা বিচার করে মানুষ আদর্শ সৃষ্টি করে। সত্য কোনো চূড়ান্ত ব্যাপার নয় – সত্য বিকাশশীল। বিকাশশীল প্রকৃতিতে

সত্যও বিকাশশীল। তথ্যের ভিত্তিতে সত্যের ধারণাকে রূপ দেয়া হয়। নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্যের ধারণা পরিশোধিত, পরিমার্জিত, বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়। এ পর্যন্ত মানবজাতির গোটা ইতিহাসেই সত্য অধরা। অনন্তকাল কি সত্য অধরাই থাকবে? আমরা জানি না। কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, ভালো জীবনের জন্য সত্যকে অভিষ্ট করতে হয় – বিকশিত করতে হয় – সন্ধান করতে হয়। ভবিষ্যতেও করতে হবে। সত্যের অবলম্বন ও কল্পনা ছাড়া জীবন অর্থহীন। কোনো মতবাদে দীক্ষা নিলেও তা করতে হবে। যে-মতবাদ নিজের মধ্যে সত্যকে স্থান দেয় না, সে মতবাদ পরিত্যাজ্য। Fact ও Truth এক নয়। Fact-কে ভিত্তি করেই Truth-এ পৌঁছুতে হয় এবং Truth-কে অবলম্বন করে সৃষ্টির পথে চলতে হয়। সত্যকে যিনি এভাবে উপলব্ধি করবেন, শিল্প-সাহিত্যর ক্ষেত্রে এসে তিনি জয়-পরাজয়ের অন্ধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মত্ত হতে পারবেন না। লাভ-ক্ষতির, সাফল্য-ব্যর্থতার কিংবা জয়-পরাজয়ের বোধ তাঁর মনে দানা বাঁধতে পারে না। ভুল করতে পারেন তিনি, ভুল শোধরাতেও পারেন। প্রতিপক্ষের কাছ থেকেও গ্রহণীয় কী পাওয়া যায়, তাই তিনি খোঁজ করেন। দান ও গ্রহণ দুটোই তাঁর কাছে মূল্যবান। সাধারণভাবে তিনি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনুভূতিশীল থাকবেন। সহজে কাউকে তিনি শত্রু মনে করবেন না। চারপাশে লেখক-সমাজে দেখতে পাই কেবল দান করার বাসনা, গ্রহিষ্ণুতার নিদারুণ অভাব। Live and let others live. Love and be loved.–এসব উক্তি হবে একজন লেখকের চলার পথে সামাজিক নীতি। প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতাও থাকবে। ঐক্য এবং বিরোধ, বিরোধ এবং ঐক্য – দুটোকেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন। বিরোধ হবে প্রতি বিষয়ে সত্যের স্বরূপ ও সত্য প্রতিষ্ঠার উপায় নিয়ে। পরম সত্য হবে ধ্রুব। অন্যের ভুল সন্ধান করার সময়ে নিজের ভুলও তিনি সন্ধান করবেন। পরিশোধন ও সংশোধন হবে তাঁর কাম্য। পরাজিত করার মনোভাবও তাঁর থাকবে, কেবল অনুশোচনাহীন অপরাধীকেই তিনি পরাজিত করতে চাইবেন, অন্যকে নয়। যাঁকে-তাঁকে তিনি অনুশোচনাহীন অপরাধী গণ্য করবেন না, চলতি উত্তেজনায় হারিয়ে যাবেন না, এ ক্ষেত্রে তাঁর থাকবে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান। মানবস্বভাব শোধনীয় – একথা তিনি মনে রাখবেন। দ্বন্দ্বদর্শনে (dialectics) ঐক্য–> বিরোধ–> ঐক্য হবে তাঁর মূলনীতি। কেবল অনুশোচনাহীন অপরাধীদের বেলায় হবে ভিন্ননীতি: ঐক্য–> বিরোধ–> জয়-পরাজয়। ধনাত্বক, সদর্থক, ইতিবাচক, positive দৃষ্টিভঙ্গি হবে একজন প্রকৃত শিল্পী কিংবা লেখকের অন্তর্গত চালকশক্তি।

অত্যুন্নত প্রযুক্তির এই কালে পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা ঝলমলে চেহারা নিয়ে ক্রমাগত বিপুল থেকে বিপুলতর সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। শিল্পকলাও হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রসার প্রিন্ট মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রসারকে খর্ব করছে না। ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের ব্যবহার বাড়ছে এবং এসবের মাধ্যমে যে-কোনো

বিষয়ে মানুষ খুব সহজে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে ও প্রচার করতে পারছে। যে-কোনো বিষয়ে কাজ করতে গেলে তার জন্য কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তথ্যের সুবিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। এ-অবস্থায় তথ্যের বিপুলতাই কাজকে কঠিন করে তোলে। বাস্তবে দেখা যায়, এইসব তথ্য-উপাত্ত যেভাবে থরে থরে সাজানো পাওয়া যায় তাতে মানুষের অনুভূতি ও চিন্তার ভালো দিকগুলো পরিপুষ্ট হওয়ার সুযোগ পায়না। গবেষণায় ও সাংবাদিকতায় মূল্যনিরপেক্ষ (Value free) বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশনার নামে যা কিছু উপস্থাপন করা হচ্ছে তাতে ভালো ও মন্দ একাকার হয়ে সামনে আসছে, এবং তার মধ্যে মন্দেরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ও সুন্দর-কুৎসিতের বিবেচনা স্থান পায় না গবেষণায় ও সংবাদ পরিবেশনে। মনের দিক দিয়ে, চিন্তা-চেতনা ও বিচার-বিবেচনার দিক দিয়ে সাধারণভাবে মানুষ এখন পতনশীল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মূল্যবোধের দিক দিয়ে মানুষের অবস্থা প্রায় এক রকম। গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা ও ভালো চিন্তা দানা বেঁধে ওঠার আগেই ভেঙে পড়ছে। অশুভ শক্তির মোকাবিলায় শুভ শক্তি পরাজিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে, ব্যর্থ হচ্ছে। যান্ত্রিক প্রাচুর্যের মধ্যে খুব দ্রুতগতিতে চলছে সবকিছু যা মাত্র একশো বছর আগের মানুষেরা কল্পনাও করতে পারত না। এ-অবস্থায় বই ও পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে– লেখক ও লেখা সম্পর্কে – চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতি-উপলব্ধির অগ্রগতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে খোঁজ-খবর রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। যে-অবস্থা বিরাজ করছে তাতে, কোনো বিষয়ে সব দিক বিবেচনা করে, সামান্যধর্ম নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। যদি মূল্যবোধ সক্রিয় থাকত, মূল্যবিচার বিকশিত হত তাহলে এ-সমস্যা এত প্রকট হত না।

লেখকদের নানা ঘরানা আছে। ঘরানার বাইরে কারো পক্ষে লেখক হিসেবে অস্তিমান থাকা সম্ভব হয় না। কেউ স্বাধীনভাবে কোনো ভালো কাজে অগ্রসর হলেই তাঁকে নানা রকম ব্রান্ড দিয়ে তার অগ্রগতিকে বানচাল করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। মহৎ সৃষ্টি সন্ধান করতে গেলে দেখা যায়, প্রতিটি ঘরানাই ব্যর্থ, নিষ্ফল, বন্ধ্যা। হয়তো মহৎ কোনো লক্ষই অধিকাংশ ঘরানার থাকেনা। সৃষ্টিশীল কাজের পক্ষে কোনো কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়াসও সফল হয় না। এ এক অদ্ভুত বাস্তবতা। ঈর্ষা-বিদ্বেষ আছে, দলাদলি আছে, উত্তেজনাও আছে, কিন্তু ভালো অর্থে লেখকদের কোনো দল নেই– সংগঠন নেই। প্রচলিত রাজনীতির উত্তেজনার ধারায় হারিয়ে-যাওয়া লেখকদের একটি অংশ অতীতমুখী দৃষ্টি নিয়ে জনসাধারণকে ভাগ করে 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তি' বলে, এবং অপর একটি অংশ অতীতমুখী দৃষ্টি নিয়ে জনসাধারণকে ভাগ করে 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের পক্ষশক্তি এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিপক্ষশক্তি' বলে। দুই পক্ষেরই কর্তাব্যক্তিরা এই বিভেদকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপ দিয়ে রেখেছেন। এনজিও-কর্তারা এবং সিভিল সোসাইটিসমূহের বুদ্ধিজীবীরা বিদেশি প্রভুদের আর্থিক মদদে বিদেশি

প্রভুদের প্রকল্প ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেন এবং প্রচার চালান। দেশি-বিদেশি প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তাঁদের দখলে আছে। সমালোচনা বলে কোনো জ্ঞানশাখাকে বিকশিত করা হচ্ছে না। ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করা হচ্ছে না। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্ম–সবকিছুকেই করে ফেলা হয়েছে অর্থহীন। লেখক মহলে একে অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিই খোঁজ করেন, গুণের দিকে কমই তাকান।

এই পরিস্থিতিতে যে যার খুশি মতো লিখে চলছেন। ধর্ম, নারী ও রাজনীতি বিষয়ে উষ্কানিমূলক লেখা খুব জনপ্রিয় হয়েছে। জনপ্রিয়তার আকর্ষণে এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের তাড়নায় কিছু লেখক কল্যাণবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে রুচি ও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে এ-ধারায় অনেক দূর এগিয়ে গেছেন এবং নিজের জীবনকে পর্যন্ত বিপন্ন করেছেন। তসলিমা নাসরিন নানা দেশে প্রবাসী, হুমায়ুন আজাদ প্রাণ হারিয়েছেন, জাহানারা ইমাম মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে লড়তে মামলা নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন, আহমদ শরীফ তেইশটি মামলা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোর্টে হাজিরা দিতে দিতে এবং শওকত ওসমান 'শেখের সম্বরা' ও 'রাহনামা' লিখতে লিখতে মারা গিয়েছেন। বেতার তরঙ্গে বিবিসি ভীষণভাবে তৎপর ছিল মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও নারীবাদী আন্দোলন পরিচালনায়। দৃশ্যের অন্তরালে থেকে যারা কাজ করছে তাদের বাদ দিলে, বিবিসিই এইসব আন্দোলনের উদ্গাতা। বাংলাদেশের কথিত প্রগতিশীল লেখকেরা ভীষণভাবে মত্ত হয়েছিলেন এইসব আন্দোলনে। ফলাফলের কথা, পরিণতির কথা, বিবিসির দুরভিসন্ধির কথা তাঁরা ভাবতে চাননি। স্থানীয় প্রচারমাধ্যমগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে বিবিসির প্রচারধারণাকে – কোনো বিচার-বিবেচনা দেখা যায়নি। গতানুগতির বাইরে বিশ্লেষণমূলক ও বিচারমূলক চিন্তা-ভাবনাও দেখা গেছে। কিন্তু প্রচারমাধ্যম সেগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি, কোনো ঘরানা সেগুলোর প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রসারিত করেনি, পক্ষ-বিপক্ষ নির্দেশক দুটি শক্তিই সেগুলোকে নির্মূল করতে চেয়েছে।

এই সৃষ্টিবৈরী বাস্তবতায় জ্ঞানের জগতে, সাহিত্য ও শিল্পকলার জগতে ইংরেজির অনুসরণে 'আধুনিকতা' ও 'উত্তরাধুনিকতা' কথাদুটো খুব উচ্চারিত হয়। লেখার জগতে, আঁকার জগতে যাঁরা বিশেষভাবে সক্রিয়, তাঁদের অধিকাংশই হয় 'আধুনিক' না -হয় 'উত্তরাধুনিক'। কথাদুটো আসলে হওয়া উচিত 'আধুনিকতাবাদী' ও 'উত্তরাধুনিকতাবাদী'; ইংরেজিতে কথা দুটো modernism' ও post-modernism. Modern, modernity, modernisation, modernism ইত্যাদি কথার অর্থে পার্থক্য আছে। আভিধানিক কিংবা বুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে বুঝতে গেলে ভুল হয়। সংশ্লিষ্ট মতবাদীরা কী-অর্থে এসব কথা ব্যবহার করেন, সেটাই আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। উদ্দেশ্য ও ফলাফলও বিচার করতে হবে। আধুনিকতাবাদীরা ও উত্তরাধুনিকতাবাদীরা রেনেসাঁসের প্রতি বিরূপ।

সৃষ্টির জগতে মতবাদ থাকে, স্বাধীন চিন্তাশীলতাও থাকে। বাংলাদেশের ভাবের জগতে স্বাধীন চিন্তাশীলতার কোনো স্থান রাখা হচ্ছে না। সৃষ্টিশীলতার শর্ত তৈরি করতে হলে নতুন অনুসন্ধিৎসা যেমন দরকার, তেমনি দরকার প্রচলিত চিন্তা-চেতনার প্রকৃতিকে বোঝা। নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে হলে অতীত সম্পর্কে প্রচলিত চিন্তা-ভাবনাকেও পুনর্গঠিত করতে হয়। এজন্য রেনেসাঁস, আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ – এই তিনটি বিষয়কেই এখন এক সঙ্গে পরিপূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে দেখা দরকার। এখানে খুব সংক্ষেপে আমি বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার কিছু উপলব্ধি ব্যক্ত করব। মূলত আমি চাইব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে। বহুজনের আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে পরিশোধিত, বিকশিত ও কার্যকর করে তুলতে পারব।

উত্তরাধুনিকতাবাদ

উত্তরাধুনিকতাবাদ কথাটা আলোচনায় আসে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদির রূপরীতি প্রসঙ্গে, শিল্পকলা ও সাহিত্যের দর্শন বা তত্ত্ব হিসেবে, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি চর্চার নীতিগত ও আদর্শগত অবলম্বন হিসেবে, এবং সাধারণভাবে সৃষ্টির ও অগ্রগতির মতবাদ হিসেবে। উত্তরাধুনিকতাবাদ তার গ্রহীতাকে দেয় এক বিশেষ মানসিক অবস্থা। মতবাদটি কেবল চিন্তায় ও তত্ত্বায়নে সীমাবদ্ধ নেই, বিশ্বব্যাপী নানা ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নের কার্যক্রমও চালানো হচ্ছে। সবকিছু যে সরাসরি হচ্ছে, তা নয়; জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কূটনীতি আছে। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়নবিদ্যা, তথ্য ও প্রচারনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক, বিশ্বব্যবস্থা-বিষয়ক তত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ইত্যাদিতে উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রয়োগ আছে। গোটা বিশ্বব্যবস্থাকে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে সমাজব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতিকে এই মতবাদের ধারায় পরিচালনা ও পুনর্গঠন করা হচ্ছে। প্রচলিত বিশ্বায়নের মতবাদ বা বিশ্বয়নবাদ এখন উত্তরাধুনিকতাবাদের অন্তর্গত। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উত্তরাধুনিকতাবাদ ব্যবহৃত হচ্ছে প্রচলিত বিশ্বায়নবাদের বাস্তবায়নের কাজে। এর জন্য বিশ্বব্যাপী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা ও মন-মানসিকতাকে পুনর্গঠন করা হচ্ছে। সবকিছুই যে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী কিংবা সম্মতিক্রমে করা হচ্ছে, তা নয়; মানুষের উদাসীনতার সুযোগ নেয়া হচ্ছে, মানুষকে বাধ্য করা হচ্ছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে, ফাঁদে ফেলে, লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, বিপদে ফেলে। প্রয়োজন অনুযায়ী জনগণের মগজ ধোলাই করার উদ্দেশ্যে ছোট বড় বহুবিধ পরিকল্পনা ও প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ চালানো হচ্ছে, অত্যুন্নত সব প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়কে এবং শিল্প-সাহিত্যকে উত্তরাধুনিকতাবাদ নিজের মধ্যে টেনে নেয় এবং এসবের চর্চার জন্য চর্চাকারীকে চিন্তার নির্দিষ্ট ছক বা ফর্ম বেঁধে

দেয়, মেনে চলার মতো নীতি-বিধিও দিয়ে দেয় – চর্চাকারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার বৈশিষ্ট্যও স্থির করে দেয় এবং চলার পথ দেখিয়ে দেয়। এতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ কমে যায়।

উত্তরাধুনিকতাবাদের শাখা-প্রশাখা-সংবলিত সার্বিক রূপকে সাধারণত কেউ সামনে আনেন না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিসরে খণ্ডিতভাবে ধরে এ নিয়ে মত প্রকাশ করা হয় – অনুশীলন চালানো হয়। বিশ্বপরিসরে ব্যাপারটিকে তলিয়ে দেখলে দেখা যায় – এ নিয়ে নানাজন নানাভাবে চিন্তা করতে ও মত প্রকাশ করতে পারেন, তবে এর লক্ষ স্থির করা আছে এবং এর পরিচালনায় কর্তৃপক্ষও আছে। চিন্তা ও মতামত যাই প্রকাশ করা হোক, শেষ পর্যন্ত সব কিছুকেই পরিচালনা করা হয় পূর্বনির্ধারিত লক্ষ অভিমুখে। কিন্তু লক্ষ স্পষ্ট করা হয় না – উপযোগিতাও বোঝা যায় না।

যে কোনো ধর্ম বা মতবাদের বেলায় যেমন ঘটে, উত্তরাধুনিকতাবাদের বেলায়ও তেমনি ঘটে – অনুশীলনকারীর চিন্তা ও কর্মের সীমা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। শাস্ত্রীয় যুক্তি আর শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তির পরিসর এক নয়। মতবাদ-অবলম্বনকারী আর মতবাদনিরপেক্ষ ব্যক্তির যুক্তির পদ্ধতি ও পরিসরও এক নয়। দুইজনের যাত্রাপথ ও গন্তব্য ভিন্ন। মনে হয়, কোনো উত্তরাধুনিকতাবাদীর অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তা স্বাধীন অনুশীলনের (independent praxis) অনুকূল নয়। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকলা – যে বিষয়ের কথাই বলি না কেন – সৃষ্টির জন্য চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা খুব দরকার। মূল্যবোধ ও ভালো-মন্দ বিচারের দরকার আছে। তবে চিন্তনপদ্ধতিকে পূর্বনির্ধারিত কোনো ছাঁচে ফেলে দিলে সাধারণত তার ফল শুভকর হয় না। শিল্পকলা, সাহিত্য ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি ছাঁচে পিঠা তৈরি করার মতো কোনো ব্যাপার নয়।

আদর্শ ও নীতির দরকার আছে। কিন্তু যে-কোনো আদর্শ ও যে-কোনো নীতি কল্যাণকর নয়। নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রেও বিচার-বিবেচনা, বাছাই করে নেয়া ও উদ্ভাবনশীলতা দরকার। সভ্যতা-সংস্কৃতির বড় রকমের অগ্রগতি ধর্ম ও আদর্শ অবলম্বন করেই হয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও আদর্শের অপব্যবহারও অনেক হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার হচ্ছে গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অর্থনৈতিক শোষণ, দুর্নীতি ও আরো বহুরকম অপকর্ম চালানো হচ্ছে। এক সময়ে ধর্মের অপব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়েছে, এখন হচ্ছে গণতন্ত্রের। এ-অবস্থায় ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। চলমান অবস্থায় ধর্মীয় ধারা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। প্রচলিত বিশ্বায়নবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদকে নিঃশর্তে বরণ করে নেয়া কি মানবজাতির জন্য কল্যাণকর হচ্ছে? কোন্ ভবিষ্যতের দিকে মানবজাতি পরিচালিত হচ্ছে? শিল্পী-সাহিত্যিকেরা কি এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেন? শিল্প-সাহিত্যের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধুনিকতাবাদী উদ্দেশ্য, আধুনিকতাবাদী উদ্দেশ্য এবং রেনেসাঁসের স্পিরিট সমধর্মী নয়। আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ কি রেনেসাঁসের বিবেক-বুদ্ধিসঞ্জাত অগ্রগতি?

উত্তরাধুনিকতাবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। মনে হয়, এই মতবাদের প্রবক্তাদের ও অনুসারীদের নিজেদের মধ্যেই নিজেদের মতবাদ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট নয়। উত্তরাধুনিকতাবাদ কী এবং কী নয় – যে কোনো দিক থেকে এ প্রশ্ন তোলা হলে প্রথমেই বলা হয়: উত্তরাধুনিকতাবাদ এখনো স্পষ্ট রূপ লাভ করেনি, গঠনশীল পর্যায়ে আছে। এই সূচনামূলক বক্তব্যের পর যেসব কথা বলা হয় কিংবা লেখা হয়, সেগুলো থেকে আসলেই মতবাদটি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা যায় না। কিছু ধারণা লাভ করা গেলেও উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। উদ্দেশ্য কিছুটা বোঝা গেলেও তাকে তুচ্ছ মনে হয়। অথচ এরই মধ্যে ফরাসি, ইংরেজ, জার্মান, আমেরিকান প্রভৃতি জাতির ভাষায় ১৯৬০-এর কিংবা '৭০-এর দশক থেকে সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টির নতুন মতবাদ হিসেবে উত্তরাধুনিকতাবাদ উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়ে আসছে। ক্রমে উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রত্যয়টি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি সকল জ্ঞানশাখায় বিস্তার লাভ করেছে। গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে মতবাদটি নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনেক লেখালেখি ও আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে। বাংলা ভাষায়, কলিকাতায় ও ঢাকায়, ১৯৮০-র দশক থেকে উত্তরাধুনিকতাবাদ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লেখালেখি চলছে, প্রবন্ধাদি বিস্তর প্রকাশিত হয়েছে, অনুবাদ হয়েছে, বইপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায়ও মতবাদটি স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন কোনো রূপ লাভ করেনি। তবু দেখা যাচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঢাকার তরুণ সাহিত্যপ্রয়াসী ও জ্ঞানপ্রয়াসীদের কাছে উত্তরাধুনিকতাবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয় মোহকর মতবাদ। ঢাকার প্রবীণ ও তরুণ লেখকেরাও বলে থাকেন, মতবাদটি এখনও রূপ লাভ করেনি, গঠনশীল বা ফরমেটিভ পর্যায়ে আছে। মনে হয় দরিদ্র বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের রাজনীতিতেই তরুণ সৃষ্টি-প্রয়াসীদের কাছে পোস্ট-মডার্নিজম বা উত্তরাধুনিকতাবাদ আকর্ষণীয় মতবাদ।

'আত্মা নং বিদ্ধি', 'know thyself', 'a life unexamined is not worthliving', 'live and let others live', 'love and be loved'– এসব উক্তির মধ্য দিয়ে যে জীবন-জগতদৃষ্টির প্রকাশ, উত্তরাধুনিকতাবাদীরা তার প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করেন না। তাঁদের যুক্তির ধারা অনুসরণ করলে এটাই মনে হয় যে, এ ধারার চিন্তার প্রতি তাঁরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

উত্তরাধুনিকতাবাদীরা শিল্প-সাহিত্যচর্চার ও জ্ঞানচর্চার আদর্শকে জীবনাদর্শ থেকে আলাদা করে দেখেন। জীবনদর্শনে তাঁদের আগ্রহ দেখা যায় না। কলাকৈবল্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির মতোই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রায় সবকিছুকেই আলাদা-আলাদাভাবে, খণ্ড-খণ্ড রূপে তাঁরা তাঁদের মতবাদের মধ্যে টেনে আনেন; তা-সত্ত্বেও তাঁদের কোনো সংহত সর্বাঙ্গীন দর্শন নেই। বিভিন্ন ধারার, বিভিন্ন বিষয়ের, বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিন্তার মধ্যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও, সমন্বয় সাধন করার কিংবা পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা তাঁরা করেন না। এ-ব্যাপারটিকে তাঁরা অত্যুন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই কালে অসম্ভব কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

উত্তরাধুনিকতাবাদীরা রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেন্টের বিরোধী। জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে তাঁরা সব সময় রেনেসাঁসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

উত্তরাধুনিকতাবাদীরা জাতিরাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদির বিরোধী; জাতি ও রাষ্ট্রের বেলায় 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', unity in deversity – নীতির বিরোধী। Pluralism in culture – এর কথা বলে তাঁরা diversity and only diversity – নীতি প্রচার করেন। 'বাংলাদেশ কোনো এক জাতির রাষ্ট্র নয়' – একথা বলে তাঁরা বাংলাদেশে অনেকগুলো পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির অস্তিত্ব দেখাবার চেষ্টা করেন। মনে হয় তারা খুব শীঘ্র জাতীয় সংস্কৃতি, জাতি ও জাতিরাষ্ট্রের অবসান কামনা করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের প্রতি তাঁদের মনোভাব কী?

সাহিত্য ও সঙ্গীতের বেলায় তাঁরা ক্লাসিক ও ক্লাসিকাল ধারা পরিহার করে কেবল লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করেন। মৌলবাদ-বিরোধিতা, নারীবাদ, লোকঐতিহ্য, নিম্ন বর্গ ইত্যাদিতে তাঁরা পরম গুরুত্ব দেন। তাঁদের কাছে মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের চেয়ে লালন, হাছন রাজা অনেক বড়।

তাঁরা লেখার অন্তর্গত অনুভূতি, আবেগ ও চিন্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল রূপ-রীতি ও নিয়ম-পদ্ধতির উৎকর্ষে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা পছন্দ করেন না। সব কিছুকে তাঁরা খণ্ডিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খণ্ড খণ্ড, আলাদা-আলাদা করে দেখতে পছন্দ করেন।

এমনিভাবে উত্তরাধুনিকতাবাদ সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায়, গত অর্ধশতাব্দীর অগ্রগতির, তত্ত্বায়নের ও ইজম প্রচারের ইতিহাস তুলে ধরা যায়। এ-বিষয়ে লেখালেখির অন্ত নেই। যাঁরা আগ্রহ বোধ করেন তাঁরা সাহিত্যের বাজারে – জ্ঞানের বাজারে এ-বিষয়ে যেসব বই পাওয়া যায় সেগুলো পড়ে দেখতে পারেন। এই মতবাদের সঙ্গে বহু ব্যক্তির এবং খণ্ড খণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ইজ্‌মের নাম যুক্ত আছে। সেগুলো নিয়ে অনেকেই লিখছেন। সেগুলোর পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজন।

উত্তরাধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদেরই সম্প্রসারণ। আধুনিকতাবাদের মধ্যে আছে অনেক ইজম। সেইসব ইজমের সংখ্যা বাআতে বাড়াতে এক পর্যায়ে এসে তাঁরা নিজেদের জন্য আধুনিকতাবাদের বদলে উত্তরাধুনিকতাবাদ কথাটি গ্রহণ করে নিয়েছেন।

আধুনিকতাবাদ

উত্তরাধুনিকতাবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, নয়া-উপনিবেশবাদী বিশ্বব্যবস্থা যখন রূপ লাভ করেছিল সেই সময়টাতে– ১৯৬০-এর ও '৭০-এর দশকে। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে এর বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এই মতবাদের বিস্তার দ্রুততর হয় ১৯৯০-এর দশক থেকে– সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়ায় এবং বিশ্বায়নবাদের

বা এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার মতবাদের (unipolerism) উদ্ভবের পরে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উত্তরাধুনিকতাবাদকে নানাভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় পৃথিবীর দুর্বল দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের সকল রাজধানীতে। আধুনিকতাবাদের উদ্ভবকাল নির্দেশ করা হয়েছে ১৮৯০-এর দশকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগের পর্যায়ে– পুঁজিবাদী-উপনিবেশবাদী বিশ্বব্যবস্থার সঙ্কট ও বিশ্বযুদ্ধ যখন ঘনিয়ে আসছিল সেই সময়ে। ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে ১৯৩০ পর্যন্ত এর আয়ুষ্কাল দেখনো হয়েছে। কিন্তু আসলে ইউরোপে ও উত্তরামেরিকায় আধুনিকতাবাদের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে উত্তরাধুনিকতাবাদের দানা বেঁধে ওঠার আগ পর্যন্ত। তার পরেও ক্ষীয়মান ধারায় আধুনিকতাবাদ বহমান থাকে তবে তখন উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও বিস্তারই প্রধান হয়ে ওঠে। আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ– দুটোই নতুনত্ব প্রয়াসী। তবে নতুন যা সামনে আসে তার ভালো-মন্দ বিচারে এরা নিঃস্পৃহ। উত্তরাধুনিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ আধুনিকতাবাদের সঙ্গে মোকাবিলা করে কিংবা আধুনিকতাবাদকে বাতিল করে বা উৎখাত করে বা আপসারিত করে ঘটেনি – আধুনিকতাবাদের বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ঘটেছে। সেকারণেই বলেছি উত্তরাধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদেরই সম্প্রসারণ।

আধুনিকতাবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল, বিকশিত হয়েছিল এবং বিস্তার লাভ করেছিল স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা ও সাহিত্য সৃষ্টির নতুন মতবাদ হিসেবে। এর বাইরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই এর প্রসার বা প্রয়োগ দেখা যায়নি। তবে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে modernism বা আধুনিকতাবাদ কথাটা পাওয়া যায়। বিশ শতকের প্রথম পাদে ইউরোপে ক্যাথলিক গির্জার পরিমণ্ডলে modernism নামে গির্জাকেন্দ্রিক একটি মতবাদ দেখা দিয়েছিল এবং তা নিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এই আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়েছে: "The Modernists do not form an organized party; they have no programme. They are devoted to the Church, to its traditions and associations, but they look on Christanity as a religion which has developed and whose vitality depends upon its containing to develop. They are bent on reinterpreting the dogmas in the light of modern science and criticism." এই খ্রিস্টীয় আধুনিকতাবাদের সঙ্গে শিল্পকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত আধুনিকতাবাদের সম্পর্ক পাওয়া যায় না। খ্রিস্টীয় আধুনিকতাবাদ আমাদের বিবেচ্য নয়; শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ক আধুনিকতাবাদই বিবেচ্য।

আধুনিক, আধুনিকতাবাদ, modern, modernism – এসব কথা আজকাল নানা জন নানা অর্থে ব্যবহার করে চলছেন। আধুনিকতাবাদ নিয়ে চিন্তা করার ও মত প্রকাশ করার সময়ে আমরা কোন কথা কোন অর্থে ব্যবহার করি, তা অন্তত আমাদের নিজেদের কাছে স্পষ্ট থাকা উচিত। ইংরেজি ও বাংলা অভিধানগুলোতে এসব শব্দের

যে অর্থ পাওয়া যায়, তাতে শিল্পকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত আধুনিকতাবাদের অর্থ ধরা পড়ে না। শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রায়োগিক অর্থের মধ্যে মিল কম ক্ষেত্রেই আছে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতাবাদীরা আধুনিকতাবাদ বলতে কী বুঝিয়েছেন তা অনুধাবন করেই আধুনিকতাবাদের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে হবে। সে কথায় একটু পরে আসছি।

বিভ্রান্তিমুক্ত থাকার জন্য মতবাদের অর্থের সঙ্গে আভিধানিক অর্থের ভিন্নতা ছাড়াও আরো একটি ধারণা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনো জাতির কিংবা মানবজাতির ইতিহাসকে যখন প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ – এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়, তখন তাতে 'আধুনিক' কথাটা দ্বারা যা বোঝানো হয় তাও শব্দটির আভিধানিক অর্থের সঙ্গে অল্পই সম্পর্কিত। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, আধুনিক যুগের সূচনা আর রেনেসাঁসের সূচনা একই দিনে – একই ঘটনা দ্বারা। রেনেসাঁসের স্পিরিট ও কর্মকাণ্ড দিয়েই আধুনিক যুগের (অন্তত প্রথম পর্যায়ের) বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়। জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে চিন্তা ও কল্পনা করা, ইন্দ্রিয়াতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার না করা, মানুষকে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিয়ে চিন্তা ও কাজ করা, মানুষকে কর্তার আসনে অধিষ্ঠিত করে মানুষেরই ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রয়াসে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যসম্পাদন, প্রকৃতির রহস্য ভেদ করে প্রকৃতির উপাদান ও শক্তিকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো, ঈশ্বরকেন্দ্রিকতার স্থলে মানবকেন্দ্রিকতা, পরলোকচর্চার স্থলে ইহলৌকিক চিন্তা ও চর্চা, মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনা ও সৃষ্টিশীলতার বিশ্বাস, মানববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সর্বজনীন কল্যাণপ্রয়াস, মানুষের অধিকার, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি যেমন রেনেসাঁসের, তেমনি আধুনিক যুগেরও বৈশিষ্ট্য। শব্দার্থজ্ঞাপক কোনো অভিধানেই 'আধুনিক' কথাটার এই রকম অর্থ দেয়া নেই। ইতিহাসের 'আধুনিক যুগ' কথাটির মধ্যে 'আধুনিক' শব্দটির যে অর্থ বিধৃত আছে, তার সঙ্গেও 'আধুনিকতাবাদ'-এর সঙ্গতি নেই।

বিশ শতকের শুরুতে ইতিহাসবিদদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আঁচ করেছিলেন, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় বিচলিত হয়েছিলেন, decline of the West থেকে West-কে উদ্ধার করার কথা ভেবেছিলেন, ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে সময়ের বৈশিষ্ট্য বদলে যাচ্ছে দেখে তাঁদের কেউ কেউ ইতিহাসের যুগবিভাগ (periodisation) নিয়ে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন। প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগ কতকাল চলবে – এ প্রশ্ন তাঁদের মধ্যে জেগেছিল। তখন post-modern times কথাটা উচ্চারিত হয়েছিল। সেটা ইতিহাসের যুগবিভাগের ব্যাপার। সে ধারার চিন্তার অগ্রগতি হয়নি। শিল্পকলা ও সাহিত্যের বেলায় চিন্তার ওইসব ধারা থেকে mordernism বা আধুনিকতাবাদ আসেনি। এই মতবাদের উদ্ভব শিল্প-সাহিত্যের পরিমণ্ডল থেকেই। বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত সুন্দর মোহনীয় ভাষায় তাঁর 'শার্ল

বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকায় এবং আরো কোনো কোনো লেখায়, আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে, এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় গ্রন্থটিও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবু সয়ীদ আইয়ুব বিশ্লেষণমূলক ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে Poetry and Truth গ্রন্থে এবং 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এ-বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আরো অনেকের লেখা আছে। আমিও আমার 'আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবসোৎকণ্ঠা' গ্রন্থে এবং 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল' গ্রন্থে বিশ্লেষণমূলক ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে এ-বিষয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। মূল প্রশ্ন হল, আধুনিকতাবাদ কী?

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যে সময়টাতে ঢাকা থেকে রেনেসাঁসের স্পিরিট নিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' (১৯২৬-৩৮), তার সূচনার বছর তিনেক আগে থেকে কল্লোল, পরে কালি-কলম, প্রগতি, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে প্রচারিত ছিল 'আধুনিকতাবাদ' (modernism)। আধুনিকতাবাদীদের মূল প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল – এক রূপ-রীতির দিক দিয়ে শিল্পকলা ও সাহিত্যে নতুনত্ব ও উৎকর্ষের পরিচয় দেয়া; দুই জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদ ও নেতিবাদ প্রচার করা। আধুনিকতাবাদীরা জীবন ও জগতকে দেখেছিলেন নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, অর্থহীন ও যন্ত্রণাদায়ক রূপে। মানুষের ওপর তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টির উপায় সন্ধান করেছিলেন, এবং তাতে তাঁরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। যে নতুনত্বের পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন তার ভালো-মন্দ বিচার করে দেখা দরকার। ইউরোপের রেনেসাঁস, বাংলার উনিশ শতকের জাগরণ এবং বিশ শতকের গণজাগরণের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অপ্রসন্ন। রাজনীতির প্রতি তাঁরা তাকিয়েছিলেন বিরূপ দৃষ্টিতে। বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। ধর্মেও তাঁদের আস্থা ছিল না। ব্যর্থতা, পরাজয়, বিকার-বিকৃতি ও রুগ্নতাকে (morbidity) বিষয়বস্তু করে তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন; পাঠককে তাঁরা নিয়ে গেছেন হতাশার অতল গহ্বরে। সাফল্য, বিজয়, স্বাভাবিকতা , সুস্থতা ও সমৃদ্ধির প্রতি তাঁরা তাকাতে চাননি – তাঁরা আলো সহ্য করতে পারতেন না, মনে হয় অন্ধকার তাঁদের প্রিয় ছিল। (জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এমন উক্তিও আছে : "অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর/ মতো মিশে থাকতে চেয়েছি। / ...গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত") আধুনিকতাবাদীদের কোনো কোনো লেখার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে প্রচলিত অপব্যবস্থা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে। তবে জীবন-জগতের প্রতি তাঁরা তাকিয়েছিলেন নিতান্ত একপেশে দৃষ্টি নিয়ে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রুশ বিপ্লবকে তাঁরা মনে করতেন সাময়িক অস্থিরতার ব্যাপার – দুই বিশ্বযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক অশুভ ব্যাপারাদি তাঁদের মনকে রেখেছিল আচ্ছন্ন করে। কোনো রকম নৈতিক প্রশ্ন কিংবা নৈতিক

বিবেচনাকে তাঁরা সাহিত্যের অঙ্গনে স্থান দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের অনেক বর্ণনা ও চিন্তা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিহীন– বলা যায় বাস্তবতাবর্জিত। তাঁরা ছিলেন কলাকৈবল্যবাদী। আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা ভাষা ও রচনারীতির অসাধারণ উৎকর্ষ দিয়ে পাঠকদের মন জয় করেছেন। ইউরো-আমেরিকান আধুনিকতাবাদকে অনুসরণ করে এবং আত্মস্থ করে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে বাংলা ভাষার আধুনিকতাবাদ।

ইউরো-মার্কিন modernist-রা শিল্পকলা ও সাহিত্যের অঙ্গনে তত্ত্বচর্চা ও কর্মের মধ্য দিয়ে সংগঠিতভাবে প্যারিস, লন্ডন, বন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক থেকে বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল দেশের রাজধানীতে অনুসারী তৈরি করে অন্তত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী ক্রমাগত দুঃখ ও হতাশার মহিমা কীর্তন করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিকের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে তাঁরা গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে-চিত্রকলায় ব্যক্তির আত্মসর্বস্ব, আত্মরতিনির্ভর, রুগ্ন, আস্বাভাবিক, অদ্ভুত, উদ্ভট, বীভৎস সব আচরণকে মহিমান্বিত করে পরম সত্য বলে প্রচার করেছেন। এক অঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর সকল রাজধানীতে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই আন্দোলনকে। উপনিবেশবাদীরা, সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের সহযোগীরা নিজেদের হীন স্বার্থে দৃশ্যের অন্তরালে থেকে এই আন্দোলনের কোনো কোনো বিষয়কে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। আধুনিকতাবাদের অনুসারীরা ও উৎসাহী সমর্থকেরা দেখাতে চেয়েছেন যে, দুই বিশ্বযুদ্ধের অশুভ অভিঘাতে সৃষ্ট নৈরাশ্য ও জীবনের নিদারুণ পরাজয় চিত্রিত হয়েছে আধুনিকতাবাদীদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, শিল্পকলায়।

তবে নৈরাশ্যবাদের চর্চা আধুনিকতাবাদীদের কাছেই এক সময়ে একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। তাতেই উত্তরাধুনিকতাবাদের দিকে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়। তবে উত্তরাধুনিকতাবাদীরাও যে আশার আলো সন্ধান করছেন, কিংবা স্বাভাবিক বাস্তবানুগ ধারায় চলেছেন, তা নয়। বাংলা ভাষায় আধুনিকতাবাদী সাহিত্যান্দোলনের মূল নেতা বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতাবাদীদের একঘেঁয়ে, নৈরাশ্যবেসাত ও নৈরাশ্যবিলাসের মধ্যে 'চাই–আনন্দের সাহিত্য' (১৯৫১) শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন :

কী সেই বাণী, যা বিশেষভাবে এ-কালের বলে মহাকালের খাতায় ওঠার স্পর্ধা রাখে? এ-বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা যতই ভূরিপরিমাণে হয়ে থাক এবং হতে থাক, মার্কসীয়, ফ্রয়েডীয়, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান পরিভাষাকণ্টকিত দুষ্পাঠ্য গ্রন্থ আটলান্টিকের দুই তটে যত না বংশবৃদ্ধি করুক, সহজকে দুরূহ এবং জটিলকে জটিলতর করার পরিশ্রমে অধ্যাপকীয় বৃত্তিরক্ষা যত ভাবেই সফল হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত এই আসল কথাটা ধরা পড়ে যাবেই, হাজার কথার চাতুরি বুনেও তাকে চাপা দেওয়া যাবে না – যে কোনো-এক অর্থে এই বিশিষ্টরকম আধুনিক সাহিত্য তার কল্পিত মানুষের মতোই ফাঁপা, তাতে চিত্রিত বন্ধ্যা জমির মতোই নির্বীজ, তাতে বর্ণিত জীবনের মতোই হতাশাচ্ছন্ন। অর্থাৎ এই সাহিত্যের তাৎপর্য নঙর্থক, এর বাণী বলতে প্রকাণ্ড একটা 'না'

ভিন্ন কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায় না– শুধু নৈরাশ্য, শুধু বিতৃষ্ণা, মানুষের মূঢ়তার 'savage indignation' নয়, মানুষের পতন প্রবণতার এক ফোঁটা করুণাও নয় – শুধু প্রত্যাখ্যান, তিক্ততা, নয়তো বাঁকা ঠোটে দুর্বলের ব্যঙ্গ, আর নয়তো কোনো অন্ধ বিশ্বাসের পায়ে নিশ্চিন্ত, অসহায় আত্মসমর্পণ। আধুনিক জীবনের ব্যর্থতার ছবি আঁকতে গিয়ে সেই ব্যর্থতারই মৌতাতে মেতে উঠলেন লেখকেরা – সেটাকেই ঘিরে-ঘিরে ঘুরছেন, ঘুরতেই ভালো লাগছে, যার 'বিরুদ্ধে' তাঁদের অভিযান, সেটাই যেন গ্রাস করে রেখেছে তাঁদের, কিছুতেই বেরোতে পারছেন না সেই আবর্ত থেকে, নিজের উদ্‌গীর্ণ জালে নিজেরাই আটকে আছেন মাকড়শার মতো। জীবনে 'boredom' ও 'horror' নিশ্চয়ই আছে – এবং এটা অপূর্ব কোনো আবিষ্কারও নয় – কিন্তু এই 'boredom'-এর কবিদের রচনা পড়তে পড়তে এ-সন্দেহ আমরা কিছুতেই ঠেকাতে পারি না যে তাঁরা নিজেরাই সীমাহীনরূপে ক্লান্ত, এবং যেসব কথাশিল্পী আধুনিক সমাজের
আতঙ্কভরা কুশ্রিতা দৃশ্যের পর দৃশ্যে এঁকে চলছেন, তাঁদেরও মনে হয় সেই আতঙ্কের মধ্যে আবদ্ধ, তার পরপারে কোনো স্বর্গের সন্ধান তাঁদের কাছে মেলে না, কিংবা যদি বা মেলে – সেটাও মানবিকতার দিক থেকে, মানুষের জীবনের দিক থেকে– ভুল স্বর্গ, অলীক, আত্মপ্রতারক কল্পনা। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে ব্যাধির বিশ্লেষণ করতে করতে ব্যাধির প্রেমেই পড়ে গেছেন এঁরা, চিকিৎসার অন্বেষণের বদলে মড়কের গলা ধরে আঁকড়ে আছেন।

উক্ত প্রবন্ধে ইউরোপীয় সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত নৈরাশ্যবাদী কবিসাহিতিকের জীবনজগত-দৃষ্টি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তিনি লিখেছেন :
মনে হয় পাশ্চাত্য কাব্যে রাগরক্ত আনন্দ-বেদনা ইয়েটসের সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল, গদ্যরচনায় বিস্ফোরক তেজে ডি. এইচ. লরেন্সের সধর্মী কেউ রইল না, এবং স্বাধীন, সম্প্রদায়চ্যুত মনস্বিতার উদাহরণরূপে একা দাঁড়িয়ে আছেন টমাস মান। অথচ এই জীবনবিমুখ লেখকেরা শিল্পনৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ বলে এবং বিশিষ্টভাবে যুগলক্ষণে চিহ্নিত বলে, এঁরাই এই পরিণত বিশ শতকের প্রধান বলে স্বীকৃত। কিন্তু আর কত কাল? এই ঘন্টা-নাড়া ঠাকুরপুজোয় ফিরে যাওয়া, এই ধূসর, রক্তহীন, হৃদয়হীন সংগীত – এ আর কত কাল শুনব আমরা? আজ বিশ শতকের অর্ধোত্তীর্ণ প্রহরে এই প্রশ্ন ঠেলে উঠতে চায় যে এই যে আমরা এতদিন ধরে এই সুক্ষ্ম বিষ পান করলুম, তার নেশার খোঁয়ারির দিন এখনো কি আসেনি? কোনো এক ভোরবেলায় জেগে উঠে আমরা কি বুঝব না যে এই বিষে তিলে তিলে আমাদের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হয়েছে? ভবিষ্যদ্বাণী করা বিপজ্জনক, কিন্তু সভ্যতা যদি টিকে থাকে আর স্বাধীন চিন্তা লুপ্ত না হয় – তাহলে বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে বিশ্বসাহিত্যে আবার একটি যুগান্তর ঘটবে; হয়তো তার গতি হবে সরলতার, স্বীকৃতির, ও সদর্থক অঙ্গীকরণের দিকে; অন্তত তা কোনো কাল্পনিক স্বর্গলাভের আশায় রাষ্ট্র কিংবা মন্দিরের যূপে আত্মবলির পরামর্শ দেবে না, মানুষের কানে হয়তো বা সবচেয়ে দুঃসাহসী কথাটি উচ্চারণ করবে, 'বাঁচ, ভালোবাস, হও।'

'চাই– আমাদের সাহিত্য' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর যে মানসপ্রবণতার প্রকাশ, তা আধুনিকতাবাদীর নয় – হয়তো তা উত্তরাধুনিকতাবাদীর। এই রকম স্পষ্ট উপলব্ধি ব্যক্ত করার পরেও বুদ্ধদেব বসু কিন্তু আধুনিকতাবাদ থেকে সরে যাননি। তাঁর পরবর্তী জীবনের রচনাবলি অনুধাবন করলে এটা বোঝা যায়। কোনো কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে অতীতের বিষয় তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তবে যাত্রাপথ তিনি ত্যাগ করেননি। ১৯৬১ সালে প্রকাশ করেছেন 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আবু সয়ীদ আইয়ুব মন্তব্য করেছেন : বোদলেয়ারের "কবিতার সুন্দর অনুবাদ এবং ঐ অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকাটি অনুজ কবিদের ওপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। রীতিমতো একটি বোদলেয়ার-cult গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশ ও ষাট-দশকের কবিদের মধ্যে। দেখে আমি দুঃখিত বোধ করলাম। বোদলেয়ারকে অসাধারণ শক্তিমান কবি মনে করলেও তাঁর মৌল জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধ আমার কাছে একান্ত একপেশে বা একদেশদর্শী ঠেকে।" অন্যত্র আইয়ুব উল্লেখ করেছেন: "দুঃখ ও পাপের মাত্রা আধুনিককালে আগের চেয়ে বেড়েছে কি-না এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের ওপর তার ছায়া যে অতি বৃহৎ আকার ধারণ করেছে তাতে সন্দেহের মোটেই অবকাশ নেই। প্রতিবিম্ব বিম্বকে আয়তনে এবং বর্ণের কালিমায় বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস।" এ-প্রসঙ্গে বোদলেয়ারের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, তাঁর কবিতায় বিধৃত অমঙ্গলের অভিঘাতে ফরাসি কাব্যধারায় ভাববিপ্লব ঘটে গেছে এবং ক্রমে সেই ভাববিপ্লব বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর দেশে দেশে। আইয়ুব উল্লেখ করেছেন : "এই বাংলাদেশেও এতজন কৃতী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ এবং পরীক্ষানিরত বহু নবীন কবির পক্ষে এ কথাটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হয়ে গেছে যে, তিনি (অর্থাৎ বোদলেয়ার) 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা'।" আইয়ুব উল্লেখ করেছেন : "বিশ্বজগতের রঙটা ফুটফুটে গোলাপিও নয়, চটচটে কালোও নয়। যাঁরা সব কিছুকে গোলাপ ফুলের মতো রূপ-বর্ণ-গন্ধের সুষমাযুক্ত দেখেন বা সৃষ্টিকে পরম করুণাময় ভগবানের অপার অবিমিশ্র কল্পনাশক্তির প্রকাশ ভাবেন তাঁরা নিজেদের ভোলান, তাঁদের আমরা ভাববিলাসী বলে জানি। কিন্তু যাঁরা সমস্ত জগতটাকে নেকড়ে বাঘ বা পুতিগন্ধময় নর্দমা রূপে উপলব্ধি করেন তাঁরাও ভাববিলাসী, 'পঁচা মাংসের বিলাসও বিলাস।' বিলাসিতার ফ্যাসন বদলেছে, এই পর্যন্ত। পূর্বযুগের ভাববিলাসীরা তবু সংযম রক্ষা করে চলতেন তাঁদের লেখায়; কিটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ, রিলকে, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, তলস্তয় – এঁরা কেউ সৃষ্টির কালো দিকটার বিষয়ে অনবহিত বা নীরব ছিলেন না। নব্য ভাববিলাসীরা – বোদলেয়ার, কাফকা, ফকনার, নর্মান মেলার, জাঁ জেনো – বিতৃষ্ণা বা বিবমিষার প্রকাশে এঁরা কেউ সংযমের ধার ধারেন না, কালোকে যত বেশি কালো এবং সাদাকে যত অদৃশ্য করে দিতে পারেন তাঁদের সাহিত্যে ততই তাঁরা সত্যদ্রষ্টা বলে খ্যাতি লাভ করেন"। কবিতায় বোদলেয়ারের মৌলিকতা ও নতুনত্ব সম্পর্কে আইয়ুব দ্বর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন : "বোদলেয়ারের পদ্যরীতি ও

শব্দবিন্যাস বৈপ্লবিকভাবে নতুন, জীবনবোধে যে নতুনত্ব তিনি এনেছেন তা আরো মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। ... এই যুগান্তকারী জীবনবোধের মূলকথা হল প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি রোমান্টিক বিস্ময় ও উৎসাহের স্থলে এক সর্বগ্রাসী বিতৃষ্ণা ও নির্বেদের অভিষেক।" আইয়ুব দেখিয়েছেন যে, জগত ও জীবন সম্পর্কে বোদলেয়ার যেসব অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন, সেগুলো বাস্তব থেকে এতই দূরে যে, সেগুলো সত্যবিচ্যুত হয়েছে। তিনি লিখেছেন : "বোদলেয়ারের বিরূদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় নালিশ এই যে, তিনি প্রতিভাবান কবি অথচ তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা ক্ষয় করেছেন নিজের ও আমাদের সকলের সর্বনাশ ঘটাতে। ... সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ এই যে, বোদলেয়ারীয় আঁনুই'-এর তন্নিষ্ট চর্চা আমাদের যুবকদের মনকেও যৌবনের প্রারম্ভেই জরাগ্রস্ত করে দিচ্ছে।" আধুনিকতাবাদী কবিতা সম্পর্কে আইয়ুব উল্লেখ করেছেন :
সত্য-মিথ্যার ধার ধারে না কবিতা একথা যদি আধুনিকেরা বলতে চান তবে বলুন, মানতে না-পারলেও শুনতে প্রস্তুত আছি। ... কিন্তু যখন দেখি সত্যের ধার ধারেন না বলেই ছোটেন মিথ্যার কাছে বড় অঙ্কের ঋণে নিজেকে আদ্যোপান্ত জড়াতে, তখন প্রতিবাদ না করে পারি না। সমস্ত জগতকে এবং মানুষ মাত্রকে শুভ ও সুন্দর বলে জানাটা যদি হয় স্বপ্নবিলাস, তবে সমস্ত জগতকে এবং মানুষ মাত্রকে ঘৃণ্য ও বীভৎস বলে জানাটা দুঃখবিলাস। পাখির গান, চাঁদের আলো, সুন্দরীর হাসি নিয়ে কাব্যে বাড়াবাড়ি করা যদি ন্যাকামি বলে নিন্দিত হয়, তবে মানুষের দুঃখ ও পাপ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কঠোরতর ভাষায় ধিক্কৃত হওয়া উচিত, কারণ সে বাড়াবাড়ির ফল হবে দারুণতর। দারুণতর হবে বিশেষত এই জন্য যে, অধুনাতন সাহিত্যিক অমঙ্গলবিলাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দেখি মধ্যযুগের আদিপাপ সংক্রান্ত উন্মিলিতপ্রায় ডগমার বা তার বিকৃততর সংস্করণের পুনরুজ্জীবনের। মানুষের স্বভাবে এমন এক চিরজন্মগত দোষ অবশ্যই বিদ্যমান যাতে করে কোনো কালেই সে মানুষ হয়ে উঠবে না, আত্মরতিতে, পরশ্রীকাতরতায়, কপটতায়, হিংসায় নিমজ্জিত হয়ে থাকবে দূরতম ভবিষ্যতেও, এক পাপ ছাড়লেও অন্য ঘৃণ্যতর পাপে লিপ্ত হবে – মানুষের এই কুসংস্কারকে সুশিক্ষিতি মানুষের মনে বদ্ধমূল করে তার কর্মপ্রেরণাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়াটা আধুনিক সাহিত্যের এক দুরপনের কীর্তি।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন বাংলাভাষায় আধুনিকতাবাদের প্রবক্তা আর আবু সয়ীদ আইয়ুব ছিলেন রেনেসাঁসের সাধক। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় আইয়ুবদের মতো লেখকদের সমালোচনার কারণে আর উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও বিশ্বায়নবাদের ধারায় বিশ্বব্যবস্থার বিকাশের ফলে আধুনিকতাবাদ উত্তীর্ণ হয়েছে উত্তরাধুনিকতাবাদে। উত্তরাধুনিকতাবাদ কত কাল চলবে? এর পরে কী দেখা দেবে?

রেনেসাঁস

আধুনিকতাবাদের আগে গিয়েছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস যদিও পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আছে, তবু রেনেসাঁস বললেই লোকে কেবল ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও তার প্রভাবে পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্ট বৌদ্ধিক জাগরণকে বুঝে থাকেন। সেজন্য রেনেসাঁসের আকৃতি ও প্রকৃতিকে বোঝার প্রয়োজনে প্রথমে ইউরোপের রেনেসাঁসের দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়। ইতিহাসের আধুনিক যুগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কিছু কথা উল্লেখ করেছি। রেনেসাঁসের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া দুঃসাধ্য। এখানে আমি ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের একটি লেখা থেকে কিছু কথা উদ্ধৃত করছি। মার্কস-এঙ্গেলস ছিলেন রেনেসাঁসেরই সন্তান। এঙ্গেলস লিখেছেন (১৮৭৫-৭৬ সালে লিখিত) :

আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানেরও সূচনা সেই মহান যুগটি থেকে যে যুগটিকে আমরা জার্মানরা নাম দিয়েছি আমাদের তৎকালীন জাতীয় বিপর্যয়ের নামে রিফর্মেশন, ফরাসিরা যাকে বলে রেনেসাঁস এবং ইতালীয়রা বলে সিন্‌কুয়েসেন্টু – যদিও এই নামগুলোর কোনোটি দিয়েই এই যুগের তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। ... বাইজানটিয়ামের পতনের ভেতর দিয়েও যেসব পাণ্ডুলিপি বেঁচে গিয়েছিল, রোমের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে যেসব প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রাচীন গ্রিসের এক নতুন জগত আত্মপ্রকাশ করল বিস্মিত পশ্চিমের কাছে। এ জগতের উজ্জল রূপের সামনে অদৃশ্য হল মধ্যযুগের প্রেত। ইতালিতে শিল্পকলার অভাবনীয় প্রস্ফুটন ঘটল, মনে হল যেন এ সেই প্রাচীন যুগের চিরায়ত শিল্পেরই প্রতিফলন, শিল্পকলার তেমন উন্নতি আর কোনোদিন হয়নি। ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানিতে নতুন, প্রথম আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হল। তার অল্প কিছু কাল পরেই এল ইংরেজি ও স্পেনীয় সাহিত্যের চিরায়ত যুগ। পুরাতন পৃথিবীর সীমা ভেঙে গেল। তখনই পৃথিবী সত্য করে আবিষ্কৃত হল এবং পরবর্তী কুটির শিল্প থেকে বৃহৎ কারখানা শিল্পে উত্তরণের ও বিশ্ববাণিজ্যের ভিত্তি রচিত হল, আর তা থেকেই আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের সূত্রপাত হল। গির্জার আধ্যাত্মিক একনায়কত্ব তখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, জার্মান জাতিগুলোর অধিকাংশই গির্জার এই একনায়কত্বকে প্রত্যক্ষভাবে বর্জন করে প্রটেস্টান্ট মত গ্রহণ করল। আর লাতিন জাতিগুলোর মধ্যে আরবদের থেকে প্রাপ্ত ও নব-আবিষ্কৃত গ্রিক দর্শনের দ্বারা লালিত স্বাধীন চিন্তার এক স্ফূর্তিদীপ্ত প্রেরণা ক্রমেই বেশি করে শিকড় গেড়ে বসতে লাগল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদের রাস্তা তৈরি করে দিল।

বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ আর চিন্তাধারার বিকাশ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন বর্ননা করে এঙ্গেলস অত্যন্ত আবেগদীপ্ত ভাষায় লিখেছেন :

এ হল মনুষ্যজাতির অভিজ্ঞাত সর্ববৃহৎ প্রগতিশীল বিপ্লব। এই সময়টার প্রয়োজন ছিল মহাকায়দের, সৃষ্টিও করল মহাকায়দের– মননক্ষমতা, আবেগ ও চরিত্রবলের দিক দিয়ে মহাকায়, সর্বাঙ্গীনতা ও বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে মহাকায়। এই-যে মানুষেরা বুর্জোয়া শ্রেণির আধুনিক শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, তাঁদের একেবারেই

বুর্জোয়াসুলভ সীমাবদ্ধতা ছিল না। কালের দুঃসাহসিক চরিত্রই তাঁদের ব্যক্তিত্বকে কম-বেশি রঞ্জিত করে তুলেছিল। এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ লোকদের মধ্যে এমন প্রায় কেউই ছিলেন না যিনি বহু ভ্রমণ করেননি, যাঁর চার-পাঁচটা ভাষায় দখল ছিলনা, যিনি একাধিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাননি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি শুধু একজন বিরাট চিত্রশিল্পিই ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বিরাট গণিতবিদ, যন্ত্রবিদ ও ইনজিনিয়ার; পদার্থবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অনেক মূল্যবান আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁর কাছে ঋণী। আলব্রেখত দ্যুরার ছিলেন চিত্রশিল্পী, ক্ষোদক, ভাস্কর, স্থপতি, অধিকন্তু দুর্গ নির্মাণের যে

পদ্ধতির তিনি উদ্ভাবক তার বহু ধারণাই অনেকদিন পরে আবার গ্রহণ করেন মঁতালাঁবের – গ্রহণ করে দুর্গ নির্মাণের আধুনিকতর জার্মান বিজ্ঞান। মেকিয়াভেলি ছিলেন রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, কবি এবং সেই সঙ্গে আধুনিককালের প্রথম উল্লেখযোগ্য সামরিক-গ্রন্থ-প্রণেতা। লুথার-যে শুধু গির্জার আভগিয়াস আস্তাবল পরিষ্কার করেছিলেন তাই নয়, জার্মান ভাষাকেও আবর্জনামুক্ত করেছিলেন। আধুনিক জার্মান গদ্য তাঁরই সৃষ্টি এবং যে উদাত্ত স্তোত্রটি ষোড়শ শতাব্দীর মার্সাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কথা ও সুরও তিনি রচনা করেছিলেন। তখনকার দিনের নায়কেরা শ্রমবিভাজনের দাস হয়ে পড়েননি, যে শ্রমবিভাগের একপেশেমি সহ নানা খর্বকর প্রতিক্রিয়া আমরা প্রায়শ দেখতে পাই তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিন্তু তাঁদের যা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তা হল, তাঁদের প্রায় সকলেই সমসাময়িক জীবনস্রোতের গভীরে ব্যবহারিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাঁদের জীবন ও কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন। পক্ষ অবলম্বন করেছেন তাঁরা, লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন, কেউ বক্তৃতা ও লেখা দ্বারা, কেউ তরবারি হাতে, অনেকেই উভয়ত। সেজন্যই তাঁদের চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও শাক্তিমত্তা, যা তাঁদের পুরো মানুষ করে তুলেছে। পুঁথিসর্বস্ব মানুষ – এটা দেখা গেছে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই – হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির মানুষ, নাহয় সাবধানী কূপমণ্ডুক যাঁরা কোনো রকম বিপদের ঝুঁকিই নিতে চান না।

... যে মহান ইতালীয়দের কাছ থেকে আধুনিক দর্শনের শুরু, তাঁদেরই পাশাপাশি ইনকুইজিশনের দাহমঞ্চের জন্য শহিদ ও কারাগারের জন্য সত্য-সাধক জোগাতে হয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে। আর এটা বৈশিষ্ট্যসূচক যে, প্রকৃতি নিয়ে স্বাধীন অনুসন্ধানকে নিপীড়ন করার ব্যাপারে প্রচেস্টান্টরা ক্যাথলিকদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সের্ভেত যখন রক্তচলাচলের ধারা প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন তখন কালভাঁ তাঁকে পুড়িয়ে মারলেন। তাঁকে দুইঘন্টা ধরে জীবন্ত ভাজেন কালভাঁ। আর ইনকুইজিশন জিওনার্দো ব্রুনোকে সরাসরি পুড়িয়ে মারাটাকেই যথেষ্ট মনে করেছিল।

এঙ্গেলস এমনিভাবে ইউরোপের আধুনিক যুগের দুই-তিনশো বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে মানুষের সৃষ্টিশীলতার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ও মহত্ত্বের যে স্পিরিট বিধৃত আছে, তাই

রেনেসাঁস। রেনেসাঁস একটা মনোভঙ্গি, মানসবৈশিষ্ট্য, মনের অবস্থা, মাইন্ড-সেট, আবেগ-অনুভূতি-উপলব্ধির ধরন। রেনেসাঁস হল এমন এক বিচার-প্রবণতা যা মানুষের উন্নত মানসিক জীবন ও উন্নত আর্থিক জীবন দুটোতেই পরিপূর্ণ গুরুত্ব দেয়। রেনেসাঁস হল এমন এক ধরনের অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা ও সাধনা যা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর বা জাতির জীবনে বিশেষ বিশেষ কালে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, চিন্তক, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রমুখের জীবনে দেখা যায়। রেনেসাঁস হল বৌদ্ধিক জাগরণ, চিন্তাগত জাগরণ– মহৎ সব মানবীয় অনুভূতির, বৃত্তি-প্রবৃত্তির , বোধ-বুদ্ধির ও চেতনার জাগরণ।

রেনেসাঁস হল সত্যসন্ধ, ন্যায়কামী, সৌন্দর্যপিপাসু মনের দুর্দমনীয় মহৎ সব প্রয়াস। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে রেনেসাঁসের প্রকাশ ঘটে, তবে এতেই শেষ নয় – এটা আরম্ভ মাত্র। রেনেসাঁসের প্রকাশ নতুন নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কারের মদ্যদিয়ে– শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রচিন্তা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির সৃষ্টিশীল চর্চার মধ্যদিয়ে রেনেসাঁস এক ধনাত্বক বিকাশশীল চেতনা। বিকাশমান বাস্তবতার মধ্যে অনুভূতি-উপলব্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণ যদি বিকাশহীন হয়ে পড়ে, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও সৃষ্টির তাগিদ অবসিত হয়, তাহলে রেনেসাঁসের অবসান ঘটে।

রেনেসাঁস কেবল একবার ইউরোপে দেখা দিয়েছিল, তা নয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই রেনেসাঁসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল যা পরবর্তী কালের 'ইউরোপের রেনেসাঁসে' প্রেরণাদায়ক শক্তি রূপে কাজ করেছিল। আরবদের মধ্যে ইসলাম ও পরবর্তী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও রেনেসাঁসেরই অভিব্যক্তি।

ইউরোপের যেসব ঘটনাকে রেনেসাঁস বলে অভিহিত করা হয়, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার জাতি সমূহের বা জনগোষ্ঠী সমূহের জীবনে। উনিশ শতকের বাংলায়ও দেখা দিয়েছিল এমনি এক রেনেসাঁস বা চিন্তাশক্তির জাগরণ যার ধারা বহমান থাকে বিশ শতকের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-কালে তা মরুভূমির-মুখোমুখী-নদীর-দশা লাভ করেছে। বাংলাদেশে এখন গ্লোবালাইজেশন এবং মর্ডানিজম ও পোস্ট-মর্ডানিজমের সৃষ্টিসম্ভাবনাহীন রুগ্ন চেতনার একচ্ছত্র প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

ইউরোপের রেনেসাঁসের লক্ষণসমূহ দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল তেরো শতকের ইতালিতে। তারপর একে একে ইউরোপের জাতি সমূহের ভেতর থেকে রেনেসাঁসের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ইউরোপে, নানা বিপত্তি অতিক্রম করে, গোটা উনিশ শতক পর্যন্ত বহমান থাকে রেনেসাঁসের ধারা। বিশ শতকে প্রবল হয় আধুনিকতাবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ। তবে বিশ শতকের সৃষ্টিশীল-প্রগতিশীল সব দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকেরাও রেনেসাঁসের স্পিরিটকেই অন্তরে লালন করে সৃষ্টির ধারায়

এগিয়েছেন। আলবার্ট সুইজার, ওস্টওয়াল্ড স্পেংলার, উইলিয়াম জেম্‌স, জন ডিউই, ফ্রয়েড, রবীন্দ্রনাথ, রাসেল, আইনস্টাইন, সাঁর্ত প্রমুখ মনীষী বিশ শতকেও রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার বহন করে, অন্তরে রেনেসাঁসের স্পিরিটকে লালন করে – রেনেসাঁসের আলোকরশ্মিকে পাথেয় করে পথ চলেছিলেন। আঠারো ও উনিশ শতকের জার্মান, ফরাসি ও ব্রিটিশ মনীষীরা রেনেসাঁসেরই ধারক-বাহক ও সম্প্রসারক ছিলেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সেতুঙ রেনেসাঁসের ভাবপ্রবাহকেই একটি ধারায় যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর করতে চেয়েছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন সরাসরি ইউরোপের রেনেসাঁসেরই সন্তান। চিন্তার দিক দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কল্যাণবাদ, প্রগতিবাদ, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ – এসব রেনেসাঁসেরই নানামুখী অভিব্যক্তি। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, আধুনিকতাবাদ, উত্তরাধুনিকতাবাদ হল রেনেসাঁসের বিকার বিকৃত বিকাশ।

রেনেসাঁসের মনীষীদের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, ভুল-ভ্রান্তি নেই–একথা ঠিক নয়। রেনেসাঁসের ধারায় আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধি আছে। প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও ভ্রান্ত কিংবা বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। সেজন্য বৌদ্ধিক পরিশোধনের ও নৈতিক অনুশীলনের দরকার হয়। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও বর্তমান বিশ্বায়নবাদের অভিজ্ঞতা থেকেও রেনেসাঁসের সাধকেরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। রেনেসাঁসকে আধুনিকতাবাদী ও উত্তরাধুনিকতাবাদীদের সমালোচনা অতিক্রম করে জানতে গেলে, রেনেসাঁস থেকে আজো মহত্তম সৃষ্টির প্রেরণ লাভ করা যায়। 'আত্মা নং বিদ্ধি।' 'Know thyself.' 'Live and let others live.' 'Love and be loved.' – এসব রেনেসাঁসদীপ্ত মানুষেরই অন্তরের কথা। কিন্তু এই অন্তর্মুখিতার সঙ্গে রেনেসাঁস-সাধকেরা বহির্মুখী চর্চাও করেন – অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতকেও জানতে প্রয়াসপর থাকেন। কেবল জানা নয়, জানার সঙ্গে করা – অর্থাৎ জ্ঞানকে উন্নত জীবনের জন্য কাজে লাগানো এবং জীবনপদ্ধতি, সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন – এটাও রেনেসাঁসেরই অন্তর্গত।

বাংলার মনীষায় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব অতুলনীয় সুফল ফলিয়েছে। রামমোহন, ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সিরাজী, রোকেয়া, এস ওয়াজেদ আলি, লুতফর রহমান, বরকতুল্লাহ, আবুল হুসেন, ওদুদ, নজরুল, মোতাহের হোসেন, মোতাহার হোসেন প্রমুখ মনীষী রেনেসাঁসেরই সন্তান। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, জয়নুল, কামরুল, সুলতান জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে রেনেসাঁসের স্পিরিটকেই অন্তরে লালন করেছিলেন। তাঁদের সৃষ্টি ঐতিহ্যবাহী অথচ স্বকীয়তায় ভাস্বর ও নতুন।

ইউরোপে ও বাংলায় বৌদ্ধিক জাগরণের ধারায় দেখা দিয়েছিল গণজাগরণ। ফরাসি বিপ্লবেবর চেতনা রেনেসাঁসের চেতনারই সম্প্রসারণ। এদেশে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল রেনেসাঁসের স্পিরিট। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের কালেও বাংলায় রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল। সীতাকুট, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, বিক্রমপুর, ময়নামতি, লালমাই, চান্দিনা ও শ্রীচট্টলে বৌদ্ধযুগের যেসব বিহার, সঙ্ঘরাম ও চৈত্যের অবশেষ বর্তমান এবং হিউয়েন সাঙ প্রমুখ সেকালের চিনা ভিক্ষু ও পরিব্রাজকদের লিখিত যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলো বলে দেয়, বৌদ্ধযুগেও বাংলায় চিৎপ্রকর্ষ বা রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল।

আজকের দিনেও বাংলাদেশে, এশিয়ায় ও ইউরোপ-আমেরিকায়, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে, অনেকে রেনেসাঁসের চেতনাকে অন্তরে লালন করেন – রেনেসাঁসের স্পিরিট নিয়ে চলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আধুনিকতাবাদ, উত্তরাধুনিকতাবাদ ও বিশ্বায়নবাদের ছক-বাঁধা চিন্তা ও কর্মের প্রবল তোড়ে তাঁরা ভেসে যান, মাথা তুলতে পারেন না। বিশ শতকের বাংলা ভাষার ভাবুকদের মধ্যে শিবনারায়ণ রায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন রেনেসাঁসের স্পিরিট দ্বারা। এ বিষয়ে তাঁর লেখা অন্তত তিনটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে। সৃষ্টির ও প্রগতির জন্য দরকার সংশ্লেষণমূলক (thesis, anti-thesis, synthesis) দৃষ্টিভঙ্গি। anti-thesis অবলম্বন করে চলা ঠিক নয়। বাংলাদেশে যাঁরা প্রতিবাদী ও নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে উগ্রতার সঙ্গে মত প্রকাশ করেন, কেবল প্রতিবাদে মত্ত থাকেন, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে আসলেই কি তাঁদের কোনো দান আছে? চলতে হবে হয় thesis না হয় synthesis অবলম্বন করে।

বাংলাদেশে চিন্তার ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখন বিরাজ করছে এক অদ্ভুত রকমের স্থবিরতা; প্রগতিশীল কোনো কিছুকেই দানা বাঁধানো যাচ্ছে না – ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এগোনো যাচ্ছে না। প্রগতির মুখোশপরা অপক্রিয়াশীলেরা প্রগতিশীল যে-কোনো প্রবণতাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছে। অপশক্তি ভয়ঙ্কর রকম জটিল, কুটিল ও প্রবল। এ-অবস্থায় উস্কানিমূলক লেখা, অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর আক্রমণাত্মক লেখা, বিতর্কের বিষয় নয় এমন সব বিষয়কে বিতর্কের বিষয় বানিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে জনজীবনের চাহিদার সঙ্গে প্রতারণা করা, প্রতিবাদীর ছদ্মাবরণ নিয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়ে অনুচিত স্বার্থ হাসিল করে নেয়া ইত্যাদি খুব চলছে। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এগুলোকেই সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে। প্রগতিশীল প্রবণতা ও প্রচেষ্টা সহায়তা পাচ্ছে না। প্রকৃত সমালোচনা ও আন্তরিক প্রতিবাদ প্রচারমাধ্যমে গুরুত্ব পাচ্ছে না। এরই মধ্যে বুদ্ধিজীবী মহলে সার্বিক কর্তৃত্ব দখল করে আছেন এনজিওপতিরা ও সিভিল সোসাইটি সমূহের কথিত 'সুশীল-সুজনেরা'। সৃষ্টিবৈরী এই বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্থ চিন্তার, নতুন সৃষ্টির ও প্রগতির অনুকূল নতুন বাস্তবতা তৈরি করতে হবে। বিতর্কের দরকার আছে – সত্যের সন্ধানে অটল থেকে বিতর্ক। সে-ধরনের বিতর্কে দুই

পক্ষেরই চেষ্টা থাকে সত্যের দিকে যাত্রার – সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার। সে ধরনের বিতর্কে কোনো পক্ষেরই পরাজয় বা ব্যর্থতা নেই – তাতে উভয় পক্ষেরই চেষ্টা দ্বারা প্রয়োজনীয় সত্যের সন্ধান লাভ সম্ভব হয়। সত্যসন্ধ বিতর্ক আজ খুব দরকার। কিন্তু গত তিন দশক ধরে যেসব বিতর্ক চালানো হয়েছে সেগুলোকে বলা যায় এক রকম মানসিক কুস্তি। হীন-স্বার্থান্বেষীরা পক্ষ ও প্রতিপক্ষে বিভক্ত হয়ে একে অন্যকে পরাজিত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যে বিতর্ক চালায়, তা সাহিত্যসভার মঞ্চকে খেলার মঞ্চে পরিণত করে মানসিক কুস্তি খেলা ছাড়া আর কী? প্রসঙ্গত বার্টান্ড রাসেলের একটি কথা মনে পড়ছে: "আদর্শপরায়ণতার নামে যা চলছে তার অধিকাংশই হয় ছদ্ম ঘৃণা নাহয় ছদ্ম ক্ষমতানুরাগ। বিপুল জনসাধারণকে যখন আপনারা কোনো মহৎ অনুপ্রেরণার নামে আন্দোলিত হতে দেখেন, তখন আপনাদের কর্তব্য একটু গভীরে দৃষ্টি দিয়ে নিজ নিজ অন্তরকে জিজ্ঞেস করা: এই অনুপ্রেরণার পেছনে ক্রিয়াশীল প্রকৃত কারণটা কী? মহত্ত্বের এতই আকর্ষণ যে, তার মুখোশ দেখলেই জনগণ তার প্রতি ধাবিত হয়।" মুখোশ দেখেই যাতে আমরা প্রতারিত না হই সেজন্য আমাদের পরিপূর্ণ সতর্কতা দরকার, সর্বোপরি দরকার সৃষ্টির পথে নব নব অভিযান।

শেষ পর্যন্ত তরুণসমাজের ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। মানবজীবনের বিরাট-বিপুল-অন্তহীন সম্ভাবনার উপলব্ধি নিয়ে তরুণসমাজ যদি জেগে ওঠে – সৃষ্টির ও প্রগতির লক্ষে তৎপর হয়, তাহলে অপশক্তি যত প্রবলই হোক, টিকতে পারবে না। নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনে উত্তরাধুনিকতাবাদ, আধুনিকতাবাদ ও রেনেসাঁসের স্বরূপ জানা আজ একান্ত দরকার। তবে মনে রাখতে হবে – সৃষ্টির পথ তৈরি থাকে না, তৈরি করে নিতে হয়।

ঢাকা, অক্টোবর ১২, ২০০৮

অনুবাদ

মার্কসবাদ ও শিল্পের সমাজদর্শন/ গর্ডন গ্রাহাম

শওকত হোসেন

[গর্ডন গ্রাহাম ইউনিভার্সিটি অভ অ্যাবার্ডিনের কিংস কলেজ-এর মরাল ফিলোসফির রিগাস প্রফেসর। নৈতিকতা, নন্দনতত্ত্ব এবং সামাজিক দর্শনের ওপর ব্যাপক লেখালেখি করেছেন তিনি। তাঁর গ্রন্থসমূহের ভেতর রয়েছে: *কনটেম্পোরারি সোস্যাল ফিলোসফি* (১৯৮৭), *দ্য আইডিয়া অভ ক্রিশ্চান চ্যারিটি* (১৯৯০), *এথিক্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস* (১৯৯৬) ও *দ্য শেইপ অভ দ্য পাস্ট* (১৯৯৭)। আলোচ্য রচনাটি Peter Kivy সম্পাদিত The Blackwell Guide to Aesthetics গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।]

দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক বিকল্পগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব, কাঠামোবাদ, সমালোচনামূলক তত্ত্ব, বিনির্মাণবাদ, উত্তরআধুনিকতাবাদ। এগুলো সমসাময়িক শিল্পের সমালোচনার ক্ষেত্রে খুবই পরিচিত বুলি, এগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে ধারণাগত দিক থেকে যথেষ্ট মিল থাকায় এই ভাগগুলো কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক। তবে কাঠামোবাদ, বিনির্মাণবাদ ইত্যাদি বর্তমান সময়ের শিল্প-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার বেশ কিছু প্রভাবশালী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক পথ বলে এগুলোকে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মার্কসবাদ দিয়ে শুরু করা যাক; শিল্প-সংক্রান্ত শনাক্তযোগ্য মার্কসীয় তত্ত্ব রয়েছে, তবে স্বয়ং মার্কস যেহেতু শিল্প সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু বলেননি, তাই এইসব ধারণা মৌল মাকর্সীয় ধারণায় প্রক্ষেপণ। একজন নেতৃস্থানীয় ফরাসি মার্কসীয় তাত্ত্বিক আলতহসারের কথা সঠিক হয়ে থাকলে– কোনোও শিল্পকর্মের প্রকৃত উপলব্ধি কেবল মৌলিক মার্কসীয় ধারণার উপলব্ধির মাধ্যমেই আসতে পারে।

> যেভাবে আমরা কোনোও শিল্পকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে চাই, শিল্পকর্মের নির্দিষ্টতার ভেতরে প্রবেশ করতে চাই, শিল্পের 'নন্দনতত্ত্বিক প্রভাব' বিস্তারকারী

মেকানিজম বুঝতে চাই সেটা হচ্ছে *মার্ক্সবাদের মৌল নীতিমালা* উপলব্ধিরই লক্ষ্যে গভীর মনোযোগ আর সময় ব্যয় করা।

(আলতহসার ১৯৭১: ২২৭, মূল গুরুত্ব)

এদিক থেকে শিল্পের অস্তিত্ব ও সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি আমাদের সামনে যেসব প্রশ্ন তুলে ধরে সেগুলোর জবাব দেয়ার জন্যে আমরা শিল্পকর্মের 'নন্দনতাত্ত্বিক ফল' প্রকাশকারী প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট (বৈজ্ঞানিক) জ্ঞান লাভ করতে বাধ্য হই।

(প্রাগুক্ত: ২২৫)

আলতহসার এখানে তলস্তয়ের ওপর রচিত এক প্রবন্ধে প্রদত্ত লেনিনের তত্ত্বেরই অনুকরণ করেছেন।

তলস্তয়ের দৃষ্টিভঙ্গির স্ববিরোধিতাসমূহ সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার নয়, বরং সেগুলো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব ও সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন... সেই সময়ে যা রাশান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনস্তত্ত্ব গঠন করেছিল।

(লেনিন ১৯৬৮, খ ৪, ২৯৩)

মার্ক্সিয় দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য অবশ্যই কেবল জগতকে উপলব্ধি করা নয় বরং তাকে বদলে দেয়া। এই কারণে মার্ক্সবাদীরা শিল্পকর্মের রক্ষণশীল ও বিপ্লবী এই দুধরনের বাস্তব ফল সম্পর্কেও আগ্রহী। মার্ক্সবাদী সমালোচক টরি বেনেট সংক্ষেপিত মার্ক্সিয় শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস-এ এই দুটি লক্ষ্যকে তুলে ধরেছেন (বেনেট সাহিত্য সম্পর্কে কথা বললেও তাঁর বর্ণনাকে সাধারণভাবে শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।)

মার্কস প্রণীত 'ভিত্তি' ও 'উপরিকাঠামোর' বর্ণনার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিক টেক্সটের প্রকরণ ও বিষয়বস্তুকে তার রচনার ভিত্তি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শিক সম্পর্কের আলোকে ব্যাখ্যার প্রয়াসের চল রয়েছে। তার সাথে মার্কসীয় সামলোচকগণ সবসময়ই সাহিত্যকর্মের সাথে কী ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব যোগ করা যেতে পারে সেই হিসাব করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই মতে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য প্রয়াসের পক্ষে বিপক্ষে বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন।

(বেনেট ১৯৭৯: ১৯৪)

বেনেট মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে তৃতীয় একটি দিক বের করেছেন, আমরা সবাই যেখানে প্রত্যাবর্তন করব। এখানে তাঁর শনাক্তকৃত দুটো দিক শিল্পকর্মের আর্থসামাজিক

প্রেক্ষিতের প্রতি কৌতূহল এবং এর রাজনৈতিক প্রভাব একদিকে বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে আদর্শের মাঝামাঝি এক শিল্পতত্ত্বের দিকে চালিত করেছে। 'বিজ্ঞান' ও 'আদর্শ' হচ্ছে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের পরিভাষা, এখানে বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তবতার ধারণা ও উপলব্ধি, অন্যদিকে আদর্শ হচ্ছে মিথ্যা এবং পরিবর্তন ঠেকানোর ক্ষেত্রে যাদের কায়েমী স্বার্থ জড়িত তাদের হাতে বাস্তবতা উপস্থাপনের ধারণাসমূহের বিকৃতি। শিল্পকর্ম এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে বলার মানে এর দ্বৈত চরিত্র রয়েছে। একদিকে আমরা শিল্পে জগতের এক ধরনের প্রতিফলন দেখতে পাই, তবে সেটা বাস্ত বানুগ নয়; লোকে তাকে যেভাবে নিয়ে থাকে সেভাবে। শিল্পকর্ম সীমিত ক্ষেত্রে বিশেষ সমাজ ও সময়ের ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধ ধারণা তুলে ধরে। এইদিক থেকে শিল্পকর্ম আদর্শিক, কারণ তা বাস্তবতাকে বিকৃত করে। অন্যদিকে, শিল্পকর্ম শিল্পকর্ম হিসাবেই স্বীকৃত। অর্থাৎ, একে কল্পনার ফল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিণতি নয়। এভাবে উপলব্ধি করা হয় বলে তা আদর্শিক জগতের অবাস্তবতাকেও তুলে ধরতে পারে, তাকে ধারণা আর ইমেজের সমষ্টি হিসাবে দেখাতে পারে । এইদিক থেকে শিল্পকর্ম বিজ্ঞানমুখী, কারণ তা পুঁজিবাদ সম্পর্কে একটা ধারণা যোগায় ও সেই সূত্রে আমাদের উপলব্ধি বাড়ায়। আলতহসার মার্কসীয় এই ধারণাকে আদর্শিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ের মিশ্রণ বলেছেন, তিনি বলেছেন,

"শিল্পের অনন্যতা হচ্ছে 'আমাদের দেখতে সাহায্য' করা, 'আমাদের ধারণা দেয়া', বাস্তবতার ইঙ্গিতবহ এমন কিছু 'অনুভব করানো।"

(আলতহসার ১৯৭১: ২২২)

বিপ্লবী শিল্পকর্মে বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিতবাহী উপাদান সুস্পষ্ট হবে। সামাজিক পরিবর্তনের উপায় হিসাবে শিল্পকর্ম দর্শকের আদর্শিক মিথ্যা সচেতনতাকে ঝেড়ে ফেলে বাস্তবতা সম্পর্কে একটা কিছু তুলে ধরে। এই কারণে আলতহসার চিত্রশিল্পী ক্রিমোনিনির প্রশংশা করেছেন, কারণ 'তাঁর চিত্রকর্ম দর্শকের মানবতাবাদী রুচির আত্মতুষ্টি ভাঙনের ক্ষেত্রে মিলনের জটিলতাকে অস্বীকার করে, এই জটিলতা দর্শককে তার চিত্রকর্ম বর্ণনার স্বতঃস্ফূর্ত আদর্শকে নিশ্চিত করে।' এই বিমূর্ত মন্তব্যের অর্থ হচ্ছে বিপ্লবী শিল্পকলা পরিচিত ও স্বস্তিকর উপায়ে বস্তুকে তুলে ধরে না, সাধারণ শিল্পকর্ম বরং এটা করে থাকে যদিও অপরিচিত উপায়ে সেটা করে; একারণে তা অস্বস্তিকর চেহারা নেয়। তাৎপর্যের দিক থেকে অবিপ্লবী শিল্পকর্ম, অধিকাংশ মার্কসবাদীর চোখে যা সব ধরনের প্রকৃতিবাদী 'অনুকরণ' অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, জগতের আদর্শিক ইমেজসমূহকে বাদ দিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখে। অধিকাংশ মার্কসবাদী মনে করবেন যে বুর্জোয়া শিল্পকর্মে ইঙ্গিতের উপাদান শিল্পী ও দর্শক উভয়কেই ফাঁকি দেয় ও তাদের প্রতারিত করে। একইভাবে সমালোচকগণও প্রতারিত হন, বিশেষ করে ১৯৫০ দশকের নব্য সমালোচকগণও প্রতারিত হয়েছিলেন। এইসব

সমালোচকদের অনুসন্ধানকেও মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচক টেরি ইগলটন 'নিরীহ' বলে মনে করে থাকেন, অর্থাৎ, তাতে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনও স্বার্থ জড়িত নেই। এ ধরনের সমলোচকরা শিল্পকে সাধারণ রূপেই গ্রহণ করেন ও তাতে যা পান তার সাথেই নিরপেক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার কল্পনা করেন। কিন্তু তাদের 'প্রাপ্তি' এক অসম্ভব ধরনের নিরপেক্ষতা আবিষ্কার করে থাকে। অথচ কারও পক্ষেই তার নিজস্ব সামাজিক আনুগত্যের বাইরে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

ঐ ধরনের শিল্প-সংক্রান্ত এই উপলব্ধি বিশেষভাবে মার্কসীয়। ভিন্নমতাবলম্বী হলেও হাঙেরীয় লেখক জর্জ লাকার রচনার উদাহরণ মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। লাকা 'বয়ান' ও 'বর্ণনা'র ভেতর মূল্যায়নসুলভ পার্থক্য টেনেছেন। লাকা আমাদের বলছেন, 'সত্যিকারের মহাকাব্যিক কবি বিষয়কে বর্ণনা করেন না, বরং সেগুলোর বৈশিষ্ট্যকে মানবীয় নিয়তির পরম্পরায় প্রকাশ করেন,' অন্যদিকে 'বর্ণনামূলক পদ্ধতির লেখকদের চরম আদর্শিক দুর্বলতা হচ্ছে তাদের নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ।' *(লাকা ১৯৭০: ১৪০)*। তাঁর কথায়, প্রকৃত কবিরা সামাজিক সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেন; আর যারা স্রেফ 'বর্ণনা' করেন তারা আসলে নিপীড়নকারী শক্তির সাথেই গাঁটছড়া বেঁধে থাকেন।

শিল্পকর্মের মাকর্সীয় দর্শন বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রায়োগিক উভয় গুরুত্বই ধারণ করে। বিজ্ঞানের সাথে তুলনায় এটা উপলব্ধির ত্রুটিপূর্ণ রূপ, তবে তা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা বা তাকে টলানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিল্পকর্ম-সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা ইতিহাস ও সমাজের মার্কসীয় তত্ত্বের নির্ভুলতার ওপর নির্ভরশীল ও তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং, এটা মনে করা যেতে পারে যে, আমরা সাধারণভাবে মাকর্সবাদ পরীক্ষা করলেই শিল্পকর্ম-সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব পরীক্ষা করতে পারব। যেহেতু সেজন্যে রাজনীতি, ইতিহাস ও দর্শনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়বে, তাই শিল্পের মার্কসীয় তত্ত্বের মূল্যায়ন ব্যাপক ও বিস্তৃত বলে মনে হতে পারে। অবশ্য বর্তমান কাজে আমরা বৃহত্তর এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করে যেতে পারি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মার্কসীয় তত্ত্বের যথার্থতা শিল্পের মার্কসীয় তত্ত্বের অপরিহার্য কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। অর্থাৎ, তত্ত্বকে ভুল বললে শিল্পের মার্কসীয় তত্ত্বকেও ভুল বলতে হবে; কিন্তু মর্কসীয় সামাজিক তত্ত্ব সত্যি হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ভ্রান্তিপূর্ণ হতে পারে। অন্য দিক থেকে, আমরা সামগ্রিকভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের বাইরে থেকেও শিল্পের মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা অনুসন্ধান করতে পারি।

আমরা যখন তা করি বা করার কথা ভাবি, শিল্পের ক্ষেত্রে মাকর্সীয় প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। 'মর্কসীয় শিল্পের তত্ত্ব আসলে কীসের তত্ত্ব?' এই প্রশ্নের ভেতরই সমস্যার বীজ নিহিত আছে। স্মর্তব্য, প্রথাগতভাবে অনুসন্ধানকৃত দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের মার্কসীয় বিকল্পের আবির্ভাব ঘটেছে কান্টিয় নন্দনতত্ত্বের

অনৈতিহাসিক অনিবার্যতার তত্ত্বের প্রতি অসন্তোষ থেকে। মার্কসবাদ এখানে মার্কসের রাষ্ট্রের হেগেলীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা ত্রুটিরই সন্ধান পেয়েছে। 'রাষ্ট্রে'র মতো 'শিল্প'ও অন্যতম নিয়ামক যা কোনোওভাবেই সত্যিকার অর্থে প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতার প্রতি উন্মুক্ত হয় না। (মার্কস ১৯৭০: ৪০)। তারপরেও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলতহসার, লাকা, বেনেট এবং আরও অনেক মার্কসবাদী দার্শনিক 'শিল্প' হিসাবে আখ্যায়িত (সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিমূর্ত ধারণাও) ধারণার প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, দার্শনিক নন্দনতাত্ত্বিকদের চেয়ে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের রচনায় 'শিল্প'র উপস্থিতি কম নয় মোটেই। এটা বিস্ময়করও নয়, কারণ 'শিল্প'র কোনও বিমূর্ত ধারণার ওপর নির্ভর না করে কোনও তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করাই শ্রেয়। এছাড়া, মার্কসীয় প্রয়োগের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা শিল্প ও অ-শিল্পের ভেতর সেই পাথ্যর্ক্যই টানছেন যা সামাজিক অনুসন্ধানে নেমে অধিক আলো বিস্ফোরিত করে বলে দাবি করেছেন।

বেনেটের মতে, 'শিল্প'র এই অব্যবহার্য বিমূর্ত ধারণার বাইরে মার্কসবাদীরা তৃতীয় ভিন্ন একটি লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছেন:

> ব্রেখটের কাজের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম বাদে মার্কসীয় সামলোচনবাদের বিকাশে প্রধান সব পর্যায় নন্দনতত্ত্বেরই উদ্যোগ ছিল। নন্দনতাত্ত্বিক বস্তুর নির্দিষ্ট প্রকৃতি সংক্রান্ত তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছে তা...প্রকৃতপক্ষেই মার্কসীয় সমালোচনাবাদের ইতিহাস জুড়ে যদি কোনও প্রধান সূত্রের উপস্থিতি থেকে থাকে তো সেটা সমন্বয়েরই প্রয়াস...দুটো উদ্বেগের সেট: একটি মার্কসবাদ ও এর রাজনৈতিক প্রণোদনার ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী স্বতঃসিদ্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অন্যটি বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্ব থেকে উৎসারিত।
>
> *(বেনেট ১৯৭৯: ১০৪)*

আমার মতে বেনেট সঠিকভাবেই এটা মনে করেন যে মার্কসীয় সমালোচনাবাদে এই দুটো উপাদানের সমন্বয় সম্ভব নয়। 'নন্দনতত্ত্বের উদ্বেগসমূহের সহযাত্রী ধারণাগত সরঞ্জামের উত্তরাধিকার সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী প্রয়োগের বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর বাধা সৃষ্টি করে' (*প্রাগুক্ত*)। বেনেটের গ্রন্থের স্মারক হচ্ছে এমনি এক কৌশল সৃষ্টির প্রয়াস। এই লক্ষ্যে তাঁর লক্ষণীয় প্রয়াসের সামগ্রিক প্রভাব নির্দেশনামূলক। বেনেটের অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ মার্কসবাদ শিল্পকে (বা বেনেটের ক্ষেত্রে সাহিত্যের টেক্সট) বিলীন করেছে বলা যেতে পারে। যেহেতু 'কোনও রচনা'র খোদ ধারণাই নন্দনতত্ত্বের একটি রূপ, মার্ক্সবাদীর পক্ষে সেই 'রচনা'র মাধ্যমে সামজিক বাস্তবতার প্রতিফলন, প্রকাশ, ধারণ বা বিরোধিতা করা সব সময় সম্ভব নয়।

> সক্রিয় ও সমালোচনমূলক হস্তক্ষেপ হলেও *মার্কসীয় সমালোচনাবাদই* বরং সংশিষ্ট টেক্সটের উপর কাজ করে সেটাকে সেগুলো যে *আদর্শিক রূপকে* 'ইঙ্গিত করে' তাকে 'প্রকাশ' বা তা থেকে 'দূরত্ব' সৃষ্টি করায়। সুতরাং তাদের যে আদর্শিক তাৎপর্য রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় সেটা 'স্বাভাবিক' নয়, এটা কোনও পূর্ব-প্রদত্ত তাৎপর্য নয় যা সমালোচনা নিষ্ক্রিয়ভাবে তুলে ধরে, বরং এটা মার্কসীয় সমালোচকদের কাজের ফলে তাদের এই *তাৎপর্য আছে* বলে ধারণা দেওয়া হয়।
>
> *(বেনট ১৯৭৯: ১৫৬, গুরুত্বারোপ আদি)*

কথা বলার এই কায়দা সহজবোধ্য নয়। বেনেট যা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে, শিল্পকর্মের গুরুত্ব বা প্রকৃত অর্থ তাদের সামাজিক কাজ হলে, সেগুলোর বস্তুগত উপাদানের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে নয় বরং কোনও সংস্কৃতির শিল্পের অবস্থানের মার্কসীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা বের করা হয়ে থাকে। সম্ভবত তিনি একথা ভেবে ঠিকই করেছেন যে দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের বিমূর্তবাদকে পরিত্যাগ করার এটাই অনিবার্য সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়াস। তবে সেক্ষেত্রে মূল্যটা অনেক বেশি। তবে সেটা শিল্পের ধারণাকে বিসর্জন দিতে হব বলে নয় বরং সব কাজ মার্কসীয় সমালোচনার পক্ষে করা হয়ে থাকে তো সেই সমালোচনা যেকোনও কিছুই হতে পারে বলে। মার্ক্সিয় সমালোচকরা হয়তো অনায়াসে ও সন্তোষের সঙ্গেই তাদের নিজস্ব উপাদান নির্মাণ করবেন ওইসব সাধারণ শিল্পীদের সৃষ্টির উপর নির্ভর করার মতো।

বেনেটের গ্রন্থের শেষের দিকে এই মারাত্মক ফল তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে তিনি রেনে বালিবারের কাজের উল্লেখ করে বলেছেন, "চরম তাত্ত্বিক বিভাজন অবশেষে শনাক্ত করা গেছে।" বালিবার জর্জ স্যান্ডের *দ্য ডেভিল'স পুল* থেকে একটি অনুচ্ছেদের পরস্পরবিরোধী টেক্সট তুলে ধরেছেন। একটি (১৯১৪) স্কুলে ব্যবহারের জন্যে সম্পাদিত ভাষ্য, অন্যটি ১৯৬২ সালের সমালোচনামূলক সংস্করণের টেক্সট। দুটি ভাষ্যের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তবে মার্কসীয় সমালোচকদের কাছে যেহেতু সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সেগুলোর পার্থক্য কতটা সেটাই আসল, তাই বেনেটের মতে "এগুলোর কোনওটাই 'মূল' বা 'সত্যি' টেক্সট নয়।" একথা সত্যি হলে আমরা এই উপসংহারে আসতে বাধ্য হই যে *মার্কসীয় সমালোচনাবাদের দিক থেকে* স্যান্ড যা লিখেছেন বা আদৌ যদি কিছু লিখে থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না। টেক্সট কেবল মার্কসীয় সমালোচক যা বলেন তাই।

এই উপসংহারে আসতে পেরে বেনেট খুশি, সম্ভবত সামঞ্জস্যতার দাবি এটাই চায়। তবে এখানে যে বিষয়টি তুলে ধরা দরকার সেটা হচ্ছে, মার্কসীয় সমালোচনাবাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষ্যের সাথে সাধারণভাবে শিল্প হিসাবে কথিত জ্ঞাত কোনও বিষয়ের ভেতর বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে শিল্পের তত্ত্বের ক্ষেত্রে বেনেটের মার্কসীয় সমালোচনাবাদের প্রয়োগের কোনও কারণ দেখি না। 'শিল্প' যেহেতু পরিত্যজ্য মিথ্যা বিমূর্তকরণ, তার কোনও তত্ত্ব থাকতে পারে না, তা সে মার্কসীয় বা অন্য যাই হাক না কেন। মার্কসবাদ যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছে থাকে, তার মানে এই নয় যে তা দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের চেয়ে ভালোভাবে বা অন্যভাবে কিছু করতে পারবে, বরং তা তেমন কোনও উদ্যোগের পূর্ণাঙ্গ পরিত্যাগ হবে। বেনেট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে 'কর্মকাণ্ড হতে স্বাধীন কোনও রচনা বা টেক্সটের অস্তিত্ব নেই।' (পৃষ্ঠা: ১৫৭) তাহলে শিল্পের তত্ত্বের জায়গায় অবশ্যই সমাজের বিশ্লেষণকে স্থান দিতে হবে।

এটা বহু মার্কসবাদীর প্রকাশ্য গৃহীত ফলাফল নয়। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, এই সিদ্ধান্ত এযাবত কেবল আলতহসার ও লাকার দৃষ্টিভঙ্গিতেই পাওয়া গেছে। অন্যান্য মার্ক্সিয় তাত্ত্বিকদের শিল্প সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা ছিল। যেমন, অন্যতম বিখ্যাত মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক টেরি ইগলটন মনে করেন, টেক্সট সামাজিক বাস্তবতার আদর্শগত ধারণা প্রকাশ করে না, বরং সেগুলো সেই বাস্তবতারই পরিণাম। সে কারণে সমলোচনার কাজ হচ্ছে–

> টেক্সটকে দেখিয়ে দেওয়া যা তার নিজের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, (খোদ হরফগুলোর ভেতর খোদাই করা) নির্মাণের সেই অবস্থাগুলোকে প্রকাশ করা, যেগুলো স্বভাবতই নীরব...এমনি একটা প্রকাশ অর্জনে সমালোচনাকে অবশ্যই আদর্শিক পূর্বইতিহসের সাহায্যে ভেঙে টেক্সটের বাইরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকল্প সীমানায় নিজেকে স্থাপন করতে হবে ।
>
> *(ইগলটন ১৯৭৮: ৪৩)*

এ কথা বলে ইগলটন কী বোঝাতে চেয়েছেন বোঝা খুব সহজ নয়, কিন্তু সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য যদি হয় এমন কিছু যা সম্পর্কে টেক্সট বা রচনা আবশ্যিকভাবেই নীরব ও সমালোচনাকে যদি অবশ্যই নিজেকে "টেক্সটের সীমানার বাইরে স্থাপন" করতে হয়, তাহলে এখানেও শিল্পের বিলীন হয়ে যাওয়ার একটা স্পষ্ট সম্ভাবনা রয়ে যায়। একটি ধারা হচ্ছে টেক্সটকে উপেক্ষা না করে স্বাভাবিক বিজ্ঞান যেভাবে মামুলি পরীক্ষামূলক উপাত্তের গভীরে গিয়ে সেই উপাত্তকে ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে একটা তত্ত্বে পৌঁছায় সেভাবে

অথবা সাধারণ পর্যবেক্ষণকে অতিক্রম করে যাওয়া মিথ বা আচারের ব্যাখ্যা-যোগানো নৃতত্ত্ব পাঠ করার ইগলটনের প্রয়াস। যদিও কোনও তুলনাই নিখুঁত নয়, এই ধরনের উপস্থাপন ইগলটনের চিন্তাধারা ও অন্যান্য সাধারণ কাঠামোবাদীদের ভাবনার মাঝামাঝি একটা জায়গায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুহূর্তের জন্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মার্কসবাদকে পরিমার্জন বা নন্দনতত্ত্বের সমাপ্তি নয় বলে মেনে নিলে সহযোগী কাঠামোবাদী পদ্ধতিকেই পর্যালোচনা করার প্রয়োজন পড়বে।

[বি. দ্র. 'হালখাতা'র সম্পাদক ও উপরিউক্ত অনুবাদকের নাম হুবহু এক কিন্তু এরা আলাদা ব্যাক্তি]

ইংরেজি রচনাটি সংগ্রহ করেছেন জাইদ-বিন-কালাম

প্র ব ন্ধ

শিল্প ও পরধনতন্ত্র

স লি মু ল্লা হ খা ন

শিল্পকলা বলিতে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ আজও একপ্রকার বিলাসদ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই বিলাসদ্রব্য– যেমন চিত্রকর্ম বা ভাস্কর্য– তৈয়ার করেন তাঁহারা চারুশিল্পী বলিয়া গণ্য হন। পেশায় তাঁহারা শিল্পী–চিত্রকর বা ভাস্কর–হইলেও পদমর্যাদায় কেহ-বা অধ্যাপক। কেহ-বা সাংবাদিক অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর সন্তান পদবাচ্য। চারুশিল্পীগণ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সভ্য বলিয়া চারুশিল্পকে ফাইন আর্টস না বলিয়া যদি বলিতেন ইন্টেলেকচুয়াল আর্ট মন্দ হইত না। ঊনবিংশ-শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ শিল্পী উইলিয়াম মরিস (১৮৩৪-১৮৯৬) এই কথাটাই বলিয়াছেন। শিল্পীগণ এখানে বুদ্ধিজীবী।

আর যে সকল দ্রব্য আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার-সামগ্রী তাহার উৎপাদকগণ গণ্য হন শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে। তাহাদের কাজকে বলা হয় "কারুশিল্প" বা "ডেকোরেটিভ আর্ট"। আসলে বাংলায় চলিত ফারসি শব্দ "কারখানা" হইতে এই শব্দ আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রমজীবী বা কৃষক-জাতীয় কোনো শিল্পী যদি নক্‌শা বা মূর্তি বানাইয়া বসেন তবে তাহার নাম "ফাইন আর্টস" হয় না, হয় "লোকশিল্প" বা "ফোক আর্ট"।

শিল্প কী বস্তু– ইহার উত্তর যাঁহার জানা নাই তিনিও জানেন শিল্প নানা প্রকারের। এই প্রকারভেদ জানিলে শিল্পের মর্মোদ্ধার খানিক সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়াইয়া করা যায়।

শিল্পের সঙ্গে পরিশ্রমের যোগাযোগ বা সম্পর্ক এক সময় ছিল। আজ সে সম্পর্ক একটা আবরণের নিচে চাপা পড়িয়াছে। ইহার কারণ ইতিহাস হইতেই বাহির করিতে হইবে।

উনিশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক জন রাস্কিন (John Ruskin) কোথাও বলিয়াছিলেন শিল্প মানুষের পরিশ্রমের আনন্দ। যে দিন পরিশ্রমের সঙ্গে আনন্দও ছিল তখন পরিশ্রমী মানুষই শিল্পী ছিলেন। আর যে দিন পরিশ্রম পরের অধীন হইয়াছে আর তাই নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে, সেদিন সেখানে শিল্পও আড়ালে চাপা পড়িয়াছে। সারা দুনিয়াতেই পড়িয়াছে।

বাংলাদেশেও এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। এখানেও একদা যাহা ছিল আজ তাহা নাই। চারু ও কারু বা চারু ও লোক– শিল্পের এই বিভাজন হইতে বোঝা যায় শিল্পকলা কেন "বিলাসদ্রব্য" বা সাধারণ অর্থে "ভোজ্যদ্রব্য" হইয়াছে। অথচ জীবনের সকল এলাকায়ই তো শিল্প আছে। ফসলের মাঠ কোন আকৃতির তাহা শিল্প, রাস্তার আঁকাবাঁকা হওয়ার ধারাটাও শিল্প। আজ সাধারণ মানুষের জীবন হইতে আনন্দ যেমন বিদায় হইয়াছে তেমনি আমাদের শহর ও গ্রাম পর্যন্ত কুৎসিত আকারে ছাইয়া গিয়াছে।

ইহার পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস। সমাজে, মানুষে-মানুষে কুৎসিত সম্পদবিভাজনই ইহার একমাত্র কারণ নহে। আজ হইতে প্রায় আড়াই শত বছর আগে আমাদের দেশ বিদেশি ধনতন্ত্রের হাতে পড়ার পর এই কারণমালার আরও এক মাত্রা বাড়িয়াছে। ইহাকেই আমি এই নিবন্ধের গোড়ায় "পরধনতন্ত্র" নাম দিয়াছি।

বিদেশি ধনতন্ত্র আমাদের দেশি ধনতন্ত্রকে কাবু ও করতলগত করিবার পর অবস্থা বেশ বেগতিক হইয়াছে। এই দেশের চারুশিল্পীরা একবার বিদেশি শিক্ষাগুরুদের তোয়াজ করিয়াছেন, আবার দেশীয় লোকশিল্প হইতে দীক্ষা লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দোমনা দশা হইতে নতুন কিছু যে বাহির হয় নাই তাহাও নহে। কিন্তু চারু ও কারুশিল্পের বিভেদ এক্ষণে প্রায় বিদেশি ও দেশি শিল্পের ভেদ বলিয়া মনে হইতেছে। আমি ব্যভিচারের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি নিয়মেরই কথা। শেখ

মোহাম্মদ সুলতানের মতো কেহ কেহ চারুশিল্পীদের মধ্যেও দাঁড়কাক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহাতে চারুশিল্পীদের বিদেশি শিক্ষাটাই প্রকট বা বেশি আকার ধরিয়াছে। ইহাও-বা কম কিসের?

আমার প্রশ্ন হইতেছে মানুষের জীবনে যদি শুধু পরিশ্রম থাকে অথচ আনন্দ থাকে না তখন শিল্পও বিদায় নেয়। বর্তমানে বেশির ভাগ মানুষের জীবন– যাহাকে দারিদ্র্যসীমা বলা হয় তাহার নিচে, অনেক নিচে। সরকারি হিসাবে যাহা বলা হইয়া থাকে তাহার অনেক নিচে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন সাড়ে তিন হাত দেহের জন্য সাড়ে তিন হাত ঘরই যথেষ্ট নহে। একটু বাড়তি জায়গাও লাগে। এই বাড়তি জায়গাটুকুকেই আমরা শিল্প বলিয়া চালাইতে পারি। বর্তমান যুগে– বিশেষ আমাদের মতো গরিবমারা দেশে–যেখানে মানুষের জীবন হীন হইতে হীনতর অবস্থানে সেখানে শিল্পকলা কেন বিলাসদ্রব্য মনে হইবে না? শিল্পসৃষ্টিকে কখনো কখনো তাই অনৈতিক কাজ বলিয়া ভ্রম হওয়া অসমীচীন কি অস্বাভাবিক নহে।

পুরানা যুগের হাকিম আফলাতুন (ওরফে প্লেটো) কিংবা আধুনিক যুগের জাঁ জাক রুসো (Rousseau) এবং লিও তলস্তয় পর্যন্ত যে শিল্পকলার বিরুদ্ধতা করিয়াছেন তাহার রহস্যও এইখানে বলিয়াই আমার মনে হয়। রুসো বলিয়াছিলেন শিল্পকলার প্রগতি মানুষের নীতিশিক্ষায় কোনো সহায়তা করে নাই। অন্যভাবে বলিলে শিল্প মানুষকে সভ্যতা শিক্ষা দেয় নাই। শিল্প দোষী নহে, বিজ্ঞানকেও তিনি একই দোষে দোষী করিয়াছেন। পুরানা যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া অভিহিত গ্রিক মনীষী সোক্রাতেসও শিল্পকলার বিষয়ে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলিয়াছিলেন। মাত্র একশ বছর আগের কথা। রুশ লেখক তলস্তয়ও শিল্পকলার নিকুচি করিলেন। কিন্তু কেন?

অথচ খোদ রুসো চমৎকার নাটক লিখিয়াছেন। গান রচিয়া ও সুর ভাজিয়া খাইয়াছেন। তলস্তয়ও শিল্পকলায়–রচনাশিল্পে–চরম উৎকর্ষ সাধন করিলেন। তলস্তয় গল্পকার। আফলাতুনকেও কবি বলা চলে। শিল্পের নিন্দা করিলেও দেখা যায় তাঁহারা শিল্প কিন্তু ছাড়েন নাই। এইখানেই রহস্যের চাবিকাঠি পাওয়া যাইতেছে।

আফলাতুন, রুসো ও তলস্তয় প্রমুখ মনীষী আসলে শিল্পের বিরুদ্ধতা করিতেছেন না– করিতেছেন ধনিকতন্ত্রের বা প্লুটোক্রেসীর অধীনে চাপা পড়া বিলাসদ্রব্যের। অথচ মানুষ মাত্রই যখন শ্রমিক ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন শিল্পীও। জীবন হইতে স্বাধীনতা ও আনন্দ বিদায় হইয়াছে বলিয়াই আমরা দেখিতেছি শিল্প সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের হাতে নাই।

ধনিকতন্ত্রের হাতে শিল্প যখন গৃহবন্দী হইল তখন আমরা দেখিলাম আমাদের জীবন হইতে শিল্প চলিয়া গিয়াছে। আমরা যদি আমাদের স্বদেশী কবির ন্যায় বলিতাম– "আমাদের জীবনের জন্য আজ শিল্প চাই, ফিরে চাই মাটির আঘ্রান"– যদি বলিতাম– "তপ্ত অঙ্গীকার বুকে নিয়ে আমি সেই শোভন আগুন আজ ছড়াবো সময়ে"– তবে ঠিক কাজ হইত। আমার মনে হয় এই কাজটিই আমাদের করা দরকার।

ওইদিকে যে সকল বড় মনীষী ও শিল্পী মনীষা ও শিল্প উভয়কেই অভিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা তো শিল্প ছাড়েন নাই। এই ঘটনা হইতে প্রমাণ, শিল্প একদা সমগ্র জনগণের মধ্যে প্রকাশিত ছিল। কিন্তু পরে তাহা ছোট একটি শাসকগোষ্ঠীর হাতে বন্দী হইয়াছে। তাই মনীষী ও শিল্পীদের এই প্রতিবাদ বা অভিমান।

আমাদের মতো শ্রেণীবিভাজিত ও পরাধীন দেশে এই কথাটুকু বুঝিবার বিশেষ দরকার আছে। আমি অনেক গুণী ও মাঝারি গোছের চিত্রশিল্পীর কথা জানি যাঁহারা নিজেরাও বন্দী অবস্থায় আছেন বলিয়া মনে করেন। এই বিভেদ তাঁহাদের রচনা নহে। তাঁহারাও ইহার শিকার।

এখন প্রশ্ন হইতেছে– এই অবস্থা হইতে ত্রাণের উপায়? উপায় অবশ্যই আছে। কিন্তু মনে হইতেছে সেই উপায় অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টাই নাই। উদ্দেশ্য না থাকিলে উপায় সন্ধান কে করিবে?

যতদিন পর্যন্ত শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের জীবন মানবোচিত না হইবে ততদিন আমরা শিল্পকলা বলিতে বড়লোকের গৃহসজ্জা, বাগানসজ্জা বা হোটেলসজ্জার উপকরণ বুঝিব। বুঝিব কুৎসিত, নোংরা আবর্জনার শহরে মাঝে মাঝে টাঙানো বিজ্ঞাপন, সড়কদ্বীপের মূর্তি বা একটুখানি জলের ফোয়ারা।

শ্রমের আনন্দ ফিরাইয়া আনিবার পূর্বশর্ত শুধু যন্ত্রকৌশলেই নাই। আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে। সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে। আমাদের শিল্পীরা যদি এই কথা না-ও জানেন, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের শ্রমিকদের ইহা বুঝিতে হইবে। সেই জন্যই আমি রুসো ও তলস্তয়ের মতামত ষোল আনা মানিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমি শিষ্য হইয়াছি উনিশ শতকের দুই মনীষী যথাক্রমে উইলিয়াম মরিস (১৮৩৪–১৮৯৬) ও কার্ল মার্কসের (১৮১৮–১৮৮৩)। মানুষ কেবল ভাত খাইলেই বাঁচিবে না। – তাহার শিল্পেরও দরকার পড়িবে।

শিল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ

খা লি কু জ্জা মা ন ই লি য়া স

যেকোনো শিল্পকর্ম কোনো প্রসঙ্গ অবলম্বন করে রচিত হয়। কিংবা বলা যায় বিষয়কে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করাই শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য। শিল্পের যেমন সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ থাকতে পারে তেমনি প্রসঙ্গ ভেঙে প্রসঙ্গহীনতা সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। এই প্রয়াস আবার সৃষ্টি করে প্রসঙ্গহীনতার প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রসঙ্গ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকলে এই নেতিবাচক প্রসঙ্গ সৃষ্টিও সম্ভব হয়না। বক্তব্য প্রকাশকালে শিল্পী বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করেন। কোন মাধ্যমে শিল্পী সবচেয়ে কার্যকরভাবে, সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও বলিষ্ঠভাবে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারবেন তা তিনিই ভালো বোঝেন।

সাহিত্যিক যেমন সাহিত্যের যেকোনো মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে শব্দ, অক্ষর, বাক্য, ছন্দ, উপমা ব্যবহার করেন; চিত্রকর চিত্র-মাধ্যমে রং রেখা তুলি ব্যবহার করেন; সঙ্গীতজ্ঞ করেন শব্দ সুর তাল লয় ও বাদ্যযন্ত্র, তেমনি নাট্য-পরিচালকও নাটক মঞ্চায়নে ব্যবহার করেন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সৃজনশীলতা ও বিভিন্ন মঞ্চ উপকরণ; চলচ্চিত্রকার ব্যাপক প্রেক্ষাপটে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরার সাহায্যে গড়ে তোলেন এক স্বতন্ত্র মাধ্যম। বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে ছবি তুলে আলোকচিত্র-শিল্পী প্রয়োজনীয় আলোকসংশ্লেষের মাধ্যমে প্রকাশ করেন তাঁর বিষয়বস্তু।

এই প্রত্যেকটি মাধ্যম যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি আবার সম্পৃক্তও। এদের স্বাতন্ত্র্য প্রধানত দুরকমের: শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিগত এবং শিল্পের মাধ্যমগত। আবার যেহেতু মাধ্যম শিল্পীর বক্তব্য প্রকাশেরই একটি উপায় বা পদ্ধতি সেজন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবণতাই যথার্থ মাধ্যম অবলম্বনে সাহায্য করে। একজন শিল্পী শিল্পের বিশেষ এক বা একাধিক মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে মনে করেন বলেই তিনি উক্ত মাধ্যম চর্চা করেন। অবশ্য এই মাধ্যম গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁর কাল এবং পারিপার্শ্বিক অবশ্যই প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। শেক্সপিয়র কেন চিত্রাঙ্কন কিংবা সঙ্গীত মাধ্যমে শিল্পচর্চা না করে প্রধানত নাটক এবং কবিতাকেই বেছে নিলেন তার কারণ নিহিত তাঁর সমসাময়িক যুগ এবং প্রতিবেশে। প্রতিভার সর্বজনীনতা, মাধ্যমহীনতার কথা বলা হয়। বলা হয় প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্য যেকোনো মাধ্যম অবলম্বন করবেই। শেক্সপিয়র যদি বিজ্ঞানচর্চা করতেন তাহলে তিনি নিউটন কিংবা আইনস্টাইন

পর্যায়ের বিজ্ঞানী হতে পারতেন। কিন্তু এ কোনো কাজের কথা নয়। শেক্সপিয়র বিজ্ঞানচর্চা করতেন কি না তা যেমন নির্ভর করতো তাঁর যুগ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর তেমনি বিজ্ঞানচর্চা করলেই তিনি যে সক্ষম বিজ্ঞানী হতেন তা কিছুতেই বলা যায় না। আসলে প্রতিভার এই এক গোপন ও দুর্বোধ্য সত্য। যুগ ও কালের জাদুস্পর্শে কখনো কখনো এ ধরনের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। প্রতিভার অধিকারী সকলেই। অনুকুল পরিচর্যার অভাবে অবহেলা অনাদরে কত প্রতিভা যে লোকচক্ষুর আড়ালে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তার হিসেব ইতিহাসের কোথাও লেখা নেই।

সেজন্য শিল্পীর প্রতিভা এবং শিল্পমাধ্যম গ্রহণের মধ্যে একই সঙ্গে ঘটনাপারম্পর্য ও সামঞ্জস্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। ঘটনাপারম্পর্য? কেননা প্রতিবেশ অনুকূল না হলেও কোনো দুর্ঘটনায় তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের পথ খুলে যেতে পারে। আর সামঞ্জস্য? কারণ শিল্পীর প্রবণতা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকৃতিই তাঁকে দুর্বারগতিতে টেনে নেয় তাঁর উপযোগী মাধ্যমের দিকে। এইভাবেই একজন সঙ্গীতশিল্পী সৃজনশীলতার চর্চা করেন সঙ্গীত-মাধ্যমে, চিত্রকর করেন চিত্রাঙ্কন মাধ্যমে, চলচ্চিত্র-পরিচালক চলচ্চিত্রে; এমনকি একজন রাজনীতিবিদও রাজনীতিতেই নিজ সৃজনশীলতা প্রদর্শন করেন। অবশ্য রাজনীতি কোনো শিল্পমাধ্যম নয়, যদিও রাজনীতিবিদের শক্তিশালী হাতিয়ার। বক্তৃতা? অবশ্যই একটি শিল্প। ডেমস্থিনিসের বাগ্মিতা, রানী এলিজাবেথের স্প্যানিশ আর্মাডার সময় ইংরেজ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা কিংবা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের স্বপ্নোচ্চারিত বক্তৃতা অমর শিল্পনিদর্শন হিসেবেই পরিচিত।

বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা মূলত একটি ব্যাপারে লক্ষ করা যায়। তা হল তাদের বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতা। প্রত্যেক শিল্পমাধ্যমেই মানুষের জীবন, নিসর্গ কিংবা ব্রহ্মাণ্ডের যেকোনো বস্তু, যেকোনো বিষয় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে কখনো বিভিন্ন, কখনো অনেকটা একই ধরনের প্রভাব ও সার্থকতা অর্জন করে। একই বিষয়বস্তু কাব্য-মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সঙ্গীত কিংবা চিত্রমাধ্যমে তার প্রভাব ভিন্ন হলেও অনেক সময় তা একই অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। চায়োকোভস্কির সোয়ান লেক শুনে কোনো বনাঞ্চলের জ্যোৎস্নায় এক স্থির সবুজ জলাশয় এবং তাতে সঞ্চরণশীল একঝাঁক সাদা রাজহাঁস এবং অদূরে ছোট্ট ধবধবে মর্মর পাথরের একটি দ্বিতল বাসভবনের চিত্র ভেসে উঠতে পারে। বাস্তবিকই বিমূর্ত যন্ত্রসঙ্গীত এরকম চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সক্ষম। বিঠোভনের ষষ্ঠ সিম্ফনি শুনে তার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর অনুভূতি জেগে ওঠে। কখনো গ্রামের আনন্দমুখর মেলার, কখনো ঝড়ে মেলাভঙ্গের, কখনো বা শান্ত মর্মরধ্বনি তুলে প্রবাহিত গ্রামীণ নদীতীর এবং পাখির কুজনের।

একবার দক্ষিণ ভারতে এক সঙ্গীতসভায় জনৈক পাশ্চাত্য সঙ্গীতশিল্পী পিয়ানোয় তাঁর বাজনা শোনান। বাজানো শেষ হলে উপস্থিত একজন ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞের অনুভূতি জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন যে বাজনা চলাকালীন সময়ে তিনি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন কোনো এক মরুভূমি– তাতে উটের কাফেলা চলেছে ধীর মন্থর গতিতে। হঠাৎ লু হাওয়ায় বালির ঝড় ওঠে। তখন সব কিছু কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আরোহীরা ব্যস্ত হয়ে উটের পাশে শুয়ে প্রাণ বাঁচায়। বর্ণনা শুনে সঙ্গীতশিল্পী জানান যে তাঁর ওই বাজনার নাম 'কেরাভান।' একজন ফরাসি সঙ্গীতকার তাঁর 'অক্সিজেন' শীর্ষক শিল্পকর্মে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অবিকল সমুদ্রের স্বর ধ্বনিত করে তুলেছেন। ঢেউ-এর পর ঢেউ সশব্দে এসে আছড়ে পড়তে থাকে তীরে, আর এরই মাঝে শোনা যায় এক অসহায় গাঙচিলের বিক্ষিপ্ত ডাক।

শুধু পাশ্চাত্য-সঙ্গীতই নয়, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বিভিন্ন রাগরাগিণী বিভিন্ন লগ্ন, ঘটনা অনুভূতি ও আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম। অবশ্য পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত যেখানে বাস্তবমুখী, উল্লম্ব, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সেখানে আনুভূমিক, বিমূর্ত, এবং অরূপ জগত সৃষ্টিতে, বস্তুকে চেতনা এবং আত্মায় রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট।

কিন্তু শব্দ ও সুরবিন্যাসে চিত্রকল্প সৃষ্টি হয় কী করে? শক্তিশালী শিল্পী নিজের অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও সৃজনশীলতা নিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্ম তথা বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। বিমূর্ত যন্ত্রসঙ্গীত শ্রোতার অন্তরে যে চিত্রকল্প ও ভাবানুভূতি সৃষ্টি করে, একটি বিমূর্ত চিত্র কিংবা সাহিত্যকর্মও একই ধরনের অনুভূতি উস্কে দিতে পারে। এখানেই বিভিন্ন মাধ্যমের ভেতর সামঞ্জস্য।

বিষয়বস্তু বা কোনো আবেগানুভূতি প্রকাশে সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন শব্দপুঞ্জ, তাঁর বাক্যগঠনরীতিতে ব্যবহৃত হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাকধারা; চিত্রকর সৃষ্টি করেন বিভিন্ন অংকনপদ্ধতি, ব্যবহার করেন বিভিন্ন বর্ণ; সঙ্গীতজ্ঞ বিভিন্ন পর্যায়ে করেন তান বিস্তার মীড়গমক ও কারুকাজ। আঙ্গিক বা প্রকরণ বলতে প্রধানত এই কৌশলগত দিকই বোঝায়। কিন্তু উন্নত শিল্পকর্মে এই কৌশলগত দিক কখনোই প্রসঙ্গ ছাপিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না। বরং তা প্রসঙ্গকে যথার্থ বাস্তব প্রেক্ষিতে প্রকাশ করে। এবং তখনই সেই কর্ম উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য হয়। এজন্য আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু পরস্পর সম্পূরক। শুধুমাত্র আঙ্গিক যেমন শিল্প নয়, তেমনি কেবল ভাবানুভূতির প্রকাশই বা রচনার বিষয়বস্তুই শিল্পপদবাচ্য নয়। শিল্পকে শিল্প হয়ে উঠতে গেলে অবশ্যই এদুইয়ের অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন প্রয়োজন। এই মিলন নির্ভর করে শিল্পীর সমন্বিত অবলোকন-ক্ষমতার ওপর।

নিজ জীবনের এবং চিন্তার অভিজ্ঞতাসমূহের সুসামঞ্জস্য নির্বাচনই কম্প্রিহেনসিভ ভিশন। জীবন ও জগতের আলেখ্যই শিল্প নয়। কতটুকু গ্রহণ ও বর্জনের ফলে শিল্পকর্ম যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে তা নির্ধারণই শিল্পীর কাজ। চিত্রাঙ্কনে দু

একটি রেখা সমগ্র চিত্রটিকে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে তুলতে পারে। সাহিত্যে দুচারটে সংলাপ মুহূর্তে একটি চরিত্রকে পাঠকের মনে অমর করে রাখতে পারে। সঙ্গীতে দু একটা মীড়ের কাজ সমস্ত সঙ্গীতকর্মটিকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে পারে। এভাবেই শিল্পকর্ম শিল্পীর সুষম দৃষ্টিভঙ্গিতে পায় শিল্পোত্তীর্ণতা।

শুধু শিল্পীর সুষম দৃষ্টিভঙ্গিই বা কেন, বলা চলে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের জন্ম একই লগ্নে। একজন আধ্যাত্মবাদী কবি নিকোস কাজানজাকিসের মতে ভাবাবেগ ও আঙ্গিক জন্ম নেয় একটি অখণ্ড মুহূর্তে, অখণ্ড একটি ক্ষণিক দীপ্তিতে তারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঠিক মানুষের মতো; মানুষ যেমন দেহ ও আত্মার অবিভাজ্য সংমিশ্রণে জন্ম নেয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গানই রচনা করেছেন বাণী ও সুরের অখণ্ড জন্মলগ্নে। একটা সুরে গুণগুণ করতে করতে তিনি গান লিখতেন। এজন্যই তাঁর গানে সুর ও বাণীর এত একাত্মতা এবং তাঁর গান এতটা শিল্পোত্তীর্ণ। বুর্জোয়া কিংবা প্রগতিশীল যেকোনো মহৎ রচনার ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ ও প্রকরণের এই একাত্ম সৃষ্টিপ্রক্রিয়া একটি স্বীকৃত সত্য। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের বিপুল অধিকাংশ রচনাই সাধারণ; বিশেষ করে রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক প্রগতিশীল রচনায় মহৎ শিল্প নিদর্শন তো নিতান্তই অপ্রতুল। শিল্পীর রচনায় অখণ্ড আঙ্গিক ও ভাবাবেগের একাত্ম সৃষ্টিও এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

সেজন্য অধিকাংশ শিল্পকর্মে শিল্পীকে বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করেই আঙ্গিক নির্ণয় করতে হয়। বিশেষ করে প্রগতিশীল শিল্পীর কাছে বিষয়বস্তু যে আঙ্গিকের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান সে কথা বলাই বাহুল্য। কেননা প্রগতিশীল শিল্পী জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তাঁদের মঙ্গলের জন্যই কোনো প্রগতিশীল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পকর্ম করেন। এজন্য তাঁর মূল লক্ষ্য প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গকে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে যেতেই তাঁর যোগ্য প্রকরণ-সন্ধান। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ একই সঙ্গে জন্ম না নিলেও তিনি সচেতনভাবে প্রকরণ অনুসন্ধান করে তা সৃষ্টি করেন এবং নিজ কর্মকে শিল্পোত্তীর্ণ করে একটি কার্যকর শিল্পে পরিণত করেন। অন্যদিকে অবক্ষয়প্রাপ্ত বুর্জোয়া শিল্পের লক্ষ্য প্রকরণ। বুর্জোয়া শিল্পীর বলবার আর অবশেষ তেমন কিছু নেই। হয় তাঁকে স্বমেহন দ্বারা নিজ রচনা নিজ শ্রেণীর নাকিকান্নায় একাকার করতে হবে নয়তো নতুন নতুন আঙ্গিক নিয়ে অস্থিরচিত্ত শিশুর মতো খেলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। হ্যাঁ, যার বলবার কিছু নেই, যিনি কোনো অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুত নন তিনিই কেবল শব্দ, সুর রং ও অলঙ্কার নিয়ে খেলায় মত্ত হন, আঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত হন। শিল্পমাধ্যমের এই প্রবণতা বস্তুত অবক্ষয়েরই লক্ষণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইংরেজি সাহিত্যে ফিন ডি সিক্‌ল্ আন্দোলনে এই অবক্ষয়ের প্রকাশ। এই প্রবণতাকেই স্টিফেন স্পেন্ডার তুলনা করেছেন ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল খেলার সঙ্গে। রুশ কবি য়েভতুসেঙ্কো অলঙ্কারসর্বস্ব কাব্যকে তুলনা করেন শখের প্রতিযোগিতার গাড়ির সঙ্গে; একই বদ্ধ পথে সে অর্থহীনভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। এধরনের শিল্প নিম্নমানের এবং জনগণের কোনো

মননসৃষ্টিতে কিংবা প্রগতিশীল আন্দোলনে কোনো রকম সাহায্য করতে অপারগ। অলঙ্কার-প্রধান শিল্পে শিল্পীর কাছে কোনো মহৎ আদর্শ বা বিষয়বস্তু নয় বরং প্রকরণ বা উপায়ই হয়ে দাঁড়ায় বিষয়বস্তু। আসলে কোনো প্রগতিশীল দর্শনে শিল্পীর বিশ্বাস না থাকলে কিংবা জনগণের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধের অভাব থেকেই এমনটি ঘটে।

শিল্পে অলঙ্কারাধিক্য শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। শিল্প যথার্থ শিল্পত্ব পায় অলঙ্কারের সংযত ব্যবহারে। আসলে অলঙ্কারকে অলঙ্কার হিসেবে দেখলে তাকে বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে অলঙ্কার ব্যবহৃত হলে অবশ্য তা আর অলঙ্কার থাকে না, শিল্পকর্মের শরীরে তা অবিভাজ্যভাবে মিশে যায়। আঙ্গিক তো কোনো পোষাক নয় যে তা ভাবাবেগ বা বিষয়বস্তু আবৃত করে রাখবে। বিষয়বস্তুর সাহায্য অনুযায়ীই নির্মিত হয় আঙ্গিক। লেখকের উদ্দেশ্য যত মহৎ, তাঁর শিল্পের আঙ্গিক বিন্যাসও তত উন্নত ও সন্নিবদ্ধ। একজন সাহিত্যিকের ব্যবহৃত বিশেষণ তাঁর বক্তব্যকে সবদিক থেকেই ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। একজন সঙ্গীতশিল্পীর আলাপ, তান বিস্তার, ঝালা ইত্যাদি তাঁর রাগের মূল গৎ কিংবা রাগের মূল চরিত্র প্রকাশেই ব্যবহৃত। বাহুল্য অলঙ্কার সঙ্গীতশিল্পীকে যেমন রাগ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে রাগের চেহারা বিনষ্ট করে শিল্পীকে বিভ্রান্ত করতে পারে, তেমনি সাহিত্য, চলচিত্র কিংবা চিত্রাঙ্কনেও অসঙ্গতিপূর্ণ আঙ্গিক-সচেতনতা, অলঙ্কার-প্রয়োগ বাস্তব থেকে, জনগণ থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

শিল্পসৃষ্ট মায়ারাজ্য চাকচিক্যময় হতে পারে, তার ঔজ্জ্বল্য চমক লাগায় এবং সাময়িক যশ ও প্রতিপত্তি অর্জনে সাহায্য করে কিন্তু কখনোই তা স্থায়ী কোনো মূল্য বহন করে না। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় প্রগতিশীল রচনা করতে গিয়ে বিষয়ের ওপর বেশি দৃষ্টি রাখতে হয় বলেই অনেক সময় আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সুষম প্রকাশ ঘটে না। শিল্প হয়ে ওঠে প্রচারধর্মী এবং শিল্পীর অভিলাষ অনুগামী, ফলে প্রেক্ষিত ও বাস্তবতা-বিবর্জিত। জনগণের শাসনে প্রতিষ্ঠিত ও অভ্যস্ত সমাজে লেখক যখন শিল্পরচনা করবেন তখন তা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সুষম সংযোগে মূর্ত হয়ে উন্নতমানের শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হবে।

শিল্পের দর্শন: ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিরই দ্বারা

ফ রী দু ল আ ল ম

শিল্পের দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শিল্পের স্বরূপ-বিষয়ক কিছু কথা বলাটা সম্ভবত খুব-একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শিল্পের স্বরূপ বিষয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে ভাব ও রূপ মিলিত হয়ে যে অখণ্ড সত্তার উদ্বোধন করে তাই হল শিল্প। শিল্প হচ্ছে ভাবেরই আবেগময় অভিব্যক্তি। শিল্পী যখন কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন তখন তাঁর মনে ভাব অথবা অনুভূতির সঞ্চার হয়। কোনো শিল্পী-ই বস্তুজগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তাঁর নিভৃত চিত্তলোকে বিহার করতে পারেন না। জীবনের যে বিচিত্র লীলা জগৎজুড়ে চলছে– একটা বিশেষ মুহূর্তে তারই আকস্মিক প্রতিফলন হয় শিল্পীর অন্তরের অন্তস্থলে । এ প্রতিফলন কেন হয়, কী করে হয়– এ প্রশ্নের অবিসম্বাদিত কোনো জবাব নেই। শিল্পীর মন অত্যধিক মাত্রায় সংবেদনশীল এবং সেজন্য শিল্পী সহজেই অভিভূত হয়ে যান– এ রকম একটা ব্যাখা দাঁড় করানো হলেও সেটা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। আবার যৌক্তিক ব্যাখ্যা যেখানে অচল সেখানে ক্রিয়াবিশেষের উপর অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রেও অনেকে বলেন– শিল্পকর্মের মূলে থাকে ঐশী প্রেরণা।

বাল্মীকির কবিত্ব শক্তিলাভ সম্পর্কে যে কিংবদন্তি রয়েছে তা এই প্রেরণাবাদেরই প্রথম আভাস। হোমারের "ইলিয়াড" ও "ওডিসি"-তে যে MUSE বা বাণীবন্দনা রয়েছে তাতেও প্রেরণালাভের কামনা অভিব্যক্ত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে একাধিক বিশ্ববিশ্রুত কবি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রেরণাবাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে "জীবনস্মৃতি"-তে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তা আরও ব্যাপক ও গভীরতর :

'আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।' (প্রভাত-সংগীত)

আধুনিক মনোবিদ্যা প্রেরণাতত্ত্ব তথা শিল্পীর মানসক্রিয়ার উপর কিছুটা আলোকপাত করেছে। শিল্পীরা মনোবিজ্ঞানীদের পূর্বসূরিরূপে বন্দিত হয়েছেন, কারণ আমাদের দৈনন্দিন সজ্ঞান জীবনের বাইরে যে আর-একটা স্বতন্ত্র জগৎ আছে যা

আমাদের চেতন মনের অগোচর– এ সত্য শিল্পীরাই প্রথমে উপলব্ধি করেন। পরে মনোবিদ্যায় এই উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রভৃতি মনোবিদের মতে নির্জ্ঞান মনোজগৎ শিল্পের উৎপত্তিস্থল। এই মত অনুসারে শিল্পের সৃষ্টির জন্য যে প্রেরণা– তাকে বলা যায় নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া। বস্তুত মানুষের মন যেন স্মৃতির অতলস্পর্শ সমুদ্রবিশেষ। বহুবিধ অতীত অভিজ্ঞতার ছায়ামূর্তি সেখানে লুকিয়ে থাকে এবং সেগুলো হঠাৎ কোনো কারণে উপরে ভেসে ওঠে শিল্পীর মানসসত্তাকে যখন বিচলিত করে তখনই মনে জাগে সৃজনের আবেগ। কখনও কখনও দেখা যায় ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের কোনো বস্তু– যা শিল্পীর মনে কম্পনের সৃষ্টি করে– সুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়, এবং স্মৃতির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে যেন শিল্পীর শিল্পসৃজনশক্তিও জেগে ওঠে।

প্রায়ই দেখা যায় অনুভূতি ঠিক এককভাবে শিল্পীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায় না। জলে ঢিল পড়লে যেমন আবর্তের পর আবর্ত দেখা দেয় তেমনি বিষয়সঞ্জাত একটি আবেগ থেকে অন্য আবেগের সঞ্চার হয়। এই সমস্ত আবেগ শিল্পের উপাদান, এবং এগুলো অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন এবং বিসদৃশ। নির্বিচারে শিল্পী সবকিছু গ্রহণ করতে পারেন না, পরিবর্জন ও নির্বাচন-ক্রিয়া এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। শিল্পের যা বিষয়বস্তু হতে পারে শুধু তাই বেছে নিয়ে বাকি সব শিল্পী বর্জন করেন। এ কাজে তাঁর সহায় হয় কল্পনা। কল্পনাদৃষ্টিতে তিনি বিষয়টির ভাবঘন রূপ প্রত্যক্ষ করেন, – এবং সে-কারণে তাঁর বাছাইকাজ খুব কষ্টসাধ্য হয় না। কিন্তু শুধু কল্পনার সাহায্যে শিল্পী অভীষ্ট লাভ করতে পারেন না, আংশিকভাবে শিল্পীকে বুদ্ধিবৃত্তিরও আশ্রয় নিতে হয়। তাই এ পর্যায়ের নির্বাচনক্রিয়া অন্তত অংশত যুক্তিনির্ভর সজ্ঞান প্রয়াসের ফল।

BENEDETTO CROCE (১৮৬৬-১৯৫২)-র মতে বহির্বিশ্বের কোনো বস্তু যখন শিল্পীকে বিচলিত করে তখন তাঁর হৃদয়ে কতগুলো সংবেদনের (SENSATION) সঞ্চার হয়। পরে তাঁর মনে জাগে স্বজ্ঞা (INTUITION)। সজ্ঞান স্তরে এসে সেই স্বজ্ঞা শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়– "OBJECTIFIED IN CONSCIOUSNESS." শিল্পী শুধু আবেগটুকু নিয়েই বসে থাকেন না, তিনি এর মননও করেন এবং মননের ফলে ধীরে ধীরে আর-একটা আবেগের উদ্রেক হয় যা প্রাথমিক আবেগের সাথে সম্পর্কিত (KINDRED)।

এই অন্তিম আবেগ থেকে উদ্ভূত হয় একটা নূতন জিনিস যাকে আমরা বলি শিল্প এবং যা একটি ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি হলেও সর্বসাধারণের সামগ্রী। কিন্তু ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি বলেই প্রত্যেক শিল্পকর্মের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন সব সময় জড়িত থাকে। সেই জন্য দেখা যায়, একই বিষয় বিভিন্ন শিল্পীর হাতে পড়ে তাই ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এমনকি একই শিল্পী যদি বিভিন্ন সময়ে একই বস্তুকে শিল্পের বিষয়ীভূত করেন তাহলে সেখানে দেখা যাবে একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই। শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্মের এই নিবিড় সংযোগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু

সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, শিল্পরচয়িতার ব্যক্তিত্বই যদি শিল্পকর্মের যথাসর্বস্ব হত তাহলে তার আবেদন কখনো সর্বজনীন ও সর্বকালীন হতে পারত না। আসলে, শিল্পী যতটা আত্মলীন ঠিক ততটাই নৈর্ব্যক্তিক।

আধুনিক শিল্পবিচারের মূলসূত্র অনুযায়ী শিল্পকর্মে রসসৃষ্টির মূলে থাকে শিল্পীর নিরাসক্ত মনোভাব এবং নাটকীয়তা। শিল্পীর স্থান হওয়া উচিত নেপথ্যে, শিল্পকর্মের মধ্যে নয়। শিল্পকর্মে কী ভাবে নাটকীয় রীতি অনুসারে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা যেতে পারে টি. এস. ইলিয়ট তার একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

The only way of expressing emotion in art is by finding an "objective correlative"; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; and that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.[Selected Essays : Hamlet.]

জীবনে যা ঘটে তা সব সময়েই অপূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী, এবং সেইজন্য সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মায় না। কিন্তু সেইটিই যখন শিল্পে অখণ্ডতা লাভ করে তখন আমরা তার শাশ্বত, সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করি। জীবনের সব কিছুই যেন "কালস্রোতে ভেসে যায়", কিন্তু শিল্প যেন একটা বিশেষ মুহূর্তকে সেই স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাতে নিত্যতা দান করে। প্রেম, মিলন, বিরহ, ঈর্ষা নিয়ে মানুষের মনে কতই ভাঙাগড়া চলে, কিন্তু সবই বুদ্বুদের মতো একবার ভেসে উঠে পরমুহূর্তেই কোথায় মিলিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, এই প্রণয়লীলাই যখন শিল্পে রূপায়িত হয় তখন তা অমরত্ব অর্জন করে। প্রাচীন গ্রীক ভস্মাধারে অঙ্কিত প্রেমিককে উপলক্ষ করে কিট্‌স (১৭৯৫-১৮২১) বলেছেন যে চিরদিনের জন্য সেই প্রেমিক ভালোবাসবে এবং তার প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য কখনও ম্লান হবে না। লৌকিক জগতে ওদের প্রেমাভিনয় যতই স্বল্পায়ু হোক, শিল্পজগতে এর বিনাশ নেই।

শিল্প জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সরাসরি জীবনের আলোকচিত্র নয়। সুপ্রসিদ্ধ "গ্রীক অনুকৃতিবাদ"-এর প্রশ্ন এখানে স্বতই এসে পড়ে। এ তত্ত্বের প্রথম অধিবক্তা প্লেটো অনুকরণ (IMITATION) শব্দটি প্রয়োগ করতে গিয়ে ঠিক আভিধানিক অর্থে "অনুকরণ" শব্দটি ব্যবহার করেননি। তাঁর মতে প্রত্যেক পার্থিব বস্তু প্রতীয়মান সত্যমাত্র– পরম সত্য হচ্ছে বস্তুটির ভাব (IDEA)– যার স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বর। যেমন, প্লেটোর মতে, আদর্শ শয্যা ঈশ্বরের সৃষ্টি, সূত্রধর বা কাঠমিস্ত্রী তার অনুকরণ করে, এবং ঐ অনুকৃত জিনিসের অনুকরণ করেন কোনো শিল্পী। অর্থাৎ প্লেটোর মতে শিল্পকর্মে সত্যের বিকৃতি ঘটে দ্বিতীয় দফায়। ভাববাদী প্লেটোর দেওয়া এহেন যুক্তি অবশ্য কোনো শিল্পী-ই মেনে নেননি। পরবর্তীকালে গ্রীক সমালোচনাসাহিত্যে দেখা যায় "অনুকরণ" (গ্রীক ভাষায় MIMESIS) শব্দটি পরিভাষারূপে গৃহীত হয়েছে।

গ্রীক অনুকৃতিবাদ-এর চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে "প্রতীকতা", যদিও এর তাত্ত্বিক পরিণতি আমরা প্রথম দেখতে পাই উনিশ শতকের শেষে– বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭), মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮), পল ভ্যালেরি (জন্ম ১৮৭১) প্রমুখ ফরাসি কবিদের শিল্পসমালোচনায়। আদিম মানবের অতিকথা (MYTH) ও কিংবদন্তি মুখ্যত প্রতীকধর্মী। এগুলো মানবজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতা তথা সমষ্টিগত চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

কয়েকটি প্রতীকের পৌনঃপুন্য অতিকথার (MYTH) একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মনোবিদ কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১)-এর ভাষায় এগুলো "রূপান্তরের আদিরূপ" (THE ARCHETYPE OF TRANSFORMATION), যার সাহায্যে মানুষ তার দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিস্বরূপকে সমগ্রতা দান করতে পারে। এই রূপান্তর সাধনের একমাত্র উপায় হল বহিঃপ্রকৃতির কোনো বিরাট শক্তিকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির আধার রূপে কল্পনা করা, এবং এর দ্বারা মানুষ যেন আত্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেয়। ঋগ্‌বেদ এবং পৃথিবীর অপরাপর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও কাব্যে এরূপ প্রতীকতার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঋগ্‌বেদ-এ সবিতা, মিত্র এবং বরুণ যথাক্রমে জীবন, আলোক ও নীল আকাশের প্রতীক।

শিল্পীর অন্তরস্থ ভাবধারা কী করে শিল্পভোক্তার মনে প্রবাহিত হয়ে অন্তত সাময়িকভাবে শিল্পী ও শিল্পভোক্তাকে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ করে তা এবার একটু দেখে নেয়া যাক। ভাবের যথাযথ প্রকাশে শিল্পকর্মের চরিতার্থতা, কিন্তু শিল্পকর্ম পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে যখন এর অন্তর্নিহিত ভাবটি শিল্পভোক্তার মনে সঞ্চারিত হয়। শিল্পীর প্রাথমিক প্রেরণা নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, কিন্তু পরে দেখা যায় নিজেকে তিনি নিজের কাছেই শুধুমাত্র প্রকাশ করেন না– অপরের কাছেও করেন। মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির বশেই অপরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। প্রকাশের এই বাসনা জৈববৃত্তিরই একটা বিশেষ অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে-জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়। নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেইরকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে ও কালে। ... মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।"

(রবীন্দ্রনাথ : "সাহিত্য" : সাহিত্যের সামগ্রী)

পূর্বকালে এই অমরতালাভের প্রার্থনা প্রায় একটা প্রথায় পরিণত হয়েছিল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন, গৌরজন "নিরবধি" তাঁর কাব্যমধু পান

করবেন। এখনকার শিল্পী হয়তো এতখানি আশা পোষণ করেন না, তা হলেও তিনি এইটুকু কামনা করেন যে সমসাময়িক সমাজ তাঁকে উপেক্ষা করবেন না। শিল্পকর্ম রচনাকালে অবশ্য শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য থাকে তাঁর ভাবের শিল্পসম্মত প্রকাশের দিকে– তাঁর শিল্পকর্ম শিল্পভোক্তাদের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করবে, তাঁদের চিত্তজয় করতে পারবে কি না– এ-সব চিন্তা সাধারণত শিল্পীর মনের মধ্যে জাগে না। ভাবের প্রকাশের চেয়ে সঞ্চারণের দিকে বেশি মনোযোগ দিলে প্রকাশকার্যই ব্যাহত হতে পারে। একথা সব সময়ই স্মরণীয় যে প্রকাশ ও সঞ্চারণ দুটো পৃথক ক্রিয়া নয়। যা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় তা এমনিতেই সাধারণের চিত্তে সঞ্চারিত হয়। শিল্পরচনার সঙ্গে যে নির্জ্ঞান মন জড়িত থাকে সেই মনের ক্রিয়ায় এবং শিল্পী যখন সজ্ঞানভাবেও শিল্পরচনা করেন তখন সৃজনক্রিয়া তাঁকে এত গভীরভাবে আবিষ্ট রাখে যে শিল্পভোক্তার অস্তিত্বের কথা ভুলে যাওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। যে শিল্পী ভোলেন না তাঁর প্রকাশ ও সঞ্চারণকার্য বিঘ্নিত হয়। শিল্পী সব কিছুই নতুন চোখে দেখেন এবং তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও শিল্পভোক্তাও যেন সেই দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। তখন যা তুচ্ছ ও অর্থহীন– তা-ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং যা তিনি দেখেও দেখেন না তারই মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। রাত্রিতে ঘুম না হলে অনেক সময় পাখির ডাক শোনা যায়। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মতো আমরা কি কল্পনা করতে পারি–

সাগরের ওই পারে– আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিলো;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,–
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে !
("পাখিরা")

কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের চোখের সামনে থেকে যেন একটা কালো পর্দা সরে যায় এবং আমরা এক অদৃষ্টপূর্ব রহস্যলোকের সন্ধান পাই।

শিল্পকর্ম যে এত গভীরভাবে আমাদের অভিভূত করে তার কারণ নিহিত আছে এর বিষয়বস্তুর মধ্যে। কয়েকটি শাশ্বত হৃদয়ভাবই শিল্পের প্রধান উপজীব্য। যুগের পরিবর্তনে সমাজ তথা ব্যক্তিচেতনা অনেকখানি বদলে যায়, ভাববিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু ঐ বিন্যাসটুকু বাদ দিলে সব যুগেই দেখা যায় শিল্পের সার বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রয়েছে। এ দিক থেকে শিল্পী কোনো মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন না, কিন্তু প্রত্যেক চিরন্তন হৃদয়াবেগের বৈচিত্র্য এত অপরিসীম যে চর্বিতচর্বণ পরিহার করে শিল্পী একে সম্পূর্ণ নতুনরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কখনও কখনও মনে হয়

একই সুর বিভিন্ন যুগে ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু ওরই মধ্যে বৈচিত্র্যেরও আভাস পাওয়া যায়।

শিল্পী এবং শিল্পভোক্তা কিন্তু খুব সহজে পরস্পরের সাথে মিলিত হন না। যোগস্থাপনের পথে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়, এবং সেজন্য দায়ী থাকেন উভয়ই। শিল্পভোক্তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর ব্যক্তিগত রুচি। "রুচি" কথাটি সাধারণত দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়– ভালোলাগা-মন্দলাগা এবং বিচারশক্তি। ভালোলাগা কতকটা সহজাত প্রবৃত্তির মতো, এর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি থাকে না। কিন্তু কেন ভালো লাগে অথবা লাগে না– শিল্পভোক্তার মনে যখন এই প্রশ্নের উদয় হয়, তখন বুঝতে হবে তাঁর স্বাভাবিক শিল্পানুরাগ নিয়ে তিনি ঠিক সন্তুষ্ট নন, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তাঁর রুচিকে তিনি যাচাই করে দেখতে চান। এইভাবে রুচি ক্রমশ মার্জিত হয়ে ওঠে। বাল্যকালে আমাদের যা ভালো লাগে পরিণত বয়সে আমরা যে তার প্রতি আকৃষ্ট হই না, তার একটা কারণ এই রুচির বহুল পরিবর্তন। শিক্ষা, যুগবিশেষের চিন্তাধারা, প্রচলিত সমালোচনা-সাহিত্য এবং মহৎ শিল্পকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় শিল্পভোক্তার রুচির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যুগধর্মের প্রভাব কিন্তু সব সময়ে কল্যাণদায়ক হয় না, অবস্থাবিশেষে শিল্পভোক্তাকে বিপথেও চালিত করে। সাহিত্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। আঠারো শতকে শেক্সপিয়র-এর মর্মভেদী ট্রাজেডি "কিং লিয়র" কমেডিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং শ্রোতৃবর্গের প্রশংসাও অর্জন করেছিল ! বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অপূর্ব প্রেরণাদায়ক একটি গান "কূল হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে" – এ গানটিকে অতি সাম্প্রতিক সময়ে একটি কনসার্ট-এ নর্তন-কুর্দন সহযোগে এত বিকৃতভাবে ও ভেঙেচুরে পরিবেশন করা হয়েছে যা যে-কোনো সংবেদনশীল মনকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ গানটির এহেন পরিবেশনাকে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ প্রদান করতে ও প্রশংসায় মুখর হতে শোনা গেছে অনেককেই। সমষ্টিগত রুচি যেখানে এত বিকৃত সেখানে সাধারণ শিল্পভোক্তা খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। মনে রাখা দরকার প্রত্যেক শিল্পী একটা স্বতন্ত্র শিল্পজগতের সৃষ্টি করেন। সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হলে সেই শিল্পীর প্রতি শিল্পভোক্তাকে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। শিল্পভোক্তা যদি ব্যক্তিগত সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়ে শিল্পীর ভাব ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃকপাত না করেন তা হলে রসগ্রহণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে বিশ্বজনীন ভাব উপেক্ষা করে শিল্পী যদি সর্বক্ষণ নিজের ভাবেই বিহ্বল হয়ে থাকেন তা হলে তিনি শিল্পভোক্তার মনের উপর কোনো রেখাপাতই করতে পারবেন না। শিল্পীর ব্যক্তিচেতনা যতই প্রবল হোক, সামাজিক হিসেবে সমাজচেতনার প্রতি তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। ঔদাসীন্য মানে পলায়নী বৃত্তি এবং এটি সুস্থমনের পরিচায়ক নয়। বস্তুত শিল্পীকে বলা যায় সমাজের প্রতিভূ, সমাজের হৃৎস্পন্দন তাঁর শিল্পকর্মে সমধিক স্পষ্ট অনুভূত হয়। তিনি

সমাজের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন আবার সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারও করেন। সর্বসাধারণের বিশৃঙ্খল ভাবগুলো তাঁর শিল্পকর্মে সুসম্বদ্ধ হয় এবং তখন লোকে যেন নিজেদেরই ঠিকমতো চিনতে পারে। প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী অবশ্য শুধুমাত্র সমাজের মুখপাত্র নন। সমাজমনের ভাবগুলো ব্যক্ত করলেই তাঁর কর্তব্য সমাধা হয়ে যায় না। কারণ সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের চিত্তজয়ই শিল্পের স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিল্পীকে সময় তথা কালেরও "হৃদয় হরণ করতে হয়" এবং সে উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে তাঁকে স্বধর্মনিষ্ঠ হতে হবে অর্থাৎ অনায়াসলভ্য খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে শিল্পসত্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। শিল্পীর পক্ষে ব্যক্তিচেতনা অথবা সমাজচেতনা কোনোটিকেই বেশি প্রশ্রয় দেওয়াটা শোভন পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় না। সমাজের সঙ্গে পরিপূর্ণ অসহযোগ এবং পরিপূর্ণ সহযোগ– দুইয়েরই ফল মূলত অভিন্ন। প্রথমক্ষেত্রে ভাবসঞ্চারণের সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষেত্রে যে ভাব সঞ্চারিত করে তার সঙ্গে রসের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

দুই

শিল্প কী এবং শিল্পের লক্ষ্য কী – এ দুটি প্রশ্নই অত্যন্ত পুরনো, এবং প্রথমটির মতো দ্বিতীয় প্রশ্নটিকেও কেন্দ্র করে এত বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যে এখানেও দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পী কোনো পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিল্পরচনা করেন–এ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শিল্পীর সৃজনক্রিয়ার আদি কারণ – আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, অর্থাৎ অনেকটা নিজের গরজেই শিল্পী শিল্পকর্মে ব্রতী হন এবং কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে শিল্পপ্রয়াসকে সার্থক করে তোলা।

সত্যের উজ্জ্বল রশ্মি যখন আবেগের মধ্য দিয়ে শিল্পীর হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত হয় তখনই তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দবোধ শিল্পীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং এর দ্বারা সর্বসাধারণকে উদ্দীপিত করাই তাঁর প্রধান বৃত্তি। বৈজ্ঞানিক সত্যও আমাদের আনন্দ দান করে কিন্তু সে আনন্দ জ্ঞানলব্ধ, এবং সেইজন্য স্বল্পক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানার্জনের মুহূর্তটি খুবই চাঞ্চল্যকর, কিন্তু পরে ঐ বিষয়ে আর কোনো অতিরিক্ত কৌতূহল থাকে না। অপরপক্ষে, শিল্প-উপলব্ধিজনিত আনন্দের ক্ষয় নেই। এর কারণ শিল্পগত ঐক্য– যার উপর শিল্পীর প্রকাশকার্যের সাফল্য নির্ভর করে। শিল্পকর্মের সমগ্র সত্তা এবং এর অংশবিশেষ আমাদের হৃদয়ে একই প্রকার আনন্দের উদ্রেক করে। শিল্পকর্ম উপভোগে আমরা লাভ করি সঙ্গতিবোধের আনন্দ, যা ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত দুর্লভ। বাস্তব জীবনের অসঙ্গতিতেই আমরা অভ্যস্ত, এবং সেইজন্য যখনই আমরা শিল্পকর্মের মধ্যে ঐ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য অনুভব করি, তখনই আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। এই আনন্দের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এর সঙ্গে প্রয়োজনবোধের কোনো সম্পর্ক থাকে না। আমরা যখন কোনো ইপ্সিত বস্তু অর্জন করি অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে যখন

আমাদের কোনো বাসনা চরিতার্থ হয় তখনও আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু সে আনন্দ হয় স্বার্থসিদ্ধির ফল। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনন্দ অপেক্ষাকৃত স্বার্থমুক্ত হতে পারে– যেমন পড়াশোনা অথবা খেলাধুলার ক্ষেত্রে– কিন্তু জ্ঞানান্বেষী, ক্রীড়ামোদী এবং শিল্পরসিক কখনও সমশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। ক্রীড়ানুরাগ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে এর মধ্যে আর যা-ই থাকুক কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতির স্ফুরণ থাকে না। শিল্পসঞ্জাত আবেগ একটা স্বতন্ত্র আবেগ জাগিয়ে দেয়– যার নাম দেয়া যায় নান্দনিক (AESTHETIC) দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমাদের নিঃস্বার্থ আনন্দের উৎপত্তি হয় এবং এরই প্রভাবে আমরা শিল্পীর শিল্পকর্মকে চরম মূল্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না।

শিল্পকর্মের উদ্দেশ্যবিচারে আনন্দতত্ত্ব এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব– দুই-ই সমান গুরুত্বের অধিকারী। শিল্পকর্মের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেই আমরা আনন্দ পাই, সুতরাং আনন্দদান অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি যাকেই আমরা শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য বলি না কেন, তাতে অর্থগত কোনো বিশেষ তারতম্য সূচিত হয় না।

শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু এবং রূপকলার মিলিত সত্তা যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমরা শিল্পকর্মটিকে রসোত্তীর্ণ এবং লাবণ্যময় বলি। বিষয়বস্তুকে মুখ্য করে তোলা হলে শিল্পবহির্ভূত অন্যান্য প্রসঙ্গ– যথা নীতি ও দর্শনতত্ত্ব এসে পড়ে। আবার রূপকলাকে প্রাধান্য দিলে শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়ায় বস্তুনিরপেক্ষ। কিন্তু সর্বপ্রকার শিল্পকর্মে ভাব ও রূপের সম্পর্ক অনেকটা প্রাণ ও দেহের সম্পর্কের মতো। একটিকে বাদ দিলে অন্যটির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ভাব থেকেই রূপের জন্ম, এবং এর বাইরে থেকে আমরা যা দেখি সেটি এ ভাবেরই দেহ।

তিন

মার্কসবাদী সমালোচকেরা বৃহত্তর আঙ্গিকে শিল্পকর্মের এবং সীমিত আঙ্গিকে সাহিত্য বা কাব্যের সামাজিক প্রভাবের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে সাহিত্য শুধু যে যুগধর্মের অভিব্যক্তি তা-ই নয়, এতে শ্রেণীসংগ্রামেরও প্রভাব আছে– যদিও সে প্রভাব সব সময়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিফলিত হয় সমাজমানসে এবং এই মানসদ্বন্দ্ব সাহিত্যসৃষ্টির আদিম প্রেরণা– এটাই মার্কসবাদী সমালোচকদের অভিমত। শিল্পকর্মে সমাজচেতনা বা যুগধর্মের প্রভাব এহেন বিশ্লেষণকর্মের আগেও লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এইটিই সৃজনক্রিয়ার একমাত্র নিয়ামক হতে পারে কি না সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীর কমতি নেই। শিল্পী একটি সমাজের অংশ, অতএব স্ব-সমাজের দাবি তিনি অস্বীকার করতে পারেন না– এটি স্বীকৃত ব্যাপার হলেও যে রীতি অনুসারে শিল্পী সে দাবি পূর্ণ করেন, সেটা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর স্বকীয়তার দ্বারা।

মার্কসবাদীদের দাবি অনুযায়ী শিল্পীর সমাজচেতনার গভীরতা বা অগভীরতাকে তাঁর শিল্পরচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণ হিসেবে মেনে নেয়া হলে বেন জনসন-কে

(১৫৭৩-১৬৩৭) অতি স্বচ্ছন্দে শেক্সপিয়র-এর (১৫৬৪-১৬১৬) উপরে স্থান দিতে হয়। বেন জনসনের বাস্তববোধ ও সমাজচেতনা শেক্সপিয়রের চেয়ে নিঃসন্দেহে গভীরতর ছিল, এবং এটি শুধুমাত্র তাঁর রচিত কমেডিতে নয়, ঐতিহাসিক ট্রাজেডিতেও প্রকট। শেক্সপিয়রও রেনেসাঁস ভাবধারার বাহক ছিলেন এবং এলিজাবেথীয় (১৫৩৩-১৬০৩) যুগের নবজাগ্রত চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তবুও ঠিক সমাজচেতনা বলতে যা বোঝায় সে দিক দিয়ে দেখলে বেন জনসনের নাটককে অধিকতর সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে হয়। অথচ শেক্সপিয়র পৃথিবীর সর্বত্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সহ, প্রবলভাবে পরিচিত আর বেন জনসনের সঙ্গে পরিচিত শুধুমাত্র ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র ও কতিপয় গবেষকমাত্র। শেক্সপিয়র তাঁর লোকোত্তর প্রতিভাবলে সমাজসত্যকে জাগতিক সত্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাটকে এলিজাবেথীয় সমাজমানস বিশ্বমানসে রূপান্তরিত হয়েছিল, তাই তাঁর আবেদন সার্বভৌম।

মার্কসবাদী তথা সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পকর্মের মূল্যবিচার করলে তার বিশ্বজনীন রূপ ও আবেদনটিকে খাটো করা হয়। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম "মেঘদূত" মার্কসবাদী ব্যবচ্ছেদ-এর আওতায় পড়েছে। এই শিল্পকর্মটির মার্কসীয় বিচার কী রকম হতে পারে তার খানিকটা উদাহরণ পাঠকদের দেয়া যেতে পারে। নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর "সাহিত্য-বীক্ষা"-য় "মেঘদূত" প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"গজদন্ত মিনারে বাস করিয়া শ্রেষ্ঠ কবির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় না– সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য। মেঘদূতের কবিও রাজসভার নিত্য-সহচর ছিলেন, আর বিরহী যক্ষের বিরহও স্বেচ্ছাকৃত নিঃসঙ্গতা নহে। আমরা বড় সহজে ভুলিয়া যাই যে তাহার সুদীর্ঘ বিলাপ প্রিয়বিচ্ছেদের প্রকাশ ততটা নয় যতটা স্বাধিকারপ্রমত্ত সামান্য অনবধানের ত্রুটিতে সুখের স্বর্গ অলকা হইতে নির্বাসনের জন্য প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ। প্রভুশক্তিকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা তখন দেখা দেয় নাই, প্রতিবাদ করার সামর্থ্যও তখন জাগে নাই, তাই পরোক্ষ অভিযোগ করিয়াই যক্ষকে ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবুও যে মেঘদূত আজও আমাদের মনকে নাড়া দেয় তাহার কারণ প্রবাসী যক্ষের মতো আমরাও আমাদের কামনার স্বর্গ হইতে বঞ্চিত নিজেদের ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতিতেও ততটা নয় যতটা বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক প্রভুশক্তির প্রবল প্রতাপে। অতীতের ব্যর্থতার সুর বর্তমানের ব্যর্থতার তন্ত্রীতে অনুরণন জাগাইয়া তোলে। রাজসভার আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও জনগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই কালিদাস মহাকবি।"

নীরেন্দ্রনাথ রায় এখানে বিশ্বজনীন ভাব অর্থাৎ বিরহের দিক থেকে "মেঘদূত"-এর বিচার করেননি। তাঁর মতে "বর্তমানের ব্যর্থতা"-র জন্যে এই বিরহকাব্যের সুর আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। নীরেন্দ্রনাথ রায় বর্ণিত "নৈর্ব্যক্তিক প্রভুশক্তি"-র অস্তিত্ব নেই এমন কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো-র আবির্ভাব যদি কোনোকালে সম্ভব হয় এবং সে-রাষ্ট্রকাঠামোতে যদি "বর্তমানের ব্যর্থতা"-র অবসান ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে কি

সেখানকার জনগণের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবে না "মেঘদূত"? এবং তা যদি না পারে তাহলে "রাজসভার আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও জনগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই" কি সেখানকার লোকেরা কালিদাসকে মহাকবি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি থাকবে?

মার্কসবাদীদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণের বিপরীতে "মেঘদূত" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তুলনা করে দেখা যাক; তিনি লিখেছেন :

"কত নববর্ষার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর 'পরে বারিসেচনের সুগন্ধ। কত পর্বত-অরণ্য নদী-নির্ঝর নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘনপুঞ্জ গম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধ সঞ্চার। কবির মনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবের ছায়া সৌন্দর্যের পুলক বেদনার আভাস রাখিয়া গিয়াছে। কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ তো দিনরাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে, এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

একদা কালিদাসের সেই তাঁহার বহুদিনের বহুতর ধ্বনিগুলি একটা সূত্র অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর-একটা ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কী সুন্দর দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উমেদারি করিয়া বেড়াইতেছে। আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার স্তরে স্তরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়া উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অন্যটি এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গিয়াছে।"

বস্তুত উৎকৃষ্ট শিল্প বা সাহিত্য সাধারণ অর্থে নীতিশিক্ষা না দিলেও আমাদের সংবিৎ গভীরভাবে আলোড়িত করে এবং তাতে আমাদের গতানুগতিক জীবনের আংশিক উর্ধ্বায়ন হয়। পি.বি. শেলি-র (১৭৯২-১৮২২) ভাষায়, "নীতির মূলমন্ত্র হচ্ছে প্রেম এবং প্রেমানুভূতির অর্থ আত্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অপরের চিন্তায়, কার্যে ও চরিত্রে যে সৌন্দর্য আছে তার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া।" মনের এই বিপুল প্রসার সর্বতোভাবে কল্পনাসাপেক্ষ। শিল্পকর্ম আমাদের কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃত করে দেয় এবং তারই প্রত্যক্ষ ফল নৈতিক জাগৃতি।

মহৎ শিল্পকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে আমাদের কল্পনানেত্র উন্মীলিত হয় এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ কালপ্রবাহ অতিক্রম করে ক্ষণকালের জন্য হলেও আমরা যেন অনন্তের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কল্পনা করেন সেই "বিশ্বচিত্তলোক"-এর–

যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।

চার

বৃহত্তর পৃথিবীর প্রেক্ষিতে বর্তমানে মানবজাতির মধ্যে যে বিভাজন রয়েছে মোটাদাগে তাকে সাধারণ আয়ের মানুষের শ্রেণী এবং ধনী মানুষের শ্রেণী হিসেবে ধরে নেয়া হয়। অনেকের মনের প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পকর্ম কাদের উদ্দেশ্যে– কোন শ্রেণীটির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম? কোন শ্রেণীটির কাছে শিল্পকর্মের উপযোগিতা বেশি? শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম সৃজনের সময় কোন শ্রেণীটির মনোরঞ্জনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন? এসব প্রশ্নের চিরন্তন এবং সর্বকালীন কোনো জবাব থাকতে পারে না।

অর্থবান হওয়াটা শিল্পকর্ম উপভোগের কোনো মাপকাঠি নয়, আবার সাধারণ আয়ের লোকজন শিল্পকর্ম উপভোগে সক্ষম নয়– তা-ও সর্বাংশে সঠিক নয়। প্রকৃত শিল্পরসিক তা সে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে যে শ্রেণীতেই অবস্থান করুক না কেন, তার লক্ষ্যকৃত শিল্পকর্মটি ঠিকই উপভোগ করে নেয়। প্রয়োজনে শিল্পকর্মের অনুকৃতি উপভোগ করে সে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়। ভারতীয় উপমহাদেশে সবগুলো দেশেই সাধারণ আয়ের মানুষদের বাসগৃহে পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পকর্ম তাজমহলের অনুকৃতি শোভা পায়, পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ আয়ের মানুষদের বাসগৃহে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসার অনুকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ঘর সাজানোর জন্য লোকে তাজমহল কিংবা মোনালিসা-র অনুকৃতি ঘরে রাখে– এ যুক্তি অচল, কেননা ঘর সাজানোর ইচ্ছা থাকলে তাজমহল কিংবা মোনালিসার অনুকৃতির চাইতে আরও অনেক বেশি বর্ণিল ও চাকচিক্যময় অনুকৃতি দিয়ে লোকজন ঘর সাজাতে পারতো। এক্ষেত্রে তাজমহল কিংবা মোনালিসা-র প্রতি লোকের আকর্ষণের বিষয়টিই প্রধান।

একই কথা সংগীতের ক্ষেত্রেও; পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতগুলো শোনার প্রয়োজনে একজন সাধারণ আয়ের সংগীতরসিক ব্যক্তি সবসময় খোঁজ রাখে– কোথায় গেলে সেগুলো কোনো অর্থব্যয় ছাড়াই শোনা যেতে পারে– সঠিক স্থানে সঠিক সময়ে পৌঁছে সে ঠিকই তার শিল্পকর্ম আস্বাদনের প্রয়োজনটি মিটিয়ে নেয়। প্রযুক্তির কল্যাণে বিগত শতাধিক বছর ধরে চলচ্চিত্র উপভোগের ব্যাপারটি সাধারণ আয়ের লোকেদের জন্য খুবই সহজ হয়ে গেছে– আর এখন তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চলচ্চিত্রটিও খুবই সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজ গৃহে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

পিকাসো "গুয়েরনিকা" এঁকেছিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য– নির্দিষ্ট কোনো চিত্রশালা বা যাদুঘরে সেটি আবদ্ধ থাকলে সাধারণ মানুষ তা উপভোগ থেকে বঞ্চিত হবে এটা নিশ্চয়ই সত্য কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর তাবৎ শিল্পকর্ম পৃথিবীর সবার পক্ষে বিনা আয়াসে উপভোগ করা সম্ভব নয়। পিরামিড উপভোগ করতে চাইলে প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করে মিশরে গিয়েই তা করতে হবে। মূল মোনালিসা উপভোগ করতে চাইলে প্যারিসে ল্যুভর পর্যন্ত যেতেই হবে।

অতএব, শিল্পকর্ম আস্বাদনের ক্ষেত্রে অর্থ থাকা-না-থাকা কোনো নিয়ামক ব্যাপার নয়– এটা যেমন সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি রুচিবিহীন ধনবান শিল্পকর্মের

রসিক হিসেবে নিজেকে জাহির করতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত না হওয়ায় তার শ্রেণীটিই শিল্পকর্মের যথার্থ ভোক্তা– এ ধারণাও সঠিক হতে পারে না।

শিল্পী বহু বিচিত্র ধরনের হতে পারেন, শিল্পকর্ম উপভোগে আগ্রহীদের ধরন তার চাইতেও বিচিত্র। বিসমিল্লাহ্ খাঁ তাঁর সানাই বাজিয়েছেন বিশ্বচরাচরের উদ্দেশ্যে, তাঁর সামনে উপস্থিত কোনো শ্রোতা বা মাইক্রোফোন না থাকলেও তিনি বাজিয়ে গেছেন আপন মনের আকুতিতে– মাইকেল জ্যাকসন কিংবা ম্যাডোনার গান গাওয়ার উদ্দেশ্য মোটেও বিসমিল্লাহ্ খাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলবে না, তবুও তাঁরা সবাই শিল্পী। ভ্যাটিকানের সিস্টিন চ্যাপেলে মাইকেলএঞ্জেলো ছবি এঁকেছিলেন তাঁকে অর্থ প্রদান করা হবে এহেন প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আবার ভ্যান গগ্ "সানফ্লাওয়ার" এঁকেছিলেন মনের উদগ্র তাড়নায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে বিপুল সাহিত্যকর্ম রচনা করেননি কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামকে নিতান্তই পেট চালানোর দায়ে অসংখ্য গান লিখতে হয়েছে। উল্লিখিত সবগুলো ক্ষেত্রেই সব শিল্পীরাই মহৎ শিল্পকর্ম সৃজন করেছেন– উদ্দেশ্য এখানে মোটেও তাঁদের শিল্পীসত্তাকে ছাপিয়ে ওঠেনি কিংবা খাটো করেনি।

শিল্পকর্ম উপভোগকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পথচলতি কোনো ব্যক্তি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্ধ ভিক্ষুকের গান শুনছেন, কেউ হয়তো বেতার কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার খানিকটার আবৃত্তি শুনতে পেয়ে ভালো লেগে যাওয়ায় লাইব্রেরিতে বা কোনো বন্ধুর বাসায় গিয়ে সেই কবিতাটি খুঁজে বের করে সেটি মনেপ্রাণে উপভোগে সচেষ্ট হয়েছেন আবার অন্য কোনো ব্যক্তি হয়তো সমঝদারদের কাছে শুনেছেন যে বিটোফেন রচিত সংগীত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতরস তাই তিনি যেভাবেই হোক বিটোফেনের সংগীত সংগ্রহ করে সেটা উপভোগ করে যথার্থ আনন্দ পেয়েছেন। তিনটি ক্ষেত্রেই শিল্পভোক্তা শিল্প উপভোগ করছেন এবং তাঁদের কারোরই আগ্রহে লোকদেখানো কোনো ব্যাপার নেই– নিতান্তই প্রাণের টানে তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব প্রয়োজন মিটিয়ে নিচ্ছেন।

শিল্প কার জন্য– এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় শিল্প বিশ্বজনীন– সবার জন্যে; কে উপভোগ করতে চান আর কে উপভোগে আগ্রহী নন শুধুমাত্র এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে অন্যকিছুই এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। শিল্প উপভোগে আগ্রহী ব্যক্তি হতে পারেন মার্কসবাদী অথবা পুঁজিবাদী, হতে পারেন ধনী কিংবা সাধারণ আয়ের মানুষ, হতে পারেন আস্তিক বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, হতে পারেন যুবক বা বৃদ্ধ, হতে পারেন শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ, হতে পারেন সম্রাট বা সাধারণ কোনো মানুষ, হতে পারেন আইনস্টাইন বা কোনো চটকলের শ্রমিক। শিল্প সবার জন্য– এ ক্ষেত্রে বিভাজন কাম্য তো নয়-ই এমনকি বিভাজনের কথা চিন্তা করাও অপরাধ।

প্রসঙ্গ শিল্পদর্শন

শা হ্ আ ল ম সা রো য়া র

শিল্পের দর্শন নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের আসলে বুঝতে হবে দর্শন বলতে আমরা কী বুঝব; তাত্ত্বিকভাবে দর্শনের সংজ্ঞা হয়তো নানা দার্শনিক নানাভাবে দিয়েছেন কিন্তু প্রায়োগিকভাবে দর্শন বলতে বোঝায়, যাপিত জীবনে আমরা যে কর্মকাণ্ডগুলো করে থাকি যেমন আমরা অফিসে যাই, কৃষিকাজ করি, সমাজ বদলের চেষ্টা করি, রাজনীতি করি ইত্যাদি– এসব কাজের প্রত্যেকটির ভেতরে এক-একটা চিন্তা রয়েছে এবং এ সকল চিন্তার মূল (মাদার) চিন্তাই হচ্ছে দর্শন। মানুষ সারাদিন কাজ করে, এমনকি জীবনভর কাজ করে– এই দীর্ঘমেয়াদি কাজের মধ্য দিয়ে ঐ কাজের ভেরতকার চিন্তাগুলোর যে সূত্র তৈরি হয়, চিন্তার সেই যোগসূত্রটাই হল ঐ ব্যক্তির দর্শন। এখন দেখা যাক শিল্পটা কী; শিল্পের প্রধান বিষয় হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা; এই সৃষ্টিশীলতার অনেকটা করে সে আবেগ দিয়ে; অনেকটা করে তার একটা তৃতীয় শক্তি থাকে সেটা দিয়ে এবং বাকিটা করে সে ঐ শিল্প কেন্দ্রিক কিছু দক্ষতা দিয়ে। যেমন একটি চিত্রশিল্প কিংবা পেইটিং করার জন্য একজনের হয়তো ভালোবাসা আছে, আবেগ আছে, হয়তো সৃষ্টিশীলতাও আছে কিন্তু তার হয়তো ঐ চিত্রশিল্প করার জন্য যে দক্ষতা দরকার সেটা নেই। তাহলে সে কিন্তু চিত্রশিল্পটা করতে পারবে না। একজন শিল্পীর ঐ তিনটি জিনিসই প্রধান। শিল্প সৃষ্টির আগে বা প্রাক্কালে শিল্পী কোনো দর্শন বা তত্ত্ব মাথায় রেখে শিল্প সৃষ্টি করেন না; তবে ঐ শিল্পী যে সমাজে বাস করেন, যে রাষ্ট্রে বাস করেন বা যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করেন সেখানকার নানা সমস্যা নানা সুখ-দুঃখ হয়তো অবচেতনে শিল্পীর মনোজগতের ভেতর দিয়ে ঐ শিল্পের মধ্যে এসে যায়; তাহলে দেখা যাচ্ছে শিল্পের দর্শন নিয়ে শিল্প সৃষ্টির আগে বা প্রাক্কালে অতটা ভাবা হয় না বরং শিল্প সৃষ্টির পরে ঐ শিল্পের দর্শন কী সেটা অনেকটা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। তখনই আসলে বোঝা সম্ভব হয় যে আসলে ঐ শিল্পের দর্শন কোন পর্যায়ে আছে বা কোন দিকে অবস্থান নিচ্ছে। একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, শিল্পের দর্শন নিয়ে শিল্পী নিজে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন না, এটা করেন যারা শিল্পের রস আস্বাদন করেন তারা বা যারা শিল্পের সমালোচনা করেন তারা।

শিল্পের মধ্যে সচেতনভাবে দর্শনকে অবস্থান দেয়া শিল্পীর জন্যে অনেকটাই কষ্টকর ব্যাপার; আর কষ্টকল্পিতভাবে কোনো কিছু করা হলে সেখানে শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত

ব্যঞ্জনা ব্যাহত হয়। তবে হ্যাঁ, দর্শন আগে ঠিক করে সফল শিল্প সৃষ্টি যে হয়নি এমন নয়, পৃথিবীতে এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে পরিকল্পিতভাবে দার্শনিক মতাদর্শকে শিল্পে অবস্থান দেয়া হয়েছে এবং সেইসব শিল্পকর্ম কোনোভাবেই শিল্পগুণের দিক থেকে পিছিয়ে পড়েনি। কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে পর্যায়ে দেখি বা পিকাসোকে আমরা যে পর্যায়ে দেখি তাদের ভেতরে কিন্তু তাদের পরিপার্শ্ব বা সেই সমাজের একটা তাত্ত্বিক বীক্ষণ তাদের মধ্যে ছিল। সেই বীক্ষণের সঙ্গে তাদের যে শিল্প সৃষ্টি করার একটা প্রচণ্ড ক্ষমতা– এ দুটি বিষয়কে তারা মেলাতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের কথাই যদি ধরি– এটার মধ্যে কতটুকু শিল্প, কতটুকু তত্ত্ব– এটা নিয়েই কিন্তু একটা বড় বিতর্ক হতে পারে। তখনকার ঔপনিবেশিক সমাজে ও বাঙালি সমাজে যে দ্বন্দ্বগুলো ছিল, সেটা গোরাতে কিন্তু শিল্পিত আকারে এসেছে, সেখানে বিষয়গুলো নিরস লেকচার হিসেবে আসেনি। এই গোরার মধ্যে যে তত্ত্ব ও শিল্পগুণ আছে– এ দুটি বিষয়কে মেলানোর যে ক্ষমতা তা কম শিল্পীরই থাকে।

একটি সমাজে যে অবিচার, অনাচার, অন্যায় ও নৈতিকতা-বিবর্জিত কাজগুলো চলতে থাকে, সেই সমাজে বসবাসকারী শিল্পী এ বিষয়গুলোকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেগুলো বুঝতে পারেন। কাজেই সেই শিল্পীর মধ্য দিয়ে তার শিল্পকর্মে এগুলো প্রকাশিত হয়; কখনো কখনো কোনো কোনো শিল্পীর কোনো কোনো শিল্পকর্মের মধ্যে এসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে চিন্তাও প্রচণ্ড মাত্রায় উঠে আসে। এটা কিন্তু আসবেই।

একই সমাজে একাধিক শিল্পী বসবাস করতে পারেন; সেই সমাজে যদি পাঁচজন শিল্পী থাকেন, তাদের মধ্যে হয়তো দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনই সমাজের অবক্ষয়ের বিষয়টি ধরতে পারলেন না, কিন্তু হয়তো একজন বিষয়টি স্পর্শ করতে পারলেন। এটা হয়ে থাকে। ঐ সমাজের পাঁচজন শিল্পীই যদি অন্যায় অবিচার বা অনৈতিক কাজের বিরোধিতাটাকেই মুখ্য করে শিল্প সৃষ্টি করতে বসেন তাহলেই কি উৎকৃষ্ট বা সফল শিল্প সৃষ্টি হয়ে যাবে? সেটা কখনই হয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত একজন মানুষ কিন্তু সার্বক্ষণিক ভালো বা সার্বক্ষণিক মন্দ নয়; কাজেই একটি জনগোষ্ঠী বা একটি সমাজও সার্বক্ষণিক ভালো বা মন্দ হতে পারে না। আবার একই সমাজের ভেতরে ভালো বা মন্দ উভয় মানুষই বাস করে। তাহলে সকল শিল্পকর্ম শুধু যে মন্দের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েই সৃষ্টি হবে সেটা না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের মধ্যে এই বিষয়টি ছাড়া অন্য আরো অনেক বিষয় বিদ্যমান থাকে; সেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোও শিল্পের কাজ। একজন ব্যক্তি যখন একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি, প্রকৃতির কাছাকাছি একজন একান্ত মানুষ, সাগরের পাড়ে যখন নিতান্তই একা তখন কিন্তু সামাজিক এই অন্যায়-অবিচারকে ছাড়িয়ে ভিন্ন এক জগতের সে বাসিন্দা হয়ে যায়– সেই জগতের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

অন্যদিক থেকে যারা শিল্পের সমঝদার বা ভোক্তা কিংবা যারা সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের দৃষ্টিতে মনে হতে পারে শিল্পী সমাজচ্যুত মানুষ কিংবা একজন শিল্পী সমাজের দশজন থেকে আলাদা মানুষ; কিন্তু আসলে তা নয়। একজন শিল্পী আর দশজনের মতোই তার নিজের পছন্দ অনুসারে জীবন যাপন করেন। এই নিজের মতো জীবন যাপন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে একজন শিল্পীর পছন্দ-অপছন্দের পার্থক্য ঘটে যায়। শিল্পী তার নিজের জগৎ নিয়ে কখনও কখনও এতটাই মগ্ন ও ব্যস্ত থাকেন যে, সামাজিক প্রয়োজনের অনেক কিছুই হয়তো তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দেয় না। যে কারণে বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে যে, একজন শিল্পী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে একজন শিল্পী আর দশজনের মতোই সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এরকম একটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষদের ভেতর থেকেও সবাই যে একজন শিল্পীকে সমানভাবে বিবেচনা করে তা কিন্তু নয়। সমাজের কারো কারো কাছে একজন চিত্রশিল্পী কিংবা একজন কবি বিরক্তিকর মানুষ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু সমাজের ঐ ধরনের লোকগুলোর কাছে হয়তো খেলাধুলা পছন্দের বিষয় কিংবা তাদের কাছে হয়তো ধর্মের আচার পালন করা অনেক বেশি গুরুত্বের। আবার একই সমাজের কিছু লোকের কাছে হয়তো ঐ চিত্রশিল্পী বা কবি অতটা অপছন্দের নয়। আবার সেই সমাজেই এমন লোক রয়েছে যাদের কাছে ঐ চিত্রশিল্পী ও কবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধার ব্যক্তি। কাজেই একটি সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পছন্দের পার্থক্য থাকবেই। পছন্দের এই পার্থক্যের কারণে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে এরা একে অপরের থেকে খুব বেশি আলাদা কিছু। কেননা এদের মধ্যকার পছন্দের অমিলের চেয়ে মিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সে অর্থে একজন শিল্পীর জীবন, শিল্প-সমঝদারের জীবন এবং শিল্প যার পছন্দ নয় তার জীবন একই সূত্রে গাঁথা।

কিন্তু ধরা যাক, সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অন্যান্য বিষয়কে যেভাবে বোঝার চেষ্টা করেন, রাজনীতিকে তারা একই সাধারণ চিন্তা দিয়ে বুঝে থাকেন। সেখানে একজন শিল্পীর কাছে সমাজের যে কোনো বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। সাধারণ মানুষ আর শিল্পীর মধ্যে এই একটি দিক থেকে হয়তো কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। শিল্পীর সেই সূক্ষ্ম ও বিশেষ অনুভূতির জায়গাকে আবার অনেকে মোটা দাগের রাজনৈতিক চিন্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন। পৃথিবীর রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হল, চীনের সমাজতন্ত্রও শেষ হয়ে গেল, অথচ রাজনৈতিক এ ধরনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কিন্তু জোর আরোপ বা বল প্রয়োগ করতে হয়েছিল। অনেক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, অনেক মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল। একসময় যে ব্যক্তির হয়তো মনে হত পৃথিবীটার একটা মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব কিন্তু আজকের সেই একই ব্যক্তি হয়তো মনে করে মৌলিকভাবে কোনো পরিবর্তন

আনা আসলে সম্ভব নয়; কেননা জোর আরোপ বা বল প্রয়োগ করে সাময়িকভাবে পরিবর্তন আনা সম্ভব হতে পারে কিন্তু সেই পরিবর্তনকে স্থায়িত্ব দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই আর্ট বা শিল্প কোন্ ধরনের রাজনৈতিক দর্শনকে প্রকাশ করবে সেটা কিন্তু শিল্পীর চিন্তার পরিপক্কতার ওপর নির্ভরশীল।

যেমন বিমূর্ত শিল্পের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ মনে করেন, এটা হল অর্থের বিনিময়ে যখন শিল্পকর্ম করা হত তখন ঐ শিল্পকর্মের মধ্যে ক্ষমতাবান ও অর্থবানদের যে বিরোধিতা ছিল সেটাকে আড়াল করার জন্যই এই 'বিমূর্ততা' শিল্পে ঢুকে পড়ে; কিন্তু আমি এ ধরনের পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করি না। কোনোভাবেই সেটা নয়, বরং একটি মূর্ত শিল্প এক ধরনের রুচির মানুষের সাথে সংযোগ ঘটাতে পারে অথচ বিমূর্ত শিল্প একইসাথে একাধিক রুচির মানুষের সাথে সংযোগ ঘটাতে পারে। সে কারণেই শিল্পে বিমূর্ততা এসেছে। আমি মনে করি, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর যোগাযোগগুলো ঘটে ভাষাহীনভাবে। বিমূর্ত শিল্পের ভাষাহীনতা বহুভাষার জন্ম দেয়। ফলে বিমূর্ততা একই সাথে অনেক মানুষের সঙ্গে শ্রেষ্ঠতর যোগাযোগগুলো ঘটাতে পারে।

তাছাড়া মানুষের মন পুরোপুরি ভাষানির্ভর নয়। কেননা মানুষ যখন কথা বলে তখন তার মনের সবটা বলে না, আংশিক মাত্র বলতে পারে। মানুষ যা বলতে পারে, তার মনের মধ্যে এর অধিকাংশই না-বলা থেকে যায়। ঐ না-বলা মনোজগতের সঙ্গেও বিমূর্ত শিল্প সহজে সংযোগ ঘটাতে পারে।

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, শিল্পে 'আমাদের শিল্প', ' তোমাদের শিল্প' এ-রকম একটি ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু শিল্পে 'আমাদের শিল্প', 'তোমাদের শিল্প' বিষয়গুলো কিন্তু কখনোই স্থায়িত্ব পায় নি। কেননা আজকে যেটাকে ' আমাদের' মনে হচ্ছে, আগামীতে সেটাই সকলের হয়ে যেতে পারে। আবার যেটাকে অন্যের শিল্প মনে হচ্ছে সেটা এক সময় আমাদেরও হয়ে যেতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা যেরকম উন্নতি লাভ করেছে, এতে করে অতি দ্রুত এক অঞ্চলের শিল্প অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে পড়ছে। শিল্পকে 'আমাদের', 'তোমাদের' এমন করে হয়তো ভাববার সুযোগ অতটা জোরালো জায়গায় আর থাকছে না। এভাবে একটা সময়ে গোটা পৃথিবীর সংস্কৃতিই হয়তো একটি কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে।

শিল্পের দর্শন: জীবনের সত্যানুভূতি

মজিদ মাহমুদ

শিল্প ও দর্শনকে আলাদা করে দেখার সমস্যা অনেক; আবার শিল্প ও দর্শনকে এক করে দেখার অসুবিধা কম নয়। শিল্প এবং দর্শনের মতো জটিল ও আপেক্ষিক শব্দ দুটি যখন পরস্পর গভীর অন্বয় সৃষ্টি করে, তখন তা সহজ করে প্রকাশের সাধ্য সবার থাকে না। কারণ দর্শন ও শিল্পের বিরোধ বেশ পুরনো। এমনকি সে-ই প্লেটোর আমলেও এই বিরোধ ছিল। প্লেটো কবিদের খারিজ পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন এই অভিযোগে যে, কবিদের কোনো দর্শন নেই। কবি অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছুর খুব একটা ধার ধারেন না। কবি নিজের মতো করে একটি জগৎ নির্মাণ করেন। যে জগৎ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে খাপ খায় না। প্লেটো যে দার্শনিক-শাসিত রাষ্ট্রের চিন্তা করতেন, কবিদের সেখানে স্থান ছিল না। কবিদের ব্যাপারে তিনি চমকপ্রদ সব কথা বলেছেন। কবিদের ফুল-চন্দন দিয়ে অন্যরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছেন। প্লেটো মনে করতেন, কবিরা যুক্তি মেনে কথা বলতে পারেন না, কবিরা অংক বোঝেন না, কবিরা কেবল কল্পনার জগৎ তৈরি করেন। প্লেটোর অকাট্য যুক্তিকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? আবার প্লেটোকে মেনে নিলে হোমারকে তো ছেড়ে দিতে হয়। কারণ দার্শনিক রাষ্ট্রে হোমারের জায়গা কোথায়? তাহলে হোমারের জগতে, সফোক্লিসের জগতে কি কোনো দর্শন ছিল না? ইলিয়াড-ওডিসির যুদ্ধেরও তো একটা নীতি ছিল। আর নীতি মানেই তো দর্শন। বীর কখনো যুদ্ধের রীতি লঙ্ঘন করে না। কেন করে না? হয়তো মানবসমাজে গড়ে-ওঠা কোনো মহত্তমবোধ তাকে মানুষের জন্য বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়। পক্ষান্তরে যে যুদ্ধের রীতি ভঙ্গ করে, তাকে কেউ বীর বলে সম্মান জানায় না।

সংস্কৃত-সাহিত্যে তো সেই রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী; সেখানে যুদ্ধকে আখ্যা দেয়া হয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ বলে। যুদ্ধকে বলা হয়েছে কর্মযোগ। যেমন বুশ সাহেব আজ এক ধরনের নিজস্ব ন্যায়ের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। বুশের পক্ষে যারা আছেন, তারা সবাই সেই শয়তানির ন্যায়যুদ্ধে রত! রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পারস্যভ্রমণে' মহাভারতের যুদ্ধকে হত্যার দর্শন বলে অভিহিত করেছেন। প্লেটোর দর্শনচর্চার মধ্যে কি শিল্প ছিল? আবার হোমার কিংবা সফোক্লিসের শিল্পচর্চার মধ্যে কি দর্শন ছিল? এ ধরনের আলোচনা একটি অমীমাংসিত গ্যাঁড়াকল সৃষ্টিতে সহায়ক হতে

পারে। তবে দার্শনিক শিল্পকে কী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন তার চেয়ে শিল্পী কিভাবে দর্শনকে ব্যবহার করেছেন সেটা অধিক বিবেচ্য। যেমন সফোক্লিস 'ইডিপাস রেক্স' রচনার মাধ্যমে এক ধরনের আনন্দ সৃষ্টি করতে চান, সে আনন্দটি বেশি মাত্রায় ভয়াবহ তো বটেই। কিন্তু ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত অসহায় মানুষকে তিনি এরচেয়ে আর কি করুণভাবে অঙ্কন করতে পারতেন? এই ট্র্যাজিক করুণরস সৃষ্টিই কি তাঁর এই রচনার মূল প্রতিপাদ্য? এর মধ্যে কি গভীর সত্য লুকায়িত ছিল? অনেকেই বলে থাকেন, সফোক্লিস তাঁর সত্তরোর্ধ বয়সে ছেলেদের অসহযোগিতার শিকার হয়েছিলেন। তাহলে ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে তাঁর এই রচনা? আর যা ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে উদ্ভূত তা মানুষের জন্য কোনো মহৎ বাণী বয়ে আনতে পারে না। জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'কেহ যাহা জানে নাই/ কোনো এক বাণী? আমি বহে আনি।' এ কি কবির অহংকার? আর অহংকার তো তার নিজের মধ্যে মানবসমাজকে আত্তীকরণ করতে পারে না। এটা তো সত্য, মানুষের অসহায়ত্ব, মানুষের মৃত্যুময় জীবন, মানুষের অজানা ভবিষ্যৎ তাকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারও তো একটি দর্শন আছে।

আসলে ভোক্তাকে আনন্দ দান শিল্পের মূল উদ্দেশ্য নয়। শিল্পীর জীবনোপলব্ধি না থাকলে, গভীর কোনো বক্তব্য না থাকলে তা দাঁড়ায় না। আর জীবনে গভীর বিষয় ও বস্তুর মুখোমুখি হওয়া ছাড়া প্রকৃত আনন্দ কিসেই বা পাওয়া যায়? কিন্তু কী সেই দর্শন? কোথা থেকে আসে সেই দর্শন? শরীর ছাড়া কি উপলব্ধির আর কোনো উৎস আছে? পৃথিবী থাকা-না-থাকা; স্রষ্টার থাকা-না-থাকা– এসবই কি নির্ভর করে না আমার অস্তিত্বের উপস্থিতির ওপর? অস্তিত্বের সরব ও সামঞ্জস্যময় উপস্থিতিই কি শ্রেষ্ঠ দর্শন নয়? রবীন্দ্রনাথ কি এ কথাই বলতে চেয়েছেন, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ।' জ্যাঁ পল সার্ত্র তো অস্তিত্বের কথাটিই সারা জীবন ধরে বলতে চেয়েছেন। তিনি শিল্পমাধ্যমকে দর্শন প্রকাশের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আলবেয়ার ক্যামু'র বহিরাগত নায়কেরই বা কী এমন দর্শন ছিল? শিশ্নোদরপরায়ণ এই নায়ককে ক্যামু যিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যিশু যে সত্যোপলব্ধির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁর নায়কও নাকি সেই সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। এখানে সত্যের রকম আলাদা হতে পারে। আসলে সত্য একটি বিশ্বাসও বটে। দর্শনও তাই।

যদিও এ কথা সত্য, শিল্পের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরি প্রায় অসম্ভব। কী শিল্প নয় তা বলা যত সহজ, শিল্প কী তা বলা তত সহজ নয়। এই অনির্ণয়ের বোধ থেকেই প্লেটো শিল্প-সৌন্দর্যকে স্বর্গীয় বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অবশ্য প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টোটল তাঁর গুরুর স্বর্গীয় আনন্দের ব্যাখ্যাকে তেমন আমলে আনেননি, একটি যৌক্তিক পারম্পর্যের ওপরে শিল্পসৃষ্টিকে তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, আনন্দের অনুভূতি শরীরে না মনে? শরীর ছাড়া মনের কল্পনা কেবল যাদের মন নেই তারাই করতে পারে। মন কেন– শরীর না থাকলে মাথা থাকারও তো সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সৌন্দর্য' শীর্ষক সংলাপে বলছেন, 'আদিত্য।

সাহিত্য জিনিসটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না রচনার উপরে? লক্ষ্যের উপরে না লক্ষণের উপরে? নগেন্দ্র । তুমি তো এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পার মানুষ বাম পায়ের উপর বেশি নির্ভর করে না ডান পায়ের উপর?

আদিত্য । মানুষ দুই পায়ের উপর সমান নির্ভর করে এ যেমন স্পষ্ট অনুভবগোচর, সাহিত্য তার বিষয় এবং তার রচনাপ্রণালীর উপর সমান নির্ভর করে সেটা তেমন নিশ্চয় বোধগম্য নয় এবং এই কারণে সাহিত্যে আজকাল কেহ-বা নীতিকে প্রাধান্য দেন, কেহ-বা সৌন্দর্যকে, কেহ-বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচারকে ।' রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সাপেক্ষে দর্শনকে আমরা বিষয়ের কাছে নিয়ে আসতে পারি । বিষয়কে যে কারণে স্থাপিত করা হয় তার গভীরে দর্শন লুকিয়ে থাকে । সেভাবে বললে বলা যায়, দর্শনের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিল তো আরো বেশি । দর্শন তো দৃষ্টিভঙ্গি । যা না থাকলে শিল্পসৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? শিল্প তো নিজে নিজে সৃষ্টি হয় না । তাহলে কিসে হয়?

মনুষ্যত্বের নামই আসলে দর্শন । মানুষ হলেই তো মনুষ্যত্ব থাকে না । মনুষ্যত্ব কিছু কিছু মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয় । যারা মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করতে পারে তাদের আমরা শিল্পী বলি, তাদের আমরা দার্শনিক বলি । আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা সেই শিল্পকে সেই দর্শনকে অবলম্বন করি । বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো কবিতাশিল্পে কী ধরনের দর্শন চর্চা করেছেন? তাঁদের কবিতা কি আমাদের আনন্দ দেয় না? শিল্প নিঃসন্দেহে একচ্ছত্র দর্শন নয় । দর্শনগ্রন্থ পাঠ করে কেউ শিল্পচর্চা করতে আসেন না । কিন্তু শিল্পের ভেতরে যে রাজনীতি থাকে, সেই রাজনৈতিক দর্শন নিশ্চয়ই সকল শিল্পের মধ্যে এক ধরনের নেই । কাজেই আমাদের রাজনৈতিক দর্শন কোন ধরনের শিল্পের মধ্যে আছে সেটা আজ পরিষ্কার হওয়া জরুরি । তবে আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যায় না, এমন শিল্পও পরিত্যাজ্য নয়, কেননা শরীরে আত্মা নেই যেমন বলা যায় না; আবার আত্মা আছে তা প্রমাণ করা যায় না; আবার এ প্রশ্নও করা যায়, আত্মা আর সত্তা কি এক? বিশ্বাসীর কাছে আত্মা হয়তো চিরন্তন, অবিনাশী; শরীর না থাকলে হয়তো আত্মা থাকে; কিন্তু সত্তা থাকা তো সম্ভব নয়; সত্তা হল, আলাদা অস্তিত্ব, আলাদা পরিচয়; শিল্প হল সত্তা, দর্শন হল আত্মা । 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই প্রকল্পকেও আমরা সব সময় ভুল ব্যাখ্যা করেছি । অথবা সন্দেহের চোখে দেখেছি । আসলে আমরা বলতে চেয়েছি, শিল্পকে আগে শিল্প হতে হবে । শিল্প তো কায়া । যার কায়া নেই তার ছায়া নিয়ে আলোচনা বাতুলতা । ভারতচন্দ্র যেমন বলেছিলেন, 'প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে? যে হৌক সে হৌক ভাষাকাব্য রস রয়ে ।' কিন্তু যখনই শিল্পের ওপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তখনই কুতর্ক করা হয়েছে বেশি । বলা হয়েছে, নীতিহীনতা, অশ্লীলতা শিল্প হয়ে উঠবে কিনা? কিন্তু এর কি একটিও প্রমাণ আছে, কেবল অশ্লীল এবং নীতিহীন কোনো রচনা শিল্প হয়ে উঠেছে । কেউ অবশ্য বলতে পারেন, তাহলে নভোকভের 'ললিতা'? কিন্তু আপাত-অশ্লীলতার গভীরে তো 'ললিতা'য় গভীর বাস্তবতা

ও দর্শনভিত্তি রয়েছে। দস্তয়ভস্কি, তলস্তয়, গোর্কি, চেখভের রচনায় তো শিল্প আর দর্শন প্রায় এক অর্থেই হাজির হয়।

শিল্পের ভাষা দর্শনের বিষয় দেশকালে সর্বত্র এক– এ আমি মানতে রাজি নই। এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি হলে কার তাতে বাধ সাধার আছে? কলম্বাসের আমেরিকা গমন ইউরোপীয়দের জন্য বর হলেও ইন্ডিয়ানদের জন্য ছিল অভিশাপ। দু'জাতির ভাষা এক হলেও শিল্প কী করে এক হয়; দর্শন এক হবে তা কে বলেছে? আধুনিক পৃথিবীকে যারা এক দর্শন এক শিল্পের নিগড়ে দাঁড় করাতে চায় আমরা তাদের সঙ্গে নেই। বিজেতা আর পরাজিতের চেতনা এক সূত্রে গাঁথা না-ও হতে পারে। বামের সঙ্গে ডান, ডানের সঙ্গে বাম না-ও মিলতে পারে। কিন্তু আমরা বাম হস্তকে কর্তন করে দক্ষিণ হস্তকে পরিপুষ্টি করতে পারি না। আমরা রসাল বৃক্ষে কাঁঠাল ফলাতে চাই না। আমাদের শিল্পের দর্শন হোক সত্যানুভূতি; আমাদের সত্যানুভূতি হোক পরম সুন্দর; পরম সুন্দর হোক নির্লোভ–বৈশ্বিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধানের ভিত্তিতে রচিত।

শিল্পের লক্ষ্য: একটি দার্শনিক বিতর্ক

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার

মানুষ যেদিন ক্ষুদ্র গুহা-বাস থেকে মুক্তি পেয়ে অসীম আলোকাভিসারী হয়েছে, সেদিনই শুরু হয়েছে তার সূক্ষ্ম নান্দনিক ভাবনার হামাগুড়ি। শিল্প তথা সৌন্দর্যভাবনা হল মানুষের পরিশীলিত চেতনার সেই নান্দনিক অর্চন। মানুষ যতই নিজের জীববৃত্তির ক্ষুদ্র চৌহদ্দি পরিত্যাগ করে বিশ্বাভিমুখী হয়েছে, ততোই তার চৈতন্য বিকশিত হয়েছে। কেননা মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে, এমনকি স্বজাতি থেকেও নিজে ভিন্ন রকম হতে চেয়েছে। ভিন্নতাটা শুধু ধনে-ঐশ্বর্যে নয়, অতি পরিমার্জিত আর উচ্চমার্গিক নান্দনিক বোধেও। এজন্য শিল্প-চেতনা মানবজীবনের একান্ত সার্থকতার অতি সুসভ্য প্রদেশ; পরিশীলিত ও সংবেদনশীল মনের একান্ত সূক্ষ্ম নির্মাণ। কিন্তু প্রশ্নটা সেই

পুরনো। শিল্পের জন্য শিল্প নাকি শিল্পের একটা বিরাট সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। মানুষের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে ভাববাদ আর বস্তুবাদের যে হার-না-মানা পুরনো গণ্ডগোল আছে, শিল্প-ভুবনেও এ বিতর্ক তেমনি অমীমাংসিত। সুতরাং এর একটা যুতসই সুরাহা সহজ কাজ নয়। তবে এ ব্যাপারে আমরা স্ব স্ব পক্ষের যুক্তিগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এর মধ্যে কোনটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে সে দায়িত্ব হয়তো পাঠককেই নিতে হবে। বিষয়বস্তুর ওপর অগভীর ধারণার জন্য শিল্পদর্শনের সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কিয়দংশের মধ্যেই হয়তো আমাদের বিচরণ সীমিত থাকবে। তবে পাঠকের ঔদার্য এ দায়মুক্তির অন্যতম সান্ত্বনা হবে বলে আশা রাখি।

দুই

গোড়াতেই বলে রাখি, শিল্প আর শিল্পদর্শন কিন্তু এক নয়। শিল্প নিয়ে দার্শনিক আলোচনা, শিল্প বিকাশে, বিশেষ করে এর দায় ও প্রত্যাশা মেটাতে এক দীর্ঘ ও কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। তাই শিল্পদর্শন হয়ে উঠেছে শিল্প বিকাশের প্রাণ। আগেই বলেছি, শিল্পদর্শনটা আবর্তিত হয়ে আসছে দুটি মৌলিক প্রশ্নকে ঘিরে– এক. শিল্পের জন্যই শিল্প দুই. শিল্পের একটা জনকল্যাণমূলক বৃহত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। শিল্প-সমাজে কলাকৈবল্যবাদ (art for art's shake) অতি সমাদৃত একটা দার্শনিক আন্দোলন। উনিশ শতকের শেষে ইউরোপে এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে জার্মান দার্শনিক কান্টই ছিলেন এর প্রথম উদ্যোক্তা। পশ্চিম দেশে প্রি-র‍্যাফেলাইট শিল্পীগোষ্ঠী ও উনিশ শতকের শেষের দিককার ইংরেজ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ এই তত্ত্বের ওপরেই জোর দিয়েছিলেন।[১] ভিক্টর কুঁজা, থিয়োফিলে গোঁতিয়ে, রেনান ফ্লচা, বোদলেয়ার প্রমুখ যশস্বী শিল্পবেত্তারা ছিলেন এই ঐতিহ্যের বাহক।[২] তবে সর্বাগ্রে উচিত হবে দান্তে গাব্রিয়েল রসেটির নাম স্মরণ করা। কেননা তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের মুখপাত্র। এছাড়াও ফ্লয়েবার, মালার্মে, ওয়াল্টাপেটার, আর্থার সিমনস, আর্নেস্ট ডসন কিংবা লিওনেল জনসন, এঁরা সবাই এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে এবং এর প্রসার ঘটাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। স্মর্তব্য যে, রাফায়েল-পূর্ববর্তী যুগের চিত্রকলার যে গঠনশৈলী ছিল সেই সততা, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনাই ছিল প্রি-র‍্যাফেলাইটদের কাজ। ১৮৪৮ সালে কয়েকজন ইংরেজ চিত্রকর যেমন– উইলিয়াম হোলম্যান হান্ট, জন মিলে প্রমুখরা প্রি-র‍্যাফেলাইট নামে ঐ সংস্থাটি গড়ে তোলেন। এঁরা কী বলতে চাইলেন? বলতে চাইলেন মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার একমাত্র লক্ষ্য তার আনন্দপ্রাপ্তি। আনন্দ তৈরি ছাড়া শিল্পের অন্য কোনো লক্ষ্য নেই। এজন্য সব ধরনের নন্দনতত্ত্বের ভিতর থেকে প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যকে বাদ দিতে হবে। শিল্পচিন্তার মাঝে কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। আকাঙ্ক্ষা-সম্বলিত চিন্তা শিল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে না। শিল্প হবে শুধু শিল্পের জন্য। শিল্পের কোনো ক্যাশ ভ্যালু থাকা

উচিত নয় ; উচিত নয় কোনো ইউটিলিটির। সয়ম্ভরতা স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প সৃষ্টির মূল শর্ত। শিল্পীর স্বাধীনতা, বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক অভিযাত্রায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। কলাকৈবল্যবাদের সমসাময়িক আরেক দার্শনিক আন্দোলনের নাম ডেকাডেন্স বা ক্ষয়িষ্ণুতা। এ প্রসঙ্গে দাদাবাদ (ফধফধরংস) বা খেয়ালবাদ নামে বিশ শতকের আরেকটা শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলনের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে শিল্পীর অসম্ভব রকমের খেয়ালি বা যাচ্ছেতাই রকমের স্বাধীন চিন্তা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীতে কিছু ফরাসি শিল্প-সাহিত্যিকেরা সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ভেবে শিল্পচর্চা শুরু করেন। অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী সেই শিল্প আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন হান্স আর্প, জ্যাঁ ককতু, মার্সেল দুকাম্প প্রমুখরা। পরবর্তীতে দাদাবাদ ও পরাবাস্তববাদ একসঙ্গে মিশে যায়। শিল্পের জন্য শিল্পের অনুগামীরা বস্তুর বাহ্যিক অবয়বের পেছনে যে সত্যরূপ লুকিয়ে থাকে তাকে খোঁজ করেন। আবার কেউ-বা মনে করেন, শিল্পীর মনের গহীনে যে ভাব লুকিয়ে থাকে, তাকে টেনে বের করে আকার দেওয়াই শিল্পীর মূল কাজ। ফলে এই দুই ধরনের চিন্ত াবিদের মধ্যেই পাওয়া যায় এক ধরনের ভাববাদী প্রবণতা। আমাদের কবিগুরুর মধ্যে বিশুদ্ধ শিল্পভাবনার প্রায় সব উপকরণই উপস্থিত ছিল, যদিও অনেকে মনে করেন, তাঁর সামাজিক ভাবনা তাঁকে অতুলনীয় এক দায়বদ্ধ শিল্পীতে পরিণত করেছে। কলাকৈবল্যবাদীদের মতো তিনিও মনে করতেন, শিল্পকে মুক্ত করতে হবে প্রয়োজনের দাসত্ব থেকে। শিল্পী নিঃসীম গগনবিহারী, বাধাহীন অসীমের দিকে প্রসারিত তার চাহনি। সমাজের কোনো প্রয়োজনের দেয়ালে সে বন্দি নয়, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সে ভেসে চলে অসীম স্বপ্নলোকে। এজন্য তিনি বারংবার বলেছেন, সৌন্দর্য প্রয়োজনের বাড়া।[৩] প্রয়োজন নিতান্তই আটপৌরে ব্যাপার যা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের কাজের মতো। কিন্তু সৌন্দর্যবোধের ব্যাপারটা যেন ঐ চুক্তি ছাপিয়ে ওভারটাইম। যে ঘরে আমরা বাস করি, তা কোনোমতে থাকার জন্য একটা খুপরি হলেই চলত। এতে দরকারটা মিটে যেত ষোলআনা কিন্তু তার মধ্যে আনন্দ ছিল না মোটেও। সুপ্রশস্ত খোলামেলা ঘর, ঘরের মধ্যে নানা রঙের বাহার, বিদেশী আসবাব, সুপ্রসিদ্ধ পেইন্টারের ছবি ইত্যাদি যেন দরকার ছাপিয়ে মনের বিমূর্ত চাহিদাগুলোকে সন্তুষ্ট করে। এজন্যই মনে হয়, সুউচ্চ অট্টালিকার কয়েক কামরা -বিশিষ্ট ফ্লাটের থেকে, খোলামেলা বনরাজির মধ্যে পাখি-ডাকা শ্যামলছায়ার ভিতর একতলা বাংলোগুলো মানুষের হৃদয়কে বেশি স্পর্শ করে। যে কাজ আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজন মিটিয়ে চলে সেখানে কোনো আনন্দ নেই। অফিসে কাজটা শেষ হলেই আমরা বাড়ি ফিরে আসি। অফিস আমাদের দরকার মিটিয়ে দেয় বটে কিন্তু আনন্দ যা পাওয়ার, আমরা তা পাই বাড়িতে। মানুষ শুধু তার প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমিত থাকতে চায়নি, আবদ্ধ থাকতে চায়নি যতটুকু দরকার ততটুকুর মধ্যে। মন হতে চেয়েছে মেঘের সঙ্গী, ছুটে যেতে চেয়েছে নিঃসীম শূন্যে; বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে দিক-দিগন্তের পানে। পুকুরের কয়েক ঘড়া

জলের থেকে সাগরের বিপুল জলরাশি মানবহৃদয়কে এজন্য বেশি টানে। মানুষ যা পেয়েছে তার থেকেও যা পায়নি তার প্রতি আকর্ষণ বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাছে শিল্পভাবনার মূল প্রেষণাটাই আনন্দ। আনন্দ সৃষ্টিশীল বোধকে তাড়িত করে। সমুদ্রের ভিতর অন্ধকারে জাহাজগুলোকে পথ দেখানোর জন্য যেমনি বাতিঘর থাকে, তেমনি মানুষের নান্দনিক বোধকে উদ্দীপ্ত করার জন্য কাজ করে আনন্দ। এই আনন্দই সৃষ্টিশীল চিন্তাকে অনির্দেশের পথে নিয়ে যায়। কবি বলেছেন, 'এই জগৎ সৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে।[৪] কবি বলতে চাচ্ছেন, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট ঐক্যের আধার। বিশ্ববীণার তারে যে সুর ঝংকৃত হয়ে চলেছে তা সুস্থিত ও সুসংগতিপূর্ণ। সেই ঐক্যটা ধরাই মূল কাজ। সেটাই সত্য; সেটাই বাস্তব। 'উপনিষদ'ও বলিতেছেন : আনন্দরূপমমৃতং যদ্-বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth Ges beauty; সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।[৫] রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য আর সৌন্দর্য তাই একাকার হয়ে গেছে। এ সত্য অবশ্য বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের সত্য নয়। এঁদের সত্য নিরালঙ্কার, নিরাভরণ। কিন্তু কবির সত্য অন্যখানে। কবির কাছে 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি/ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' কবি সত্যানুসন্ধান করেছেন, আপন মনের গহীনে যে ভাবের অতল রাজ্য আছে তাকে বস্তুজগতের উপর নিক্ষেপ করে। তাই সে সত্য আত্মস্পর্শী, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। গোলাপের দিকে তাকিয়ে যখন আমরা সুন্দর বলি, তখনই সুন্দর হয় সে ! চুনির লালত্ব কিংবা পান্নার সবুজত্বটা নির্ভর করে আমার চেতনার ওপর। এটাই আত্মগত চিন্তার চরম দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক। তবে এটা ঠিক, তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ড আর সাহিত্য-ভাবনার প্রায় সবটুকু জুড়েই রয়েছে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার এক অমলিন চিত্র। এ-কারণে রাবীন্দ্রিক ভাবনায় একটা দ্বৈততার সন্ধান মেলে। আবার সেই শিল্পের কথাই আসি। শিল্পীর মনে যে অমূর্ত বেদনা ঘনীভূত হয় তারই কায়া পড়ে তুলিতে। বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে কালির আঁচড়ে। মূর্ত রূপ পায় ভাবনার ঢেউ। ' 'শিল্পী যে অমূর্ত রূপকে রূপে ফুটাইবার জন্য তিনি প্রয়াস করিয়া চলেন এবং যখন তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন বলিয়া মনে করেন তখন সৌন্দর্যসৃষ্টির ও সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দে আনন্দিত হইয়া উঠেন।'[৬] আদি কবি বাল্মিকীর কথা মনে করুন। ঋষি ভরদ্বাজকে নিয়ে তমসা নদীর ধারে ভ্রমণ করছিলেন তিনি। মিথুনরত ক্রৌঞ্চের বুকে ব্যাধের নিষ্ঠুর শর বিদ্ধ হলে শোকাতুর ক্রৌঞ্চীর আর্তনাদ দেখে, বাল্মিকীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসল সেই আদি শ্লোক –

'মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কাম-মোহিতম্।'

হে নিষাদ! ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চকে তুই যে হত্যা করলি তার জন্য তুই জীবনে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না। এজন্য শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর বেদনাটা

বড্ড বিবেচ্য বিষয় । শিল্পী বেদনাক্রান্ত হয়ে কলম ধরেন– বেদনার লাভা উদগীরিত হয় দৃশ্যপটে । কবি বা শিল্পীর মনের মধ্যে যতটুকু অস্ফুট ভাবের সঞ্চারণ হয় তা বাস্তবে রূপ পেলে তিনি ততটুকু আনন্দিত হন । সংগীতের পেছনে যেমন থাকে স্বরলিপির কড়া বিধান, তেমনি এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের পেছনে আছে সুস্থিত ও সামঞ্জস্যের সূক্ষ্মনীতি । সেই সমগ্রতার সাথে একাত্ম হলেই কবিচিত্তে বেজে ওঠে অজস্র রাগিনীর ঝংকার । বাহির আর ভিতরের মিলন হলেই তবে সে সুর বেজে উঠে । তবে এজন্য হৃদয়ের গবাক্ষগুলোকে উন্মুক্ত রাখা জরুরি । অসীমের সাথে সীমার সেই মিলন সম্ভব হলেই প্রাণ স্পন্দিত হয়– নিখিল বিশ্ব এসে ধরা দেয় আপন চেতনায় । হৃদয়ের মাঝে যিনি আছেন, তিনিই নিখিলেশ্বর । ফুটিয়ে তোলেন ভাবের ঘনীভূত রাগিণী । কবি বলেছেন, 'সদা জননাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।' অন্তরের গভীরে কে আছেন যিনি সদা জাগ্রত! আমার মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে তিনি আপন সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন–

'অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে ।'

আমার চেতনার সাথে বেদনার সাথে, গভীরভাবে সম্পৃক্ত সে । 'কে গো অন্তরতর সে!/ আমার চেতনা আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে॥' দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথের কথাটা এখানে বেশ প্রাসঙ্গিক হবে– 'যে সৃষ্টিকে কবির সৃষ্টি বলি, তাহা অতি অল্প পরিমাণেই কবির জাগ্রত মনের সৃষ্টি, কবির মধ্যে যে অন্তর্যামী পুরুষ আছেন সেই পুরুষের চিত্তফলকে যে মায়ামূর্তি দাঁড়ায় তাহাকেই রূপ দিবার জন্য সেই অন্তরপুরুষ তাঁহার শক্তিকে কবির জাগ্রত মনের মধ্যে প্রেরণ করিয়া আপনার মধ্যে প্রতিভাত অস্ফুট মূর্তিকে স্ফুট করিতে চেষ্টা করেন ইহাই শিল্পসৃষ্টির প্রধান রহস্য ।[৭] রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' সেই অস্ফুট মূর্তিকে প্রকাশ করেন আপনাকে আশ্রয় করে । যিনি আমার অভিজ্ঞতার সকল অনুভূতির কেন্দ্রে একান্ত নির্জনে বাস করেছেন তিনিই সৃষ্টি করে চলেছেন নব নব রূপে । সৃষ্টির সেই প্রকাশই শিল্প । 'শিল্পী আপনার দুঃখ-সুখ, আনন্দ বেদনার যথার্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে অথবা শিল্পীজনোচিত সহানুভূতির দ্বারা অপরের আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার যথাযথ প্রকাশ দ্বারা সমগ্র মনুষ্যচরিত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন । তবেই সার্থক শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হ'বে ।'[৮]

অন্তরের কথা উঠল যখন তখন বলি ক্রোচের কথা । সৌন্দর্যপিপাসু ক্রোচে বাহ্যবস্তুর আলাদা সত্তাকে মূল্য দেননি । তিনি ছিলেন বিজ্ঞানবাদী । আপন মনকে নিক্ষিপ্ত করেছেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে পরিচিত বাহ্যবস্তুর ওপর । তাঁর মতে, বাহ্যবস্তুর আলাদা কোনো গুণ নেই, মনটাই সব । এজন্য তিনি বলেন, 'সৌন্দর্যবোধই সৌন্দর্য বা সুন্দর ।' প্রকৃতি নিরপেক্ষ । সে সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয় । সুন্দর হল মানুষের মন– যে মন দিয়ে আমরা বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করি । তবে প্রত্যক্ষ মানে নিছক দেখা নয় ।

দেখার সাথে যোগ করতে হয় অন্তঃদর্শনের। এজন্য শিল্পীর স্বাজ্ঞিক জ্ঞান (intuitive knowledge) দরকার। ইন্দ্রিয় দিয়ে বাহ্যবস্তুর আবরণটাকেই চেনা সম্ভব। ভিতরে প্রবেশ অনায়াসসাধ্য নয়। কিন্তু স্বজ্ঞা বস্তুর অভ্যন্তরে ডুব দিয়ে তার ভিতর থেকে অখণ্ড সত্যকে ছেঁকে তোলে। শিল্পজগতের আরেক প্রবাদপুরুষ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ধ্যানদৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছিলেন। শিল্পীর কাজ হল বস্তুর ভেতরে ডুব দিয়ে তার আন্তরসত্যকে উদ্ভাসিত করে তোলা। তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-তে লিখেছেন 'মানুষ এবারে আর এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব সৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বসল। এই দৃষ্টিবলে আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগল। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসল দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অবোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রঙহীনকে রং দিয়ে চলল মানুষ।'[৯] শিল্প সৃষ্টি এজন্য এত গভীর বিষয়। যিশুখ্রিস্টের বারোজন সঙ্গীর সাথে তাঁর শেষ নৈশভোজের দৃশ্য 'দ্যা লাস্ট সাপার' আঁকতে যেয়ে ভিঞ্চি সাতদিন ধরে চিত্রফলকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে শোনা যায়। ক্রোচের মতন কান্ট, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, ব্রাডলি, বোসাঙ্কেও সৌন্দর্যকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক নিগূঢ়তম নির্জন প্রদেশ বলে মনে করতেন।

সৌন্দর্যবিচারে ব্যক্তির আত্মগততা (subjectivity)–র যে কথা আগেই তুলেছিলাম সে সম্পর্কে আরেকটু বলি। সৌন্দর্যপিপাসু মনের আরশিতে বস্তু এসে যেভাবে ধরা দেয় তা ভিন্ন ভিন্ন পটে ভিন্ন রকমভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। পদ্মার ধারে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় সমগ্র পশ্চিমাকাশ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে প্রাণস্পর্শী মোহাবিষ্টতায় কবিমন যখন আচ্ছন্ন তখন নির্বিকার ধীবর সম্প্রদায়, সারাদিনের মৎস্য শিকার শেষে কর্মক্লান্ত হয়ে হেঁটে চলে জীবিকার তাড়নায়। কবির কাছে যা চরম উদ্দীপক, অন্যের কাছে তা অতি সাধারণ– তাজমহল রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্যের অতুলনীয় নিদর্শন অন্যদিকে স্থপতি হাক্সলির কাছে নানা ত্রুটিতে পূর্ণ একটা সাধারণ স্থাপনা। সাহিত্যিক আবু সয়ীদ আইয়ূব বলেছেন, 'বিচারের বৈপরীত্য প্রমাণ করছে যে, তাজমহল স্বয়ং সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়; রবীন্দ্রনাথের মনে ঐ-বস্তুর সাক্ষাতে যে-অনুভূতি জাগে সৌন্দর্য তার ধর্ম, এবং হাক্সলির মনে যে-ভাবের উদ্রেক হয় তাকেই অসুন্দর বলা সমীচীন। তাজমহল একই কালে সুন্দর এবং অসুন্দর হতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি যদি সুন্দর হয় এবং হাক্সলির অনুভূতি অসুন্দর– তাতে কোনো নৈয়ায়িক বিসংবাদ নেই।'[১০] নৈয়ায়িক বিসংবাদ নেই, এ কারণেই যে, ভিন্নতাই মানবচিত্তের একমাত্র লক্ষণ। একই দৃশ্যে বিভিন্ন চিত্তে বিচিত্র ভাবের উন্মীলন ঘটাই স্বাভাবিক। শেক্সপিয়রের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা এ কারণেই টলস্টয়ের কাছে অনেকটাই মলিন।

টলস্টয়ের কথা যখন উঠলই তখন একটু বলি। শিল্পের গতানুগতিক যে অর্থ ছিল তা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে বেশ খানিকটা অকার্যকর। তিনি মনে করেন এটা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক মনের নির্জন অভিব্যক্তিই নয়, অথবা শুধু আনন্দভ্রমণই নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত মানবকল্যাণের এক অসম্ভব প্রীতিময় ভাব। তাঁর নিজের কথায়– Art is not, as a metaphysician says, the manifestation of some mysterious idea of beauty or God; it is not, as the Aesthetical physiologist say, a game in which man lets off his excess of stored-up energy; it is not the expression of a man's emotions by external signs; it is not the production of pleasing objects; and above all, it is not pleasure; but it is a means of union among men joining them together in the same feelings, and indispensable for the life and progress towards well-being of individual and of humanity[১১]

পূর্বোক্ত শিল্প-দার্শনিকদের থেকে একটু ভিন্ন শোনাল, নয় কি? তার মতে সব ধরনের শিল্পের মূল লক্ষ্যটা মানুষকে সমন্বিত করা। আত্মার সাথে আত্মার মিলনই শিল্পের একমাত্র কাজ। যে-শিল্প মানুষের মাঝে বিভেদ ভুলিয়ে একের ভাবকে অন্যের মাঝে গ্রথিত করে সেই শিল্পই উৎকৃষ্ট। শেক্সপিয়রের অধিকাংশ নাটকগুলো তুলে ধরেছে মানব মনের কদর্য আর নিকৃষ্ট দিকগুলো। টলস্টয়ের কাছে শেক্সপিয়রের তাই এত অনাদর। এমনকি নিজের সৃষ্টি 'Resurrection'-কেও তিনি মন্দভাবনা বলে অভিমত দিয়েছিলেন পরবর্তীতে। আসলে টলস্টয়ের শিল্পচেতনার উদ্ভব হয়েছে খ্রিস্টান নৈতিকতা থেকে। তাঁর মতে মানুষের মাঝে যে অনৈক্য আর বিরোধ তার জন্যই মানবজীবনে এত দুঃখ। সাধুতা, পবিত্রতা, প্রেম আর প্রীতিভাব যে শিল্পচিন্তার মূল দায়িত্ব সেটা উপলব্ধি করতে পারলেই সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়। টলস্টয়ের মতো রাস্কিনও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মনের উচ্চতম গভীর ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা যে ভাবাবেগ দিয়ে চিত্রপটে ছবি আঁকি সেটা হতে হবে পবিত্র আর মহৎ। এখানে প্রকাশের কৃতিত্ব থেকে প্রকাশের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বেশি। সেই আর্টই সর্বোৎকৃষ্ট যে আর্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে উন্নততর ভাব ও বিশুদ্ধ চিন্তা। আর উন্নত ভাব হল মনের উচ্চতর ও গম্ভীর বৃত্তি। রাস্কিন বলছেন, 'Any material object which can give us pleasure in the simple contemplation of its outward qualities without any direct and definite exertion of the intellect, I call in some way, or in some degree beautiful.'[১২]

রাস্কিনের কাছে সত্য প্রকাশই শিল্পের একমাত্র দায়িত্ব। কীটসের মতো truth আর beauty এখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। চিত্রের সাথে সত্যের অনুরূপতা তাই শিল্পকে সার্থক করে তুলেছে। জীবনের শেষ দিকে এসে রঁমা রঁলাও শিল্পকে প্রয়োজনের হুকুমদারী থেকে মুক্ত করেছেন।

আমরা কান্টের কথায় ফিরে আসি, যাঁকে বলেছিলাম কলাকৈবল্যবাদীদের পথপ্রদর্শক। তাঁর সৌন্দর্যচিন্তা বা রসবিচার বোধ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তিনি বলেন, আমরা যে জগতকে প্রত্যক্ষ করি তা প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগত। বুদ্ধি দিয়ে আমরা সে জগতের নাগাল পাই। এ ছাড়াও আরেকটি জগত আছে যার নাম পারমার্থিক জগত। যাকে অতীন্দ্রিয় জগতও বলা যায়। বুদ্ধি সেখানে অনাহূত। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা দিয়ে সেখানকার সন্ধান মেলে। এ যেন দুই পৃথিবী– একটার খবর রাখে বুদ্ধি অন্যটার প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার জগৎটা নৈতিক নিয়মের দাস। তবে এ-দুই জগতের মাঝে আছে অনেক সামঞ্জস্য। আসলে দৃশ্যমান জগতের ওপর পারমার্থিক জগতের আছে বেশ খানিকটা আধিপত্য। এ-দুই জগতের ঐক্যের সংবাদ আমরা পাই কান্টের সৌন্দর্যচিন্তার মধ্যে। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাঝে কান্ট এনেছেন বিচারশক্তি (the power of judgment)-র ধারণা। এই চিন্ত াশক্তিই এদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

কান্টের মতে আত্মার তিনটি ধর্ম– জ্ঞান, ইচ্ছা আর সুখ। ঠিক এরকম আর তিনটি শক্তির কথা ভেবেছেন তিনি– বুদ্ধি, প্রজ্ঞা আর বিচার। বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান পাই। প্রজ্ঞার মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি আর বিচারশক্তি দিয়ে পাই সুখ। বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তি এক নয়– এদের মাঝে আছে বেশ তফাৎ। বুদ্ধি আমাদের নিয়মের সংবাদ দেয় কিন্তু কোনো বস্তু সেই নিয়মের অধীন কিনা তা বলে দেয় বিচারশক্তি। বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে একটা সাধারণ নিয়মের মাঝে ফেলাই বিচারশক্তির কাজ। এ ধরনের বিচারকে কান্ট বিমর্শিক (reflective) বিচার বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিমর্শিক বিচার কিভাবে প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে? কান্ট বলেন, গবেষণার সময় এ-রকম ধারণা মনের ভিতর এনেই আমরা শুরু করি যে প্রকৃতিরও এ রকম অর্থ আছে। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যখন নিয়মের মধ্যে আনতে পারি তখনই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়। আমরা দাবি করতে পারি যে, আমরা বুঝলাম। তখন আমাদের কাছে মনে হয়, প্রকৃতি বোধগম্য করে সৃষ্টি করাই যেন স্রষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ জগতটা অর্থহীন, যাদৃচ্ছক বা খেয়ালী নয়। এর মধ্যে আছে বিরাট ঐক্যের এক ইংগিত। নিখিল বিশ্বের সেই সুরটা ধরে ফেললেই আমরা আনন্দ পাই। সংগীতজ্ঞ যেমনি করে গানের তালটা চট্ করে ধরে ফেলেন; কান্টের মতে এই আনন্দ বিশুদ্ধ আর নির্মল। যে বস্তু দেখলে মনের ভিতর এই নির্মল আনন্দের পরশ জাগায় তাই সুন্দর। 'কান্টের মতে, প্রত্যক্ষ বা কল্পনায় কোনো কোনো বস্তুর উপলব্ধির বেলায় আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানশক্তি অতি সামঞ্জস্যভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে। জ্ঞানশক্তির সামঞ্জস্য ক্রিয়া বা ক্রিয়াগত সামঞ্জস্য হইতে আমাদের মনে এক বিশিষ্ট প্রকারের আনন্দের উদ্ভব হইয়া থাকে।'[১৩] আসলে, আমাদের ভিতরে যে শক্তি বস্তুকে সুন্দর বলে চিহ্নিত করতে শেখায় সেটাই রসবোধ (Taste)।

কান্ট জ্ঞানীয় বিচারের সাথে রসবিচারের পার্থক্য টেনেছেন। জ্ঞানীয় বিচারের মাধ্যমে আমরা বস্তুর স্বরূপকে জানি কিন্তু রসবিচারের মাধ্যমে জানি বিষয়ের আবির্ভূত রূপকে।

অর্থাৎ কোনো বিষয় আমাদের কাছে যেভাবে ভেসে ওঠে সেটাকে। জ্ঞানশক্তির সামঞ্জস্য ক্রিয়ার দরুন অনেক কিছুকে আমাদের কাছে সুন্দর লাগতে পারে কিন্তু সে আনন্দ নিষ্কাম নয়। এজন্য তাকে আমরা রসের আনন্দ বলতে পারি না। মনে রাখতে হবে রসের আনন্দ স্বার্থহীন আর আকাঙ্ক্ষাবিহীন। এই আনন্দ যদিও ব্যক্তিসাপেক্ষ তবুও যেহেতু এটা বস্তুর রূপকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয় তাই এটা সার্বত্রিক। তবে কান্টের শিল্পচিন্তাটা পরিশেষে 'Purposiveness without a purpose'- এ গিয়ে পৌঁছেছে। অনেকে বলেছেন এটা সোনার পাথরবাটির মতো স্ববিরোধী একটা ধারণা। [১৪]

তিন

আলোচনার এই পর্বে বিতর্কের দ্বিতীয়াংশে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। আমরা এ-যাবৎ শিল্পের যে তত্ত্বালোচনা করলাম সেখানে ছিল না এর ব্যবহারিক মূল্যের কথা। শিল্প যে মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধি করতে পারে বা এটা যে ব্যবহারিক জীবন ঘষে তৈরি হতে পারে সেটার প্রতি নজর দেননি কেউ। ফলে শিল্প হয়ে রইল জীবন-বহির্ভূত অতি-বায়বীয় এক নির্জন চিন্তা। ইতোমধ্যে যাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি তাঁরা শিল্পকে শিল্পের বাইরে কিছু ভাবতে চাননি। শিল্প যে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অতি ঘনিষ্ঠতম প্রদেশ তা-ও তাঁদের আচরণে চিন্তায় কোনো ধরনের আভাস মেলেনি। তাঁরা ভেবেছেন, আনন্দ সৃষ্টি ছাড়া শিল্পের অন্য কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ বাদেও শিল্পের যে সুবিশাল ভূমিকা আছে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। শুরুটা করা যাক গোড়া থেকে। বহু বছর আগে মানুষ গুহা ছেড়েছে। নৃ-বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান তাই বলছে। গুহাবাস ছিল অতি জরুরি। প্রতিটা কাজের একটা তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্যটা নিছক পেট ভরানো ছাড়া কিছু নয়। প্রবৃত্তির তাড়নার বাইরে হয়তো দৃষ্টি ছিল না, অন্যদিকে। কিন্তু তাতে মন ভরল না। সে চাইল আরো কিছু। পশুদের মারতে যেমন-তেমন পাথর হলেই আগে চলত। কিন্তু সে কাজটা সহজ হয়ে গেল পাথরগুলো সুঁচালো করার পর। এবং কে কত নিখুঁত করতে পারে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল সে। কারণ নিখুঁত অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল ভালো জীবিকার উপায়। শিল্পের যাত্রা সেখান থেকেই। সময় এগোল। কর্মপরিধি বেড়ে গেল– প্রতিযোগিতাও সেই সাথে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষের চিন্তার গণ্ডি যত বাড়তে থাকল ততই সে নিজেকে নিখুঁত করতে লাগল। প্রয়োজন তাকে নতুন ক্ষেত্রানুসন্ধান করতে শেখাল। এই জন্যই শিল্পের সাথে প্রয়োজনের যোগ অতি নিবিড়। সমাজের অতি-সচেতন ক্রিয়াকর্মের ফলাফল শিল্প। শিল্প নিষ্ক্রিয় নয়, স্থবির নয়, শুধুমাত্র আনন্দ তৈরির ক্ষেত্র নয়, নয় অবসর আর অলস সময় কাটানোর মাধ্যম। Millet বলেছেন, 'Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds.' জীবনের বাইরে শিল্পের কোনো জায়গা নেই। সমাজ ও জীবনের নানা জটিলতা, টানাপোড়েন, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশার সাথে শিল্প

জড়িত। বার্নাড'শ বলেছিলেন, শিল্প যদি শিল্পের জন্য হত তাহলে আমি এক কলমও লিখতাম না। রুশ চিত্র-সমালোচক চের্নিসেভস্কি লিখেছেন, 'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটি আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। যেমন অদ্ভুত লাগবে 'ধনসম্পদের জন্য ধনসম্পদ' বা 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান' এধরনের শ্লোগান যদি কেউ দেয় সেগুলি শুনে।[১৫] তাঁর মতে ধনসম্পদ কিংবা বিজ্ঞান যেমনি মানুষকে সাহায্য করে, শিল্পকলার ভূমিকাও তেমনি। শিল্পকলার উদ্ভব হয় সামাজিক ভাবনা থেকে। কবিতা-গান-নাটক বা চিত্রের মাঝ দিয়ে সেই ভাবনাগুলো বাস্তব রূপ পায়। এ জন্য সামাজিক সত্তার সাথে চিত্রকলার সম্পর্ক অতি গভীর। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান (মার্কসবাদ) একই কথা বলেছে। প্রতিটা সমাজব্যবস্থায়ই একটা কাঠামো থাকে। এটা তার অর্থনৈতিক ভিত। এই কাঠামোর ওপর গড়ে ওঠে উপরিকাঠামো। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, মতাদর্শ, ভাবাবেগ অথবা শিল্পকলা ইত্যাদি হল এই উপরিকাঠামো। কাঠামো উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে পরবর্তীতে যত সমাজের আর্বিভাব ঘটেছে সব সামাজিক ভাবনাই এই সামাজিক সত্তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। এ জন্য মার্কসবাদে বলা হয় থাকে– 'It is not the consciousness of men that determines their being, on the contrary, their social being determines their consciousness.' এজন্য যে–চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে শিল্পী তার জগৎ তৈরি করেন তা চিরন্তন, স্থায়ী, চূড়ান্ত বা নিরপেক্ষ নয়। অবস্থানের সাথে, কালের সাথে, সম্পর্কের সাথে এর পরিবর্তন ঘটে। শিল্পী যে সমাজে বাস করেন তার তুলিতে ফুটে ওঠে সে সমাজের বাস্তব চিত্র। জয়নুলের তুলিতে যেমন দুর্ভিক্ষ-চিত্র ফুটে উঠেছে, পিকাসোর তুলিতে যেমন স্পেনের গৃহযুদ্ধ ফুটে উঠেছে, ঠিক তেমনি গোয়ের্নিকা, পল গোগ্যাঁ বা গোইয়ার তুলিতে উঠে এসেছে সামাজিক দৃশ্যের অপূর্ব সব মনোমুগ্ধকর ছবি। কাজেই শিল্পী নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন নন। কারণ তিনি যে সমাজের অংশ, সে সমাজের নানা প্রপঞ্চের সাথে তিনি আষ্টে–পৃষ্টে বাধা থাকেন। সুতরাং সমাজবিচ্ছিন্ন, ভাবাবিষ্ট, তন্দ্রাচ্ছন্ন, নির্জনবাসী শিল্পী কারো কাছেই কাম্য নয়। কেননা শিল্প একটা অঙ্গীকার, একটা প্রত্যয়, একটা আত্মত্যাগের নাম।

রবীন্দ্রনাথকে আগে বলেছিলাম বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক কিন্তু তিনি ছিলেন পৃথিবীর তাবৎ কর্মযোগীদের সেরা। শিল্প বা সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তিনি যা বলেননি অর্থাৎ তাঁর বিপুল সৃষ্টির ফাঁক দিয়ে যা কিছু বেরিয়ে এসেছে সে-সব সৃষ্টি। তাঁর কবি-সত্তা এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যা তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম এক দায়বদ্ধ শিল্পীতে পরিণত করেছে। তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, চিঠিপত্রে, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে করে তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে বিবেচনা না করলে অন্যায় হবে। সভ্যতার সংকট নিয়ে তিনি ভেবেছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নিয়েছেন, অন্যায়-অবিচার-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে শক্ত ভূমিকা রেখেছেন।

দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা যুগিয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতার ছোবল থেকে বাঁচার পথ খুঁজেছেন তিনি। একান্ত আশাবাদী কবি তাই লিখেছেন–

'যদি সবাই ফিরে যায়, ও রে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়–
তবে পথের কাঁটা থাকে
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা চলো রে॥'

আবার, 'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি কর মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে–
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' ॥

রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক ভাবনা মানেই তাঁর মুষ্টিমেয় কিছু সৌন্দর্যবিষয়ক প্রবন্ধ কিংবা গুটিকতক কবিতা নয়। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিভাণ্ডার থেকেই ঠিকরে বেরিয়েছে এক মানবতাবাদী শিল্পীর দায়বদ্ধ শিল্পকর্মের উজ্জ্বল দ্যুতি। তাঁর অঙ্গীকার ছিল সমাজের কাছে, দায় ছিল মানুষের কাছে, ত্যাগ ছিল, প্রতিজ্ঞা ছিল, সর্বোপরি ভালোবাসা ছিল মানুষের প্রতি। ইউরোপে যারা বিশুদ্ধ কলাকৈবল্যবাদী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের থেকে ভিন্ন। সাহিত্যভাবনার নৈঃশব্দিক জগতের নিভৃতে তিনি পলায়নমুখী বিচ্ছিন্ন মানুষ ছিলেন না– তিনি ছিলেন বিদ্রোহে শানিত বিপ্লবী। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন চেয়েছিলেন তিনি; দারিদ্র্য বিমোচনের পন্থা হিসেবে কৃষিব্যবস্থা ও কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটানোর কথা ভেবেছেন, বিশ্ব দরবারে নিজের মাতৃভূমিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যুদ্ধমুক্ত, ভয়শূন্য, নিরাপদ বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে সারা বিশ্ব ঘুরেছেন তিনি। পরিণত হয়েছেন বিশ্ববিবেকে। জাতীয়তার ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে পরিণত হয়েছেন আন্তর্জাতিক মানুষে। তাই তাঁকে দায়বদ্ধ শিল্পী না বলা উচিত হবে কি? শুরুতেই পাঠককে যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম তাকে একটু লাঘব করার দায়ভার নেওয়া যেতে পারে। শিল্পের দায়িত্ব সম্পর্কে যে দুটো বিপরীতমুখী চিন্তার সাথে পরিচয় ঘটেছে তা অনেকটাই একপেশে। কারণ শিল্প যে শুধু আনন্দবর্ধক– এটা ঠিক নয়। অন্যদিকে এটা যে পণ্যের মতো বাজারের দ্রব্য তা-ও বুঝি একপেশে বক্তব্য। পৃথিবীর বহু সৃষ্টিকর্মের জন্ম হয়েছে ভাবুক শিল্পীর খেয়ালী ভাবনায়। অগণিত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে নিভৃতবাসী সাহিত্যিকের একান্ত নির্জন কল্পনায়। পঞ্চদশ শতকের ইতালির বিখ্যাত চিত্রকর মিকেলাঞ্জেলোর অপূর্ব সব সৃষ্টি, সেন্ট পিটারের 'পিয়েতা', সিস্তিন চ্যাপেলের ছাদে আঁকা সেই বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিচিত্র, কিংবা ফ্লোরেন্স একাডেমিতে রাখা 'ডেভিড' ইত্যাদির ছিল না মানুষের

তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর কোনো দায়ভার। তারপরও এসব শত বছর ধরে মানুষকে আনন্দ দিয়ে চলেছে– বিমুগ্ধ ভাবুক শিল্পীহৃদয়ের নান্দনিক ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে। পর্যটকের অতৃপ্ত মনের বাসনা পরিতৃপ্তি ছাড়া তাজমহলের অন্য কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। তাই সব শিল্পকর্মেরই একটা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন থাকতে হবে এ ধারণা ঠিক নয়। অন্যদিকে শিল্পীর আনন্দসৃষ্টির বাইরেও যে এর একটা সামাজিক দায়িত্ব থাকবে না এটাও ভুল। তবে মনে রাখতে হবে সব সময় প্রয়োজন সিদ্ধি মানেই বাহ্যিকভাবে শারীরিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি নয়– অশান্ত হৃদয়ের একাগ্র সান্ত্ব নাও বটে। রবীন্দ্রসংগীত কিংবা মোৎসার্টের অপূর্ব বেহালার সুরধ্বনি তাইতো এই সংক্ষুব্ধ পৃথিবীতে মানুষকে তৃপ্তি দিয়ে চলেছে নিরন্তর। কালিদাসের মেঘদূতে যেমনি আছে ভারতের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচিত্র বর্ণনা তেমনি তাতে আছে আবার বিরহী প্রাণের অতৃপ্ত বাসনার নানা অভিব্যক্তির বর্ণনা। নির্বাসিত যক্ষের বেদনার মূল্য পৃথিবীর বৃহৎ কিছুর তুলনায় কম কিসে?

তথ্যসূত্র

১. কবীর চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ; শিল্পতরু প্রকাশনী, পৃ-৪৫
২. সুধীর কুমার নন্দী : শিল্প ও শিল্পীর স্বয়ম্ভরতা; দর্শন ও প্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৯৯

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্য; বিশ্বভারতী, পৃ–৪৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ–১১

৫. প্রাগুক্ত, পৃ–৫১/৫২

৬. আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : সৌন্দর্যতত্ত্ব; চিরায়ত প্রকাশন, পৃ–৭

৭. প্রাগুক্ত : পৃ– ৯/১০

৮. সুধীর কুমার নন্দী : রবীন্দ্র দর্শন অন্বীক্ষণ; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ–৩৯

৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী; আনন্দ, পৃ–৩৬

১০. আবু সয়ীদ আইয়ুব : পথের শেষ কোথায়; দে'জ পাবলিশিং, পৃ–৩৩/৩৪

১১. Tolstoy : What is Art; p-5 (আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সৌন্দর্যতত্ত্ব– পৃ-৯৫)

১২. Ruskin: Modern Painters; p-11(আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সৌন্দর্যতত্ত্ব; পৃ–১০১)

১৩. রাসবিহারী দাস: কান্টের দর্শন; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ–১৮৭

১৪. সুধীর কুমার নন্দী : শিল্প ও শিল্পীর স্বয়ম্ভরতা; দর্শন ও প্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১০৩

১৫. শ্রী সুহাস চট্টাপাধ্যায় (সম্পাদনা); মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ–২০৯

শিল্পের দর্শন: সংবেদনশীলতা ও অন্যান্য

শা হ দ ত হো সে ন

মানুষ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, গরু যেমন গরু হয়েই জন্ম লাভ করেছে। মানুষ মানুষ হয়েছে তার সংস্কৃতি লাভের মধ্য দিয়ে। যে সংস্কৃতি লাভের অন্যতম মাধ্যম শিল্প (Art)। শিল্প কী এবং কী নয় আজ আর সেই বিতর্কের মধ্যে কেউ থাকতে পছন্দ করবেন না। সকল বিতর্কের অবসান ঘটে গেছে সেদিনই, যেদিন মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে সে নিজেকেই (মানুষকেই) বসিয়েছিল। কাজেই মানুষকে তার নিজের প্রয়োজনে শিল্পের কাছে আসতেই হচ্ছে। সংস্কৃতি ছাড়া যেমন মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, একইভাবে শিল্প ছাড়া সংস্কৃতি নির্মাণ অসম্ভব।

কবিতা, ছড়া, গল্প, গান, নাটক, নৃত্য, চলচ্চিত্র, চিত্র এসবই শিল্পের এক একটি মাধ্যম, যে মাধ্যমগুলোর মধ্যে সুখ ও দুঃখ বা হাসি এবং কান্নার বাইরে কিছু নেই; মানুষের মনোজগতের ভেতরে এই দুই প্রক্রিয়ায় প্রভাব সৃষ্টি করা এই শিল্পের কাজ।

শিল্প মানুষের মনকে ব্যায়াম করিয়ে থাকে। সারাক্ষণ বসে থাকলে বা শুয়ে থাকলে শরীর যেমন অবশ হয়ে আসে, শিল্পের চর্চার মধ্যে না থাকলে মনও নির্বোধ বা কর্কশ হয়ে যায়। মানুষের মনকে নিয়মিত ব্যায়াম করিয়ে থাকে যে শিল্প, সেটা কখনো উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি সাধনও করতে পারে। মানুষের মনকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যে কথিত শিল্প, সেই শিল্প চর্চা থেকে আবার বিরত থাকাও জরুরি।

ধর্ম যেমন মানুষকে আফিমের নেশা বা অংকের ছকে বেঁধে ফেলে আবার ধর্মচ্যুতি মানুষকে বল্গাহীন করে। এর কোনোটিই ভারসাম্য শেখায় না; না ধর্ম না ধর্মচ্যুতি। কাজেই ধর্মের বাইরে এসে মানুষ যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সংস্কৃতিকে আশ্রয় করতে চাইছে সেই সংস্কৃতি উন্নত হবে যে শিল্পের মাধ্যমে, সেই শিল্পকেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। বহুপূর্বে দার্শনিক ইবনে খালদুন সংবেদন ও প্রজ্ঞাকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। এই 'সংবেদন'ই হচ্ছে শিল্পের মূল চাবিকাঠি।

যে জনগোষ্ঠির মধ্যে সংবেদনশীলতা নেই তারা ভালো শিল্প সৃষ্টি করেছে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পের সৃষ্টি হয় মূলত শিল্পী-ব্যক্তির সংবেদন থেকে। আর যাদের মধ্যে সেই শিল্পের চর্চা হবে তারাও হয়ে উঠবে সংবেদনশীল। কারণ কর্কশ জীবনের বর্বরতা দূর করেই মানুষকে প্রথম মানুষ হতে হয়েছিল। সেই বর্বরতা আবার পেয়ে যাতে না বসতে পারে সে জন্যই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা প্রাত্যহিক এমনকি প্রতি মুহূর্তের। সে কারণে ধর্মের গণ্ডি এখন আর মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে পারছে না; মানুষ ধর্ম ও বর্বরতা একই সঙ্গে করে চলছে। কিন্তু শিল্পের কোনো গণ্ডি নেই; না সৃষ্টির ক্ষেত্রে না চর্চার ক্ষেত্রে। ফলে মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য একমাত্র মাধ্যম হল শিল্প। শিল্পই পারে একটি উন্নত সংস্কৃতি সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে।

শিল্পসত্তা আবার একই মানুষের মধ্যে চিরকাল বিরাজমান থাকবে এমন নয়। যখন সে শিল্পী নয় তখন সে কী কী বর্বরতা প্রদর্শন করল– সেটা দিয়ে তার শিল্পীসত্তাকে বিচার করাও সমীচীন নয়। কারণ শিল্প যিনি সৃষ্টি করেন বা চর্চা করেন তার মন বা হৃদয়কে সংবেদনশীল রাখা– সেটা ক্রমাগত চর্চার ব্যাপার। এক জীবনে শিল্পীস্তরে মানুষকে সবসময় থাকা সম্ভব নয়, কাজেই কখন সে শিল্পী আর কখন শিল্পী নয়– এটি অবশ্যই বিচার্য হওয়া প্রয়োজন।

দুই

ব্যক্তির সংবেদন দিয়েই সমাজের সংবেদন সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি ও সমাজকে পদ্ধতিগত সংবেদনশীল করতে প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের। এরিস্টোটলের মতে, 'সাধারণ জীবনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের জন্ম হয় কিন্তু উন্নত জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের

অব্যাহত অস্তিত্ব।' এই ক্রমাগত বা অব্যাহত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে উন্নত জীবনের বিষয়টি যেমন যুক্ত, একইভাবে উন্নত জীবনের সঙ্গে উন্নত সংস্কৃতি সৃষ্টির বিষয়টি যুক্ত। আর উন্নত সংস্কৃতি নির্মাণের অনিবার্য শর্ত হচ্ছে শিল্পের সৃষ্টি ও তার চর্চা। এই শিল্পেরই প্রধান শর্ত সংবেদন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত জীবনের প্রধান শর্তও আসলে সংবেদন।

প্রশ্ন হল, রাষ্ট্র সংবেদনশীল না হলে কী হয়? রাষ্ট্রও কর্কশ এবং বর্বর হয়ে যায়। ব্যক্তি বর্বর হলে অন্য ব্যক্তির সেটা দুঃখ-কষ্টের কারণ হয় আর রাষ্ট্র বর্বর হলে অন্য রাষ্ট্রের বা নিজ রাষ্ট্রেরই বৃহৎ জনগোষ্ঠির দুঃখ-কষ্টের সেটা কারণ হয়। রাষ্ট্রের অব্যাহত অস্তিত্বের সাথে বর্বরতার অস্তিত্ব তখন স্থায়িত্ব পেয়ে যায়। শিল্প পারে এই বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা করতে। কোনো কোনো বড় শিল্পী না বুঝেই বলেছেন যে, শিল্প সমাজকে বদলাতে পারে না। যেমন সত্যজিৎ রায় বলেছেন, চলচ্চিত্র সমাজবদলের হাতিয়ার নয়। কিন্তু সত্যজিতের কিছু সংখ্যক চলচ্চিত্রের মধ্যে যে মানবিক দাবি ও সংবেদন রয়েছে সেটা ব্যক্তিকে পাল্টানোর জন্য উপযোগী। আর ব্যক্তি পাল্টালেই সমাজটা পাল্টাবে। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে, সত্যজিতের কথা তার নিজের চলচ্চিত্রের বেলাতেও খাটে না। আর ঋত্বিক ঘটক বা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের চলচ্চিত্র তো সমাজ ও রাষ্ট্রকে বদলানোর প্রত্যাশা নিয়েই নির্মিত। ইরানের মাজিদ মাজিদি'র চলচ্চিত্র কি সারাবিশ্বকে তুমুল একটা নাড়া দেয় নি?

একইভাবে কবিতা পৃথিবীর মানুষকে নানাভাবে পরিশুদ্ধ করেছে, এটা এতই প্রতিষ্ঠিত কথা যে, যার প্রমাণ হাজির করাও নিষ্প্রয়োজন। যেমন মাহমুদ দারবিশ তার 'ক্রোধ' কবিতায় লিখেছেন:

. . . . . .
উৎসারিত আগুনের তীব্র শিখা
আমার দুঠোঁটের ফাঁকে
. . . . . .
আমারই দুঃখ আমারই বেদনার প্রতি
নিয়েছি আমি আনুগত্যের শপথ
. . . . . .

(ভাষান্তর :সলিল লাহা)

আবার লোরকা তার 'নতুন গান' কবিতায় লিখেছেন:

'এমন একটি গান দিয়ে যেতে চাই
কালের নিথর জলে ছুঁড়বে পাথর,
হাসিতে ভরসা দেবে, ছেঁড়াগুলি জুড়বে আবার।'

(ভাষান্তর : অমিতাভ দাশগুপ্ত)

এরকম প্যালেস্তাইনি কবি সালেম জুবরান, সামী-এল-গাশেম, ফরাসি কবি গিয়ম আপোলিন, জাক প্রেভের, ইতালীয় কবি দিনো কামপানা, সালভাতোর কোয়াসিমোদো কিংবা জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকে, ব্রের্টল্ট ব্রেহখ্ট কিংবা স্প্যানিশ কবি পাবলো নেরুদা, অকটাভিও পাজ কিংবা রুশ কবি বরিস পাস্তেরনাক এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আর বাংলা কবিতা তো হাজার বছরের অধিক সময়কাল ধরে এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়কে উজ্জীবিত করে রাখার কাজ করে যাচ্ছে। নজরুল, সুকান্ত, বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এরকম কত কত নামই তো নেয়া যায়। কিন্তু সকল কবির সকল কবিতার মধ্যে সমানভাবে যে মানবিক দাবি, সাম্যের দাওয়াত আর সংবেদন সমানভাবে থাকবে তা-তো নয়! তবে যে সকল কবির কবিতায় এসব উপাদানের আধিক্য লক্ষ করার মতো, তাদের আমরা অবশ্যই আলাদা করতে পারি। কে কবি– এই সংক্রান্ত জীবনানন্দের মতের বর্ধিত অংশ হয়তো এমন হতে পারে–

যারা কবি, তারা কতটা কবি
যারা পুরো কবি, তারা কতটা দার্শনিক কবি
কতটা মানবিক কবি, কতটা শ্রেণী-সচেতন কবি?

গানের মধ্যে আবার বিষয়টি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করলেও নিশ্চয়ই অনেক গানই সমাজ বদলের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। চর্যাগীতি, নাথগীতি, পদাবলী থেকে শুরু করে মঙ্গল গান, ব্রহ্মা সংগীত, প্রীতিগীতি, রবীন্দ্র-নজরুলের গান, লালন সংগীত, জালাল গীতিকা– এ সকল গানের মর্মকথা মানুষকে কেন্দ্র করেই এবং এসব গানের উদ্দেশ্য মানুষকে ক্রমশুদ্ধ করে তোলা, মানুষকে সংবেদনশীল করে তোলা।

এরকম চিত্রশিল্প, যাত্রা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ সচেতন হয়েছে যুগে যুগে, মানুষকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে যে সে মানুষ। মানুষের মনের মধ্যে সচেতন বা অচেতনভাবে নানা মন্দ ও ভালো কল্পনা ও ভাবনা চলতে থাকে; শিল্প সেই সব ভাবনার দৃশ্যগত শ্রবণগত সর্বোপরি অনুভূতিগত প্রকাশ ঘটায়; যার মূল উদ্দেশ্য ও প্রবণতা মানবিকতা কী সেটা এবং ঐ সংবেদন। সংবেদন ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ, রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজ করে এগুলোকে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত রাখে অর্থাৎ ব্যক্তি শিল্পসৃষ্টি ও চর্চার মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল হলেও সমষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে রাষ্ট্র যদি সংবেদনশীল হয় তার সুফলও ভোগ করে পর্যায়ক্রমে সমাজ, সমষ্টি ও ব্যক্তি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচক লায়োনেল ট্রিলিঙ অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তার Beyond Culture বইতে যে, 'আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকেরা যতটা উৎসাহের সঙ্গে উদারনীতির দিকে এগুচ্ছেন, সাহিত্যস্রষ্টারা প্রায় ততটা উৎসাহের সঙ্গেই ছুটছেন প্রতিক্রিয়াভিমুখে। পাঠক আসছেন এগিয়ে কিন্তু

লেখক যাচ্ছেন পিছিয়ে।' উপরিউক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার 'প্রতিক্রিয়াশীলতা, আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে' গ্রন্থে। ঐ বইয়ে তিনি আরো লিখেছেন, ডব্লু, বি, ইয়েট্স (১৮৬৫-১৯৩৯), এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২), টি, এস, এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), এবং যোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪), জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) ও ডি, এইচ, লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) এই অসাধারণ লেখকেরা অতি সাধারণ কারণ এদের অন্তর্গত কেন্দ্র প্রতিক্রিয়াশীলতায়। যেমন, পাউন্ড তার A Few Dont's গ্রন্থে বলেছেন, 'It is better to present one image in a life time than to produce voluminous works'– তিনি জীবনকে প্রভাবিত করতে চান না, শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চান। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দেশের মানুষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন মুসোলিনির ইতালি থেকে বেতারে। ফ্যাসিবাদের পক্ষে প্রচারক ছিলেন তিনি। এ রকম বহু উদাহরণ হাজির করা যায়। আমাদের এখানেও শিল্পীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল অনেকে আছেন, এই প্রেক্ষিতে আমরা এই কাজটি অবশ্যই পারি, তাদের একটি তালিকা অন্তত তৈরি করতে পারি।

তিন

শিল্পের বিশ্লেষণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। কেউ শিল্পের সৌন্দর্য নিয়ে, কেউ ছন্দ ও ব্যঞ্জনা নিয়ে, কেউ ইতিহাস নিয়ে আবার কেউ ভাষা, রঙ, শব্দ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধরা যাক একটি দালান গড়ে তোলার জন্য ইট, বালি, সুরকি, সিমেন্ট, চুনা, ডিস্টেম্পার ইত্যাদির প্রয়োজনের কথা বলা হল কিন্তু রডের কথা যদি বলা না হয়, তাহলে কিন্তু দালান গড়ে তোলা যাবে না। কেননা রডের ওপরই ভর করে দালান দাঁড়িয়ে থাকে। শিল্পের অন্য সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কম-বেশি অনেকেই হয়তো রাজি কিন্তু শিল্পের দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে যেন প্রায় সকলের মধ্যেই আগ্রহের ঘাটতি। অথচ শিল্পের দর্শন হল ঐ দালান তৈরির রডের মতো। সব কিছু থাকা সত্ত্বেও রড না থাকলে দালান হবে না। একইভাবে দর্শনশূন্য বা চিন্তাশূন্য শিল্প অসারই বটে। মাছের মধ্যে যে কাঁটা থাকে কিংবা ফুলের মালার মধ্যে যে সুতা থাকে, শিল্পের দর্শনকেও এই কাঁটা বা সুতার সঙ্গে তুলনা দেয়া যেতে পারে।

শিল্পের মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিল্পের এই দর্শনকে আবার পলিটিসাইজড না করা গেলে সেই শিল্প ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যায়। শিল্পের দর্শন রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যে দেশ বা অঞ্চলের রাজনৈতিক চেতনা গণমানুষের মধ্যে বা শিল্পীর মধ্যে যেভাবে কাজ করে সে দেশ বা অঞ্চলের শিল্পের দর্শন সেই ধরনের রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। লাতিন আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইরানের শিল্পের সঙ্গে ওয়াশিংটনের শিল্পের দর্শনের মধ্যে তাই এত ফারাক। কাজেই আমাদের এখানেও শিল্পের দর্শন নিয়ে যারা গড়পরতা, পলায়নপর বা ঝুঁকি এড়ানোর উদ্দেশ্যে কথা বলেন, তাদের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে এরা ঐ ওয়াশিংটনেরই সূত্রধর কিংবা

উপনিবেশের পক্ষে সেই সময়ে যাদের অবস্থান ছিল সেই সব ঘৃণ্য বাঙালদেরই এরা বংশধর। এরা পুঁজি, শোষণ, পরাধীনতা, শ্রেণীবোধ এসব বিষয় যেন বোঝেন না এবং চুপ করে থাকেন; নিজেদের অবস্থান প্রকাশ্যে জোর গলায় বলেন না, হয়তো ভয়ও পান। হয়তো নিজেদের অবস্থানের কথা স্বীকার করতে গর্ববোধও করেন না। কিন্তু তাদের সৃষ্ট বা আলোচিত শিল্পও তো শিল্প! রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের মতো শিল্পীর ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকাও কিন্তু আজ প্রশ্নবিদ্ধ; বিষয়টি হয়তো কোনো কোনো শিল্পীকে সংগোপনে ভাবায়।

শিল্পে মানবিক দাবি বা মানবিক বোধ থাকবেই। কিন্তু যে শিল্পে শ্রেণীবোধ নেই সেই সব শিল্প একটি মূল শর্ত পূরণ থেকে বঞ্চিত থাকে। আর সেই শিল্পই তো মহান যে শিল্প অধিক মানুষের কথা বলে। যে শিল্প নিতান্ত ব্যক্তিগত সেটা মনস্তাত্ত্বিক কারণে, ব্যক্তিক আনন্দ-দুঃখের অনুভবের কারণে আদৃত এমনকি উৎকৃষ্টও হতে পারে; কিন্তু যে শিল্প দুঃখী শ্রেণীর কথা বলে না, কষ্টে থাকা এক পাল মানুষের বঞ্চিত হওয়ার পেছনের সত্যকে তুলে ধরে না সে শিল্প গৌণ শিল্প। শিল্প (Art) নিয়ে দেশীয় বণিকদের সমান্তরালে বিশ্বব্যাংক, আই. এম. এফ. কী ভাবছে? জাতিসংঘ বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-ই বা কী ভাবছে? Industry যে শিল্প, সেই শিল্পের সাথে Art যে শিল্প– এই দুয়ের পার্থক্য কি তাদের কাছে আছে? নাকি উভয়ই গলাধঃকরণ করবে তারা। সবই যখন রাজনীতি-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত তখন শিল্পকে (Art) তারা যে বাদ রেখে হিসেব-নিকেশ করছে না, হয়তো এটাই স্বাভাবিক। অথবা হয়তো এটাই নিশ্চিত।

প্র ব ন্ধ

ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্শন

আ মি নু ল ই স লা ম

দর্শনের অভীষ্ট লক্ষ্য জীবন– ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণপুষ্ট মহৎ মানোবচিত জীবন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মের লক্ষ্যও ঠিক তা-ই। 'ধর্ম' কথাটি উদ্ভূত হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। 'ধৃ' মানে ধারণ করা। সুতরাং ব্যুৎপত্তির দিক থেকে ধর্ম হল সেই ব্যবস্থা যা মানুষকে ধারণ বা পোষণ করে। ইংরেজি *রিলিজিয়ন* শব্দটিও উৎপন্ন *রিলিজিও* মূল থেকে। রিলিজিও মানে যুক্ত করা। এ অর্থে রিলিজিয়নের মৌলিক কাজ মানুষকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করা। অন্য কথায়, মানুষের সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা; মানুষকে ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা এবং পরিণামে পরমসত্তার সন্ধান দেওয়াই ধর্মের কাজ। এ যুক্তিতেই ধর্ম বলতে বুঝানো হয় এমন এক বা একাধিক অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসকে যা মানুষের ভাগ্য ও গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসই ধর্মের মূলমন্ত্র। এ বিশ্বাস থেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মনে সৃষ্টি হয় সেই অদৃশ্য সত্তার ওপর নির্ভর করার এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা। এ বিশ্বাস থেকেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মনে ক্রমশ গড়ে ওঠে ভীতি, ভক্তি, প্রেম ও আনুগত্যের অনুভূতি। ধর্মের এই ব্যাখ্যা পৃথিবীর সব কটি প্রধান ধর্মের বেলায় প্রযোজ্য।

তবে ধর্মের একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যাও রয়েছে। এ ব্যাখ্যা থেকেই ক্রমশ বিকশিত হয়েছে নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি বিবিধ মতবাদ। যারা ধর্মের প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী তাঁদের মতে কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস না করেও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাপ্রদান সম্ভব। এ ধরণের একটি মত সমাজতাত্ত্বিক মত নামে পরিচিত। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে এমিল ডুরখেইম ও অন্য কয়েকজন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এ মত প্রবর্তন ও প্রচার করেন। এ মতে, মানুষ যেসব দেবতার উপাসনা করে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনো দেবতা নেই। এসব তথাকথিত দেবতা সমাজসৃষ্ট কল্পিত সত্তা ছাড়া আর কিছু নয়। আর এদেরই ব্যবহার করা হয় সমাজের সাধারণ

মানুষের বিশ্বাস ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে। ধর্মে যে অতীন্দ্রিয় সত্তার কথা বলা হয় এবং যাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উৎস বলে মনে করা হয়, তা আসলে সুপারন্যাচারাল বা অতিপ্রাকৃত কিছু নয়, বরং প্রকৃতির ও মানবসমাজেরই ব্যাপার। ধর্মে মানুষের প্রার্থনা ও আনুগত্যের দাবিদার যে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের কথা বলা হয় সেরকম ঈশ্বর বলেও আসলে কেউ নেই। ঈশ্বর মানবসমাজ ও মানুষেরই প্রতিফলন। আমাদের চারদিকে যে সামাজিক সত্তা বিরাজমান, তা-ই প্রতীকায়িত হয়েছে ঈশ্বরের নাম ও ধারণায়।

দুই

এ মতের পূর্বাভাস লক্ষ করা যায় উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তাবিদ অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬) ধর্মতাত্ত্বিক মতের মধ্যে। *বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* নামক গ্রন্থে তিনি গতানুগতিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সমালোচনা এবং বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের সমর্থন করেন। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কাজ করাই ধর্ম, না করাই অধর্ম। জীবনে প্রার্থনার কোনো গুরুত্ব আছে বলেও তিনি মানতে নারাজ। সহজ সরল গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা তিনি তাঁর এ ধারণা প্রমাণের চেষ্টা করেন। সমীকরণটি এরকম :

পরিশ্রম = শস্য
প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য
অতএব প্রার্থনা = শূন্য

একই ইহজাগতিক ও প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন উনিশ শতকের অপর এক বাঙালি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। এ মনীষীর বিশেষত্ব এখানে যে, তিনি দর্শনে এসেছেন বিজ্ঞানের পথে। চার্ল্‌স ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদীদের ন্যায় তিনি প্রকৃতিবাদের প্রতি অনুগত। 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত' কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তায় তাঁর আস্থা নেই। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে 'মির‍্যাক্‌ল' বা অলৌকিক ঘটনা বলে কিছু আছে বলে মানতেও তিনি নারাজ। এখানে তিনি স্পষ্টতই অক্ষয়কুমার দত্তের অনুসারী।

মনোসমীক্ষণ (psychoanalysis) পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ধর্মবিশ্বাসকে অভিহিত করেছেন মানুষের আদিম ইচ্ছাপূরণের প্রচেষ্টা এবং এক ধরনের অধ্যাস (illusion) বলে। ঝড় বন্যা ভূমিকম্প আধি-ব্যাধি, প্রভৃতি প্রাকৃতিক অভিশাপের বিরূদ্ধে মনের আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টাই ধর্ম। এসব রূঢ় শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃতি যখন মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, কল্পনাপ্রবণ মানুষ তখনই এসব বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে রূপান্তরিত করে ফেলে মূর্ত ও ব্যক্তিগত শক্তিতে। এটা মানুষের একটা মারাত্মক ভুলধারণা। আর তাই এ থেকে উত্তরণলাভ করা তার জন্য

জরুরি। এ কাজ সে করতে পারবে তখনই যখন সে জগৎ ও জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখী হবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে।

ধর্মসংক্রান্ত এসব বিভিন্ন ধারণা সত্ত্বেও সাধারণত ধর্ম বলতে বোঝায় পৃথিবীর সব ক'টি প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে। এ মতে, জগতের এমন একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আছেন যিনি তাঁর নির্বাচিত ও প্রেরিত নবী-পয়গম্বরদের মাধ্যমে জারি করেন এমনসব নির্দেশ যেগুলো বহন করে তাঁর স্বরূপের এবং জগৎ ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রেমের নিদর্শন। ধর্মের সব বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়োজিত মানুষের কল্যাণে এবং মানুষকে মুক্তির পথপ্রদর্শনে। ধর্মের সব অবতার, সব নবী-পয়গম্বর স্রষ্টার প্রতিনিধি, তাঁরই প্রত্যক্ষ বার্তাবহ ও প্রেরিতপুরুষ। তাঁদের প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্ম শুধু স্রষ্টার একত্ব কিংবা অন্য কোনো বিশেষ গুণের আলোচনায় সমাপ্ত নয়, বরং নিয়োজিত মানুষের জন্যে একটি উন্নত জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন ও রূপায়ণের কাজে। ধর্মবেত্তাদের এই ঈশ্বরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা অবশ্যই জনকল্যাণমূলক। মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণবিধানই ধর্মের লক্ষ্য। এদিক থেকে যিনি কল্যাণপথের অভিসারী, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি।

তিন

ধর্মের একটা আচার অনুষ্ঠানের দিক আছে বটে। কিন্তু যথার্থ ধর্ম আচারসর্বস্ব নয়; ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটিকে বড় করে দেখাও উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, যে ধর্মের পরিবর্তনে অনুমোদন নেই, যা আনুষ্ঠানিকতায় ভরপুর, সেই ধর্ম প্রকৃত ধর্ম নয়, বরং আচারপূজা মাত্র। "তা-ই ধর্ম যা জীবনের বিকাশের সহায়ক, আর তা-ই অধর্ম যা তেমন সাহায্য করে না।" এ ধর্মবোধের উদ্বোধন ঘটে জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে, এবং এর মূল লক্ষ্য থাকে মানবকল্যাণের দিকে। এই ধর্ম মানবধর্ম, এবং কাজী আবদুল ওদুদ একেই অভিহিত করেছেন বিকাশধর্ম বলে। অকপট সত্যাশ্রয়িতা এবং জগতের সঙ্গে জীবনের নিবিড় যোগ বলতে যা বোঝায় এ ধর্ম তারই নামান্তর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ধর্মকে অবলম্বন করেন মানবমুক্তির উৎস ও আকার হিসেবে। তাঁর মতে, ধর্ম মানেই মানবধর্ম। "ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব। যেমন আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম পশুত্ব, তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।"[১] এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়; মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। যে ধর্মকর্মের অর্থ মানুষের অনিষ্টসাধন, তা প্রকৃত ধর্ম পদবাচ্য নয়, ধর্মের ছদ্মবেশী কুসংস্কার মাত্র। পৃথিবীর সব ক'টি ধর্মগ্রন্থেই একথার সমর্থন পাওয়া যায়। ধর্মপ্রচারকগণ স্রষ্টার প্রেরিতপুরুষ হয়েও উদ্বুদ্ধ ছিলেন মানবকল্যাণের প্রেরণায়। আর এজন্যই তাঁরা মানবজাতিকে দিতে পেরেছেন ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণপথের দিগ্‌দর্শন।

দর্শন ও ধর্ম উভয়েই চায় পরমসত্তার সন্ধানলাভ করতে, সচ্চিদানন্দ পেতে এবং একইসঙ্গে ব্যাপক মানবকল্যাণে ব্রতী হতে। এ দিক থেকে উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন হলেও সেই লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন বটে। দর্শনের মূল বাহন যুক্তি ও বিচার; কিন্তু ধর্মের ভিত্তি ও প্রাণকেন্দ্র বিশ্বাস ও ভক্তি। দর্শনে পরমসত্তাকে দেখা হয় বৌদ্ধিক চিন্তার উপজীব্য ও বিচার্য হিসেবে; কিন্তু ধর্মে সেই সত্তাকে গণ্য করা হয় অনাবিল বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উপভোগের ব্যাপার হিসেবে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতে হয় তার ধর্মে নির্দেশিত সব বচন, বিধি-বিধান, সব আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ধারণাকে, এবং সেগুলোর আলোকেই পরিচালিত করতে হয় তার বিশ্বাস ও আচরণকে। যেমন, স্বাধীন যুক্তি-বিচারের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের পরিবর্তে ধার্মিক ব্যক্তি তাকে মেনে নেন সরল বিশ্বাসে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা সবাই ঈশ্বরের মধ্যে আছি। সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খণ্ড বুদ্ধির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে হয়। আমরা যে বিষয়মুখ বস্তুজগতে আছি, যেসব আত্মীয়-পরিজন নিয়ে আছি, তাদের অস্তিত্ব যেমন যুক্তি-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তেমনি আমরা যে ঐশী সত্তার মধ্যেই আছি, তাঁর অস্তিত্বও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ঈশ্বর নিজেকে অভিব্যক্ত করেন প্রত্যাদেশের (revelation) মাধ্যমে, দার্শনিক যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়ে নয়। আর ধর্মশাস্ত্রে বিধৃত এই প্রত্যাদেশের বৈধতায় বিশ্বাস ধর্মের এক বাধ্যতামূলক শর্ত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে-কথা বলা হল, তা সমানভাবে প্রযোজ্য পরলোক, বেহেশ্‌ত, দোযখ প্রভৃতি সব ধর্মীয় ধারণার বেলায়। ধর্মের যে জিনিসটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী তা হল বিশ্বাস– যার তুলনায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে বুদ্ধি বা যুক্তির ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। আর এজন্যই আবশ্যিক হয়ে পড়ে ধর্মীয় বিশ্বাসাদির নিরাবেগ ও সবিচার পর্যালোচনা।

একথা কিছুতেই ভাবা ঠিক নয় যে, ধর্মে বুদ্ধি বা জ্ঞানের কোনো স্থান নেই। আসলে আবেগ বলি আর অনুভূতি বলি, এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছুটা হলেও জ্ঞানবুদ্ধির সংমিশ্রণ থাকে। আর এজন্যই নৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আমরা প্রতিনিয়ত শনাক্ত করি জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে। এভাবে মানবীয় আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে জ্ঞান ও বুদ্ধির যদি সম্মিলন না ঘটত, তা হলে অনুভূতি অবনত হয়ে যেত যুক্তিহীন অন্ধ প্রবৃত্তিতে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যে জ্ঞানবুদ্ধি যুক্ত, তা পরিণত বা পরিস্ফুটিত নয়। আর এজন্যই নৈতিক, নান্দনিক এবং বিশেষত ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে পরিস্ফুটিত ও পাকাপোক্তভাবে পরীক্ষা করে নিতে হয় দার্শনিক যুক্তি-বিচার দ্বারা। প্রগাঢ় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থেকে যে আবেগের উদ্ভব, তাকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করতে হয় দার্শনিক যুক্তি-বিচার দ্বারা। আসলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে একটা নিকট নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান। ধর্ম যদি দর্শনের সমালোচনার সম্মুখীন

হতে না চায়, তা হলে তা আবদ্ধ হয়ে যায় তার নিজস্ব সংকীর্ণ জগতে; সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য দিকের সঙ্গে যদি ধর্ম যুক্ত না হয়, তা হলে তা অনিবার্যভাবে নিপতিত হয় নির্বিচার বিশ্বাস ও রহস্যবাদে।

অন্যদিকে দর্শন যদি ধর্মপ্রবর্তিত জগৎ ও জীবনের মৌলিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে ধর্মীয় দিশা পরিহার করে শুধু পার্থিব সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে তা বিচ্যুত হয়ে যায় দার্শনিক অবস্থান থেকে এবং অধঃপতিত হয়ে যায় নিষ্প্রাণ নির্জলা আকারবাদে। এমতাবস্থায় অতি স্বাভাবিকভাবেই দর্শন নির্বাসিত হয়ে যায় মানবজীবনের বৃহত্তর পরিমণ্ডল থেকে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি অভিব্যক্ত করে মানব অস্তিত্বের মূর্ত প্রশ্নাবলীকে এবং চিন্তাশীল মানুষকে আকৃষ্ট করে সেসব প্রশ্নের সঠিক বিবেচনায়। তেমনি মানবজীবনের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও অন্তর্দৃষ্টি দর্শনকে সমৃদ্ধ করে চিন্তা-ভাবনার অজস্র উপকরণ ও উপাত্ত দিয়ে। তাই দর্শন যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ধর্মের সংস্পর্শ থেকে তখনি তার অভ্যন্তরে দেখা দেয় কিছু অন্তঃসারশূন্য দৃষ্টিভঙ্গি। এ বিপথগামী দর্শনই উপেক্ষা করে জগৎ ও জীবনের মৌল প্রশ্নাবলীকে, এবং তখনই তা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে বিভিন্ন তুচ্ছ প্রশ্নাবলীর প্রতি।

চার

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে দর্শনের শরণাপন্ন হতে হয় তার অবিচল বিশ্বাসকে বাতিলের জন্য নয়, বরং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য। জীবনে প্রতিনিয়ত এমন অনেক নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে, যেগুলোর সমাধানের জন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রকেই নির্ভর করতে হয় ধর্মশাস্ত্রের ওপর। কিন্তু পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে জ্ঞানের এসব খুঁটিনাটি সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, সে আশা করাটাও বোধ করি ঠিক নয়। এমতাবস্থায় ধর্মে বিধৃত মৌল নীতিমালার প্রতি আস্থাশীল থেকেই, এবং ধর্মবিশ্বাসের পরিসরেই, অনুসন্ধান করতে হয় জীবনের বিচিত্র সমস্যার যৌক্তিক সমাধান। আর তা যখন করা হয়, তখনই সেতুবন্ধ রচিত হয় বিশ্বাস ও বুদ্ধির, প্রত্যাদেশ ও প্রজ্ঞার তথা ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে। এখানেই ধর্ম ও দর্শনের মাঝখানে আবির্ভাব ঘটে ধর্মতত্ত্ব (theology) ও ধর্মদর্শনের।

এদিক থেকে ধর্মতত্ত্ব বলতে বোঝায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের তরফ থেকে ধর্মের স্বরূপ ও আচার-অনুষ্ঠানাদিকে বুদ্ধির আলোকে অনুধাবন ও উপলব্ধির প্রচেষ্টাকে। ধর্মের স্বরূপ ও ক্রিয়া, জীবনে ধর্মীয় চেতনার ভূমিকা ও উপযোগিতা প্রভৃতির আলোচনা ও পর্যালোচনাই ধর্মতত্ত্বের কাজ। ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুরাগ, স্রষ্টা, দেব-দেবী, আত্মা, পরলোক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মীয় বিষয়ের যৌক্তিক আলোচনা ও পর্যালোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মতত্ত্বের সাহিত্য ও ইতিহাস। এদিক থেকে ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন পরস্পরবিরোধী ও বিচ্ছিন্ন

নয়, বরং ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাদের অনুশীলনপদ্ধতি ভিন্ন, কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

পাঁচ

দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য থাকা সত্ত্বেও ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যেমন রয়েছে কিছু সাদৃশ্য, তেমনি দর্শন ও সাহিত্যের, বিশেষত কাব্যের, মধ্যেও রয়েছে বেশকিছু সাদৃশ্য। কবি কথার অর্থ ক্রান্তদর্শী।[৩] কোনো বস্তুর শেষ সীমা দেখার ক্ষমতা যার আছে তিনিই কবি, তিনিই ক্রান্ত-দর্শী। দার্শনিকের লক্ষ্যটাও অনেকটা তা-ই। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি দর্শন জগৎ ও জীবনের পরমতত্ত্বের অনুসন্ধানে নিয়োজিত। দর্শনের যেমন সাহিত্যেরও তেমনি উপজীব্য জগৎ ও জীবন। তবে তাদের আলোচনার পদ্ধতি ভিন্ন। দর্শন অগ্রসর হয় যৌক্তিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পথে; আর সাহিত্য, বিশেষত কাব্য, প্রধানত নির্ভর করে অনুভব বা হৃদয়াবেগের ওপর। দর্শন তার বিষয়বস্তুকে পরিমাপ করে যুক্তির নিরিখে, আর কাব্য-সাহিত্যের আবেদন ভাবাবেগআপ্লুত হৃদয়তন্ত্রীর দরবারে। অন্যভাবে বলা যায়, দার্শনিক চিন্তার বাহন মস্তিষ্ক, আর কবির অবলম্বন হৃদয়।

এসব সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনার পর বলা যায় যে, দর্শন ও কাব্যের সম্বন্ধ দূরত্বের সম্বন্ধ নয়, বরং খুবই নিকট ও নিবিড়। এজন্যই দেখা যায় পৃথিবীর আদি রচনাবলীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যুগপৎ স্বীকৃতি পেয়েছে সাহিত্য ও দর্শন বলে, বেশকিছু লেখক নন্দিত হয়েছেন একাধারে কবি ও দার্শনিক হিসেবে। যেমন, মূলত ধর্মকথা হয়েও উপনিষদের শ্লোকসমূহ স্মরণীয় হয়ে আছে সার্থক কাব্য হিসেবে।

ছয়

বাংলাভাষার আদি সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ নামে পরিচিত। দার্শনিক রীতিতে এবং বিস্তৃত যুক্তির আঙ্গিকে পরিবেশিত না হলেও এসব গীত-রচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় জগৎ ও জীবনের এমন কিছু দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের যেগুলো বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক দার্শনিক সাহিত্যে। ভাষার দীনতা সত্ত্বেও বাগ-বৈদগ্ধ্যের কৌশলে, ছন্দ ও অলঙ্কারগত সৌন্দর্যের সংগঠনে এবং বিষয়বস্তুর বাস্তবধর্মিতায় চর্যাপদগুলো নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় দার্শনিক কীর্তির নিদর্শন।

চর্যাপদে যে সাধনপদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায় তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যক ব্যঞ্জনা পাশ্চাত্যের কিছু দার্শনিক মতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ১৫ নং চর্যার কিছু অংশ উল্লেখ করছি। এখানকার মূল বক্তব্যটা এরকম : "স্বরূপ বিচারে স্বীয় সংবেদন অলক্ষ্য– তার লক্ষণ জানা যায় না। যারাই ঋজুপথে গিয়েছে, তারাই ফিরে আসেনি। ... বালকের মতো এ'টা ও'টায় ভুল করে সোনায়-বাঁধা রাজপথ

মনে করো না। মায়া-মোহ-সমুদ্রের বুকে ঠাঁই পাচ্ছ না – সামনে নৌকা-ভেলা কিছুই যদি না দেখতে পাও ভুল করে 'নাথ'-কে (গুরুকে) কেন জিজ্ঞাসা করো না।"[৪]

সত্তা (being) ও অবভাস (appearance)-এর পার্থক্যনির্দেশের প্রচলন দর্শনের ইতিহাসে সুপ্রাচীন। চর্যাপদেও এ দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন লক্ষণীয়। যেমন ৫ নং চর্যায় পদকর্তা চাটিল বলেন :

ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন যাহী।

অর্থাৎ "এই সংসার-প্রবাহ নদী-প্রবাহের মতো গম্ভীর মায়ামোহ রচনা করে প্রবাহিত হচ্ছে। তার দু'পাশে রয়েছে অনাপেক্ষিক নিবৃত্তি এবং ঐকান্তিক প্রবৃত্তির পঙ্ককুণ্ড, মায়ামুগ্ধ চিত্ত যাতে আটকা পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে।"[৫]

এখানে যে অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তা হল এরকম: নদীস্রোতের প্রতীতি মায়াময়। নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা যেমন খণ্ডিত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি আমরা যাকে সংসার বলি তা-ও বুদবুদের মতো অসংখ্য খণ্ডিত মুহূর্তের মায়ারূপ বিশেষ। সংসারের বিভিন্ন খণ্ডিত ঘটনা আমাদের চেতনা ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে, অখণ্ড স্থায়িত্বের প্রতিভাস সৃষ্টি করে, কিন্তু পরমসত্তার সন্ধান দেয় না, দিতে পারে না। চাটিলের মতে, গম্ভীর বেগে প্রবাহিত এ ভবনদীর একটিকে ছেড়ে যেই আমরা অপরটির শরণাপন্ন হই, অমনি আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি যথার্থ জ্ঞান, পরমসত্য ও পরমার্থের পথ থেকে। অবভাস ও সত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ এবং সেই মর্মে জীবনপরিচালনা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

সাত

দার্শনিক ও কবির স্বরূপ-লক্ষণ প্রসঙ্গে একথা বলে রাখা দরকার যে, যিনি শুধু কবি, দার্শনিক নন তিনি তাঁর কাব্যে জগৎ ও জীবনের কিছু বিবরণ দেন মাত্র। আর যিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক (philosopher-poet) তিনি তাঁর কাব্যে জগৎ ও জীবনের নিছক বর্ণনা দেন না, ছন্দ-যুক্তির সমন্বয়ে হাজির করেন এক চমৎকার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। লুক্রেটিয়াস, ওমর খৈয়াম, দান্তে, গ্যেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল–এরা সবাই ছিলেন দার্শনিক-কবি। লুক্রেটিয়াস তাঁর কাব্যে পরিবেশন করেছেন জগতের এক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজন বোধ করেছেন দেব-দেবীর ভীতি থেকে মানুষকে মুক্ত করার। তাঁর এই বক্তব্য এক দিকে কাব্যিক উৎকর্ষ এবং অন্য দিকে দার্শনিক শৃঙ্খলার এক চমৎকার নিদর্শন। অনুরূপভাবে ওমর খৈয়ামের কাব্যে জগতের যে সুখবাদী-বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেয়া যায়, তা যুগপৎ সাহিত্যিক প্রসাদগুণ এবং দার্শনিক তত্ত্বগাম্ভীর্যের প্রতীক।

তার চেয়েও আরো পাকাপোক্ত দার্শনিক-কবি হিসেবে উল্লেখ করতে হয় দান্তের নাম। 'ডিভাইন কমেডি' নামক তাঁর কাব্যগ্রন্থে তিনি জগৎসংসারের কাঠামো ও সত্তা,

মানুষের উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিণতি, অকল্যাণের হেতু এবং এ থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের এক চমৎকার দার্শনিক ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। তাঁর মতে, স্বর্গীয় প্রেমের দীপ্তি নিঃসৃত হয় জগতের মর্মমূল থেকে। আর এ প্রেমের লক্ষ্য হল মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করা। একই পাপমুক্তির কথা বলেছেন গ্যেটে। তাঁর মতে, এ মুক্তি আসে অভিজ্ঞতা থেকে, উৎসর্গ কিংবা আনুগত্য থেকে নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর দৃষ্টিতে দুনিয়া হাড়ে হাড়ে দুর্জ্ঞেয় এবং এখানকার সবকিছুই ভারী ও ক্লান্তিকর বোঝার মতো। অন্যদিকে ব্রাউনিং তাঁর কাব্যে বয়ে এনেছেন ঈশ্বর, প্রেম ও সত্যে বিশ্বাসের বাণী।

আল্লামা ইকবাল তাঁর কাব্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব (খুদী), স্বাতন্ত্র্য, আল্লাহর স্বরূপ, পারমার্থিক জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন, তা-ই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একজন বিখ্যাত দার্শনিক-কবি হিসেবে। এ প্রসঙ্গে তাঁর আসরার-ই-খুদী ও রুমুজ-ই-বিখুদী– এ দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে আত্মসত্তার (খুদী) ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইকবাল-দর্শনের সমগ্র কাঠামো, তা-ই বিশদভাবে বিধৃত হয়েছে এ দুটি ফার্সি কাব্যগ্রন্থে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ক্রমবিকশিত হয়েছে ধর্মীয় প্রত্যয় ও অনুভূতিকে কেন্দ্র করে। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর কবিহৃদয়ে যুক্তির চেয়ে অনুভূতি ছিল প্রবল। কিন্তু তাই বলে হৃদয়াবেগের চাপে তিনি দার্শনিক যুক্তির পথ পরিহার করেননি। সসীম ও অসীমের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যে কবিতার অবতারণা করেছেন নিঃসন্দেহে তা যুগপৎ স্বীকৃতি পায় অনবদ্য কাব্য ও যথার্থ দর্শন হিসেবে। উপনিষদের ব্রহ্মের কথাই বলি, ভক্তের ভগবানের কথাই বলি কিংবা তাঁর নিজের জীবনদেবতার কথাই বলি, এদের সবাইকেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের মনে ও প্রকৃতিতে অনুস্যূত সত্তারূপে। কবিগুরুর ভাষায় :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।

একই তত্ত্ব বিধৃত হয়েছে এ কয়েকটি চরণে :

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

রবীন্দ্রনাথ জগৎসংসারকে দেখেছেন এক অনন্ত প্রেমের লীলা হিসেবে। আবার সসীম মানুষকেও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন প্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে এবং পূর্ণতার সাধন

দ্বারা সমাজ রাষ্ট্র তথা সমগ্র মানবতার কল্যাণসাধনে ব্রতী হতে। তাঁর মতে, পরমসত্তা সর্বব্যাপ্ত। আমরা সবাই তারই অংশ। সুতরাং একক মনুষ্যত্বের মধ্যে মুক্তি নেই, মুক্তি নিহিত সমগ্র মানবসংসারের পরিপূর্ণ প্রকাশে। একটি প্রদীপ যেমন রাতের অন্ধকার ঘুচাতে পারে না, তেমনি একক ব্যক্তির চেষ্টায়ও সাধিত হয় না বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক কল্যাণ। এর জন্য প্রয়োজন সব মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতা।

পরিশেষে এ-ও বলে রাখা দরকার যে, দর্শনের পথ যুক্তি-বিচারের পথ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল যুক্তি দিয়ে মনকে নিঃসংশয়, দ্বিধামুক্ত ও পরিতৃপ্ত করা যায় না। এর জন্যে প্রয়োজন অখণ্ড অনুভূতি ও অনাবিল হৃদয়াবেগ, যা কিনা কাব্য-সাহিত্যের মূল অবলম্বন। যে রচনায় এক দিকে সাহিত্যিক আনন্দ-অনুভূতি এবং অন্য দিকে দার্শনিক যুক্তি-বিচারের সার্থক সমন্বয় ঘটে, সে রচনাকর্মই মর্যাদা পায় সুসাহিত্য ও প্রকৃত দর্শনের এবং সেই কাব্য-সাহিত্যের রচয়িতাই লাভ করেন দার্শনিক-কবির অভিধা ও মর্যাদা।

আট

সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কালচার। ইংরেজি সাহিত্যে কালচার কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষভাগে। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের কাজ যেখানে প্রকৃতির প্রতি অনুগত থেকেই প্রকৃতিকে জয় করা, সেখানে কাব্য-সাহিত্য তথা কালচারের লক্ষ্য সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা মানবমনকে প্রকৃতির যান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত করা ও সৃজনশীল জীবনের সন্ধান দেয়া। কর্ষণ (কালটিভেশন) বা চাষবাসের মাধ্যমে একটা জমিকে যেভাবে ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলা হয়, তেমনি কৃষ্টি বা সাংস্কৃতিক কর্মধারার মাধ্যমে মানুষের অপরিশীলিত চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণকে পরিশীলিত করা হয়, মানুষের মনকে প্রেম-প্রীতি, সত্য-সুন্দর-কল্যাণের চর্চায় নিযুক্ত করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়: "উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মানুষের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাহাই, এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম পঁষঃৎব।"

বেকন থেকে শুরু করে ম্যাথ্যু অর্নল্ড, ইমারসন প্রমুখ পাশ্চাত্যে এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে কৃষ্টি বা সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। তাঁদের মতামতের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা সবাই ছিলেন একমত; আর সেটি হল এই যে, সংস্কৃতিমাত্রই সর্বতোভাবে একটি অন্ত রলোকের ব্যাপার– সংস্কৃতি মানেই মানসিক অনুশীলন, সুরুচি ও শিষ্টাচারের চর্চা। তবে এ অর্থে যদিও সংস্কৃতির উৎপত্তি ব্যক্তিগত সুরুচি ও শিষ্টাচারে, কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটে সঙ্গীতে, কাব্যে, সাহিত্যে, ললিতকলায়, ধর্মে ও দর্শনে। এটি অবশ্য সংস্কৃতির সংকুচিত অর্থ, আর সংস্কৃতিকে এ সংঙ্কুচিত অর্থে ব্যবহারের অর্থই হল

একে নিছক চিন্তার, অনুভবের, জ্ঞানের তথা বিশুদ্ধ মননচর্চা বা চিৎপ্রকর্ষের ব্যাপার বলে বিবেচনা করা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন ও স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে স্থান দেয়া।

বলা বাহুল্য, এ মত হাড়ে হাড়ে ভাববাদী ও রোমান্টিকধর্মী। আর হালের বাস্তব-বাদী পরিবেশে তা প্রায় অচল। বিশ শতকের শেষ অবধি পৃথিবীর অবস্থা ছিল আজকের দিনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরুপদ্রব, এবং এ কারণেই হয়তো সেদিনের ভাবুক, দার্শনিক ও শিল্পী-সাহিত্যিকরা জগৎ ও জীবনকে দেখতেন ভিন্ন চোখে, ভাবালুতা ও রোমান্টিকতার রঙিন চশমায়। বাস্তবসত্তা যে আদর্শ জগৎ থেকে বহু দূরে এবং এর যে একটি রুদ্র ভয়াল রূপ আছে, তা তাঁরা অনেকটা উপেক্ষা করেন, আর এ কারণেই হয়তো তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদর্শায়িত করে ফেলতেন বাস্তবকে, সাধারণ বস্তুতে আরোপ করতেন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বিমূর্ত অতীন্দ্রিয় আদর্শকে।

কিন্তু বিশ শতক পৃথিবীর মানুষের সামনে হাজির হল বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক নতুন বার্তা, মানবতার দুঃখ-বঞ্চনার এক মর্মান্তিক তালিকা নিয়ে। দেখতে দেখতে বিশ্বময় পরিবর্তন ঘটল মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার, বদলে গেল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের চিন্তা, এবং একই সঙ্গে সংস্কৃতি সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ধারণাও গেল বদলে। এ সত্য তখন ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকে যে, সংস্কৃতির যেমন রয়েছে একটি অভ্যন্তরীণ মানসিক দিক, তেমনি আছে অপর একটি বাহ্য বাস্তব দিক। এতে যেমন রয়েছে মননচর্চা বা চিৎপ্রকর্ষের স্থান, তেমনি থাকা চাই বাস্তব জীবনবোধ ও বিষয়বুদ্ধির অবকাশ। এ পরিবর্তিত ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি বলতে শুধু সঙ্গীত, নৃত্যকলা কিংবা কাব্যচর্চাকে বোঝায় না, বোঝায় ধান-পাটের চাষ থেকে শুরু করে ভাস্কর্য, স্থাপত্যসহ সবরকম শ্রমসাধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনকর্মকে।

একথা সুবিদিত যে, চিন্তা ও ধারণাই কর্মের চালিকাশক্তি। চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হলে কেউ কখনো কোনো কাজে প্রবৃত্ত হয় না, হতে পারে না। আর সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক চিন্তাপ্রণোদিত হয়ে একটি জনগোষ্ঠী যেসব মহৎ কর্ম সম্পন্ন করে সংস্কৃতি বলতে সেগুলোর সমষ্টিকেই বোঝায়। এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে সংস্কৃতির সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ। সংস্কৃতির বেলায় যেমন দর্শনের বেলায়ও তেমনি কোনো সহজ সংজ্ঞা নির্দেশ সম্ভব নয়। কিন্তু তবু দর্শন বলতে সাধারণত বোঝায় নিরপেক্ষ বিচারশীল বা যুক্তিপ্রসূত চিন্তাকে। আর সংস্কৃতি যদি সেই চিন্তার ফল বা চিন্তাপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডের সমষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে সংস্কৃতির সঙ্গে দর্শনের যোগ আকস্মিক নয়, নিকট ও নিবিড়।

আসলে ইতিহাসের সেই ঊষালগ্ন থেকে দর্শন জগৎ ও জীবনের মৌল সমস্যাবলী সমাধানের যে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, যথার্থ সংস্কৃতি তা থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই, বরং তারই সার্থক পরিণতি। বস্তুত, যে-কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে দর্শনের প্রেরণা ও প্রাণশক্তি কার্যকর। তা যদি না হত, তা হলে কোনো সংস্কৃতিই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত না, স্থায়ী মানবকল্যাণ বয়ে আনতেও সক্ষম

হত না। যেমন ধরা যাক আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির কথা। এর মূলে যে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন এবং সেই দর্শনের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবাদ কার্যকর ছিল, তা ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানা। মধ্যযুগের ধর্মপ্রভাবিত পরিবেশে ব্যক্তির স্বাধীনচিন্তা ছিল অবরুদ্ধ এবং সমগ্র ইউরোপ নিমজ্জিত ছিল নির্বিচার বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অতলে। কিন্তু স্বাধীনচিন্তার স্বাভাবিক স্রোতকে অনির্দিষ্টকাল দাবিয়ে রাখা যায় না, আর স্বাভাবিক কারণেই রেনেসাঁ যুগের ইউরোপ ব্যাকুল হয়ে ওঠে এ অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য। দেখতে দেখতে দার্শনিকরা তৎপর হয়ে উঠলেন জগৎ ও জীবনকে স্বাধীনভাবে জানার প্রয়াসে, মানবতার স্বরূপ ও ইতিহাসকে নতুন করে আবিষ্কারের লক্ষ্যে। দর্শন সাহিত্য অর্থনীতি ভাস্কর্য শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা উন্মোচিত করলেন সৃষ্টিশীল চেতনা ও সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত, গড়ে তুললেন এক বর্ণাঢ্য ইউরোপীয় সংস্কৃতি।

এ সংস্কৃতির বিস্তার ও বিকাশের মূলে দার্শনিক চেতনা ও জীবনদৃষ্টি যে কীভাবে কার্যকর ছিল, তা আধুনিক ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ। কর্তৃপক্ষের নির্বিচার ও নিঃশর্ত নির্দেশ পরিহার করে সার্বভৌম বুদ্ধিকে জ্ঞানানুশীলন ও সত্যানুসন্ধানের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কত দার্শনিককে যে বেদনা ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, কত যে আত্মবলিদান করতে হয়েছে, তা আজ কারো অজানা নয়। সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া যে কোনো সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশ ঘটে না, একথা আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির বেলায় যেমন সত্য তেমনি সত্য অন্য সব সংস্কৃতির বেলায়।

নয়

সংস্কৃতির সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ নিয়ে যেমন, ধর্মের সম্বন্ধ নিয়েও তেমনি প্রশ্ন ওঠে। কেউ কেউ এমন কথাও বলতে চান যে, এ দুটি বিষয় আসলে এক। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষত এ জন্য যে, ধর্ম (বিশেষত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম) প্রধানত একটি বিশ্বাসের ব্যাপার। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানমাত্রই বিশ্বাসকেন্দ্রিক ও অনুভূতিপ্রধান। ধর্মের অনুসারীকে কিছু দৈব অতীন্দ্রিয় বিষয় সরল বিশ্বাসে মেনে নিতে হয়, এবং তার কর্ম ও আচরণকে পরিচালিত করতে হয় ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আলোকে। অন্য দিকে সংস্কৃতি বলতে আমরা প্রত্যাদৃষ্ট বা পূর্বনির্দিষ্ট কিছুকে বুঝি না – সংস্কৃতি নিছক কোনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়। সংস্কৃতির পরিসর আরো ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। সংস্কৃতি ধর্ম থেকে প্রেরণালাভ করতে পারে বটে, কিন্তু এর পরিপূর্ণ বিকাশ ধর্মের আইন-অনুশাসন ও যাগযজ্ঞকে ছাড়িয়ে যায়। সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হয় বিভিন্ন খাতে, এবং বিকাশ ঘটে একটি জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, নান্দনিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র কর্মকাণ্ডে।

তবে ধর্ম ও সংস্কৃতি উভয়েরই লক্ষ্য জীবন। এবং একই জীবনকে কেন্দ্র করেই যেহেতু উভয়ের উদ্বোধন, আবার জীবনের লক্ষ্যেই যেহেতু উভয়ের গতিবিধি, সে

কারণেই তারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, বরং নিকট ও নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্ম সংস্কৃতির ওপর বিস্তার করে সুনিশ্চিত প্রভাব, গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে সংস্কৃতির বিকাশের পথে। সংস্কৃতিও ধর্মকে সাহায্য করে নানাভাবে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে ধর্ম হারিয়ে ফেলে তার বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব, পরিণত হয়ে যায় নিছক একটি প্রাণহীন বিমূর্ত বিষয়ে।

আমাদের এ কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয় মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশদৃষ্টে। এ কথা আজ সুবিদিত যে, মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশের মূলে ছিল ইসলামধর্ম। কিন্তু এ সংস্কৃতি তার ক্রমিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকেনি কোরআন ও হাদিসের মধ্যে, বরং প্রেরণালাভ করেছে গ্রীক দর্শন, ভারতীয় গণিত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র, চৈনিক মরমিবাদ ও আলকেমি, ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম প্রভৃতি সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে। মহানবী পরলোক গমন করেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে; কিন্তু এরপর প্রতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানরা প্রতিষ্ঠা করল এমন এক বিশাল সাম্রাজ্য যা-কিনা আরবজাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিস্তৃত হল চীন থেকে ভূমধ্যসাগর উপকূল এবং আটলান্টিক থেকে ভারতমহাসাগর পর্যন্ত। নতুন ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মুসলমানরা শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হল না, একই সাথে বিজিত দেশসমূহে বিস্তার করল তাদের সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রভাব এবং সেসব দেশের জনগণের মনে মুদ্রিত করল একটি স্থায়ী চারিত্র। ক্রমশ সেই মধ্যযুগে তারা রচনা করল এক অনন্য সংস্কৃতি। খ্রিস্টীয় আট শতকের শেষে এবং নয় শতকের শুরুতে মুসলমানরা শুধু সামরিক দিক থেকেই শক্তিমান হল না, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেও নিশ্চিত করল এক বিকাশমান কৃষি, সক্রিয় শিল্পতৎপরতা, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও সংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা। একই সাথে তারা শুরু করল এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক আন্দোলন, মানবেতিহাসে যা বিস্তার করল এক অভূতপূর্ব প্রভাব।

একথা কারো অজানা নেই যে, চৌদ্দ-ষোল শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁ, মানবতাবাদ, প্রটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও জ্ঞানালোক আন্দোলন– এ সবেরই বীজ নিহিত ছিল আট ও তের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে অর্জিত মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে। সেদিনের মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতিতে যে মানবতাবাদী সমাজবন্ধনের জয়গান ঘোষিত হয়েছিল, তা-ই পরবর্তীকালে সহায়তা করেছে বিভিন্ন সমাজবিপ্লবে, তা-ই পরিণতি লাভ করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং দর্শনের যুক্তিবাদে।

ইসলামি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশ শুরু হয় আট শতকের মাঝামাঝি সময়ে আব্বাসীয় শাসনামলে । দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের সময় থেকে শুরু করে খলিফা মামুনের মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের মৌলিক রচনাবলীর আরবি অনুবাদ। মুসলিম পণ্ডিতেরা প্লেটো ও এরিস্টটলসহ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের রচনাবলীর আরবি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। শুধু

দার্শনিক গ্রন্থাবলীই নয়, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থকে মুসলিম পণ্ডিতরা মূল গ্রিক ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। মুসলিম পণ্ডিতদের আরবি ভাষায় অনুদিত গ্রন্থাবলিকে পুনরায় ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেই খ্রিস্টান দার্শনিকরা ক্রমশ পরিচিত হন গ্রিক দর্শনের সাথে।

কিন্তু সেদিনের মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি আজ একটা অতীত ইতিহাস মাত্র। কারণ, মধ্যযুগে মুসলমানরা যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, কালক্রমে তা হল এক সর্বাত্মক অবক্ষয়ের সম্মুখীন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকরা হলেন রক্ষণশীল মহলের বিরাগভাজন, বিজ্ঞান ও দর্শনকে ঘোষণা করা হল ইসলামবিরোধী কর্ম বলে। বোধগম্য কারণেই এর ফল হল মারাত্মক। মুসলমানরা হারাল তাদের রাজত্ব, দর্শন বিজ্ঞান শিল্প ও সাহিত্য হল তিরোহিত। মুসমানরা যখন এই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত, তখন উৎকৃষ্টতর অস্ত্র, প্রকৌশল ও কূটকৌশলে সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য ছিনিয়ে নিল সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব। ফলে মুসলমান সমাজ আবার হল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত।

তারপর আঠারো শতকের দিক থেকে নতুন প্রগতিশীল চিন্তার একটা উদ্যম লক্ষ করা গেলেও তা আজও আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। বরং লক্ষ করা যায় যে, বিশেষত বিশ শতকের শুরু থেকে মানুষের জীবনে ক্রমবর্ধমানভাবে নেমে এসেছে দুঃখ, বঞ্চনা, ক্লান্তি, ও হতাশা। আমাদের চোখের সামনে সমকালীন মানবতার এক বড় অংশ নিপতিত হয়েছে অর্থনৈতিক ও নৈতিক সঙ্কটে। অন্যান্য অঞ্চলের আরো অনেক জনগোষ্ঠীর বেলায় যেমন, এ অঞ্চলের মুসলমানদের মনেও তেমনি হতাশা ও ব্যর্থতার গ্লানি বিদ্যমান। তারা যেন আজকাল আর উদ্বুদ্ধ হতে পারছে না অতীতের অকৃত্রিম ইসলামের শক্তি ও সাধনার ইতিহাস দ্বারা। তাই আজ তারা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি অতৃপ্ত, অনেক বেশি হতাশ।

হালের মুসলমানদের এ করুণ অবস্থার কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে কেউ-কেউ হয়তো যথার্থই মনে করেন যে, নিজেদের ধর্মের নিহিতার্থ উপলব্ধি না করা, অতীত ঐতিহ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণে ব্যর্থতা এবং বিশেষত ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো কোনো মহলের তরফ থেকে স্বাধীন ও বিচারশীল চিন্তার স্ফুর্তিকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টাই এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মূল কারণ। আমি নিজেও মনে করি যে, মুসলমানদের দুর্দশার জন্য ইসলাম ধর্ম কিছুতেই দায়ী নয়। কারণ, প্রকৃত ইসলাম প্রগতিবাদী, প্রগতিপরিপন্থী নয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার অনুশীলন এবং অগ্রসরমাণ জীবনের অনুকূল নতুন নতুন ধারণা গ্রহণ ও আত্তীকরণের জন্য ইসলাম মানুষকে বারবার তাগিদ দিয়েছে। সুতরাং সমকালীন বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে মুসলমানদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে সব রকম গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা, উপলব্ধি করতে হবে যে, ইসলামের সাথে আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী দর্শনের কোনো বিরোধ নেই। একই সাথে তাদের এ-ও উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রকৃত ইসলামি

দৃষ্টিতে জড় ও অধ্যাত্ম, কিংবা দেহ ও আত্মার মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। আর তা নেই বলেই মুসলমানদের পক্ষে আদৌ সঙ্গত নয় বস্তুজগৎ ও পার্থিব সমৃদ্ধি– এ দুয়ের কোনোটিকে অগ্রাহ্য করা।

তথ্যসূত্র

১. পত্রধারা, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩৯
২. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯) পৃ. ৪-৬
৩. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত) গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯) পৃ. ১২২
৪. উদ্ধৃতি: ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়), ৫ম সংস্করণ (কলিকাতা ১৯৭৮) পৃ. ৩৯
৫. প্রাগুক্ত. পৃ. ৪৫

ডা. লুৎফর রহমানের প্রবন্ধ-সাহিত্যে মানবতাবাদী দর্শন

ই স রা ই ল খা ন

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), রামমোহন (১৭৩৪-১৮৩৩) থেকে জি. সি. দেব (১৯০৭-১৯৭১) কিংবা দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ পর্যন্ত মানবতাবাদী বাঙালি মনীষীদের তালিকাভুক্ত একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখায় উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের প্রায় পঞ্চাশ বছরের সমাজচিত্র ছাড়াও হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবনমুখী ব্যাখ্যা রয়েছে। ধর্মকে যাঁরা অলৌকিকতা, দুর্জ্ঞেয়তা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে সহজ বুদ্ধির বিষয়রূপে প্রচার করেছেন এবং ইসলামের উদার ও সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা দ্বারা যাঁরা মুসলমান সমাজকে উজ্জীবিত করেছেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন ধর্ম-বিমুখতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান অন্যতম। সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি তাঁর রচনার প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য তাঁকে সমাজ-সংস্কারক দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি কার্যসূচিও গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত 'মুসলমান সাহিত্যিক' 'প্রকৃত মানবতাবাদী লেখক' ইত্যাদি বিশেষণে তাঁকে অভিহিত করা হলেও, তাঁর রচিত সাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র কিংবা তাঁর রচনার দর্শন সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো আলোচনা কিংবা প্রবন্ধ আজও লিখিত হয়নি। এই অভাববোধ থেকেই এই রচনায় তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুই

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানুষের অধিকার তেমন স্পষ্ট ছিল না। সাহিত্যক্ষেত্র এবং মানুষের মনন-রাজ্যে একচ্ছত্র অধিকার ছিল দেব-দেবীর। আর এদের কাজ-কারবার প্রায় সবই অলৌকিক। মানুষের সেই অলৌকিকতার বিরুদ্ধে লৌকিক, জৈবিক, নৈতিক ও যৌক্তিক বিষয়াবলি সাহিত্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে আধুনিককালে; যার সীমারেখার শুরুটা চিহ্নিত করা যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০১) স্থাপনের অথবা রামমোহনের সময় থেকে। উনিশ শতক হচ্ছে এই আধুনিক চিন্তাচেতনা বিকাশের কাল। ঐতিহাসিকেরা এই পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করেছেন 'রেনেসাঁস', বা 'নবজাগরণের' কাল বলে। বাংলা সাহিত্যে এই জাগরণের নানান অভিধার প্রচলন আছে। ধর্ম সম্পর্কে যুক্তিবাদী চিন্তা এই রেনেসাঁসের ফল। যে রেনেসাঁসজাত যুক্তিবাদী চিন্তা পরবর্তীকালে কয়েকজন বাঙালি মুসলমান লেখকের রচনায়ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। লুৎফর রহমান এদের মধ্যে অন্যতম।

বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা ভাষায় 'রেনেসাঁস' নিয়ে অনেক গ্রন্থ-প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে মুসলমান লেখকদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)-এর নাম সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত বই 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৯৫১) আর 'বাংলার জাগরণ' (১৯৫৬)-এ উনিশ শতকের প্রথম অংশে সূচিত যুক্তিবাদী লৌকিক চিন্তার উদ্ভব ও তার সাহিত্যিক নমুনাসমূহের পরিচয় দান, সার-সংকলন ও বক্তব্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

উন্নত, মানবতাবাদী, প্রতিবাদী, বিপ্লবী দার্শনিক লুৎফর রহমান যে একজন বিদগ্ধ বাঙালি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের কল্যাণ কামনায় শহীদ হয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, তিনি সেই জাতের একজন প্রকৃত লেখক। তাঁর রচনায় মানবতাবাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণের উপায়রূপে ইসলাম ধর্মকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেবল বেহেশ্‌তে যাবার উপায় হিসেবে ধর্মীয় আচার-আচরণের পক্ষপাতি তিনি নন। কর্মফলে বিশ্বাসী, দায়িত্বশীল, ঈমানদার মুমিন মুসলমান হিসেবে কোরআন-হাদীস এবং হজরতের জীবনের কষ্ট ও ত্যাগকে অনুধাবন করে তিনি এ মতে স্থিত হয়েছিলেন যে, মানুষের জীবন অনন্ত সম্ভাবনাময়। মানুষের মধ্যে নিহিত আছে

সেই শক্তি, যে শক্তির বলে সে চন্দ্র-সূর্যকেও নিয়ন্ত্রণে আনার মতো স্পর্ধা দেখাতে পারে। অর্থাৎ ঐশ্বরিক গুণ অর্জনের সুযোগ মানুষের আছে কারণ, আল্লাহর শক্তি মানুষের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। [১] তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন মানুষের হৃদয় থেকে স্নেহ, দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, মমতা-ভালোবাসা এ সবের অপসারণের লক্ষ্যে যান্ত্রিক নিয়মে 'ব্যায়াম' করানোর জন্য, রুটিন-মাফিক তপস্যাকারীরূপে মানুষকে গড়ে তুলতে ধর্ম পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি। স্পষ্ট করেই তিনি লিখেছেন– এখন 'ধর্ম ব্যায়াম মাত্র'।

লুৎফর রহমানের ধর্মচিন্তার সার-সংকলন করলে বোঝা যায়, তিনি প্রেম-ধর্মের পরিপোষক। এদিক থেকে রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ধর্মচিন্তা ও সাহিত্যদর্শনের সঙ্গে লুৎফর রহমানের ধর্মচিন্তা ও সাহিত্যদর্শনের অপূর্ব মিল রয়েছে। রামমোহনের সঙ্গে লুৎফর রহমানের চিন্তার ঐক্য এমন যে, পণ্ডিতেরা যে ভাষায় রামমোহনের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কেবল নাম পরিবর্তন করে সে ভাষাতেই লুৎফর রহমানের চিন্তাধারার স্বরূপ বর্ণনা করা যায়। রামমোহন যেমন বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-কোরআন প্রভৃতি গ্রন্থের মূলনীতির ভিত্তিতে নিজস্ব ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক মত তৈরি করে যুক্তিবাদী প্রগতিশীল চিন্তাবিদ দার্শনিকদের পথিকৃতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তেমনি লুৎফর রহমানও বেদ-বাইবেল-গীতা-কোরান, হাদীস ও মহানবীর জীবনী এবং ইউরোপীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের আলোকে নিজস্ব দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক মত গড়ে তুলেছেন। এ ধর্মে মানুষের সেবা পরম মূল্য লাভ করেছে। চরম অধর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মানুষের মনে কষ্ট দেয়া। আল্লাহকে তিনি মানবসেবা, মানবের কল্যাণ, মানুষের (এবং প্রাণীর) সঙ্গে ভদ্রতা, সৌজন্য প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর ধর্ম-জীবন জগতকে গতিময় ও সুন্দর করে তোলার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বিশেষ।

লুৎফর রহমানের ধর্মচিন্তা ও জীবনদর্শন তাঁর প্রতিটি লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে 'ধর্ম', 'আল্লাহ', 'এবাদত', 'নামাজ', 'রোজা', 'উপাসনা', 'প্রার্থনা', 'পাপ-পুণ্য', 'মনুষ্যত্ব, ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কথা স্পষ্ট করেই তিনি লিখেছেন। যে জন্য 'ধর্মজীবন' নামে বইও তিনি লিখেছেন পৃথক করে। তা ছাড়া 'মানবজীবন', 'মহাজীবন', 'যুবক জীবন', 'উচ্চ-জীবন', 'উন্নত-জীবন', 'মহৎজীবন', 'সত্যজীবন', প্রভৃতি গ্রন্থে তো বটেই নানা উপন্যাসেও তিনি বিভিন্নভাবে ধর্মহীনতার জন্য বেদনা অনুভব করে মানুষের মনে প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও পিপাসা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেতনায় ধর্মহীনতা আর মনুষ্যত্বহীনতা অভিন্নার্থ হয়ে ধরা দেয়। তাই মানুষ ও তাদের জীবনকে ঘিরে লুৎফর রহমানের সাহিত্য ও কর্ম আবর্তিত হয়েছে।

প্রকৃত ধর্ম কী? মনুষ্যত্ব কাকে বলে? নামাজ-রোজা-এবাদতের মূল তাৎপর্য কী? কারা বেহেশ্‌তে যাবার অধিকারী, আর কারা নয়? খোদার কাঙ্ক্ষিত ও নির্দেশিত

ধর্ম-কর্মের স্বরূপ কী? ইত্যাদি বোঝাতে গিয়ে তিনি বাস্তব জীবন থেকেই উপমা সংগ্রহ করেছেন। দেখা, জানা, শোনা ঘটনা ও কাহিনীর আলোকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, প্রকৃত ধর্ম কী এবং আল্লাহর ধারণা কিরূপ হওয়া উচিত। লুৎফর রহমান লিখেছেন, 'কাউকে বলার দরকার নেই, আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, তুমি আমার (বিশেষ করে, ইসলাম) ধর্মে এসো, এতে ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। ধর্মের প্রকৃত রূপ পরিদর্শন করে, তাতে মুগ্ধ হয়েই মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে।' 'ধর্ম' বলতে তিনি কী বুঝেছেন, তা ধর্মজীবন গ্রন্থে স্পষ্ট করেই লিখেছেন। 'ধর্ম কী চোখে দেখলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'মনুষ্যশিশুকে মানুষ করে তোলাই ধর্ম। মনুষ্যশিশুর সেবা কর। নামায পড়লেই কি স্বর্গে যাওয়া যায়? ধর্ম আসলে পড়ে আছে বাস্তব জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। শুধু মুখে ঈশ্বর-বাক্যের আবৃত্তি করলে লাভ হবে না'।

তিনি আরও লিখেছেন: 'যারা পাপী ও পাপিনী, যারা পতিত এবং পতিতা তাদের রক্ষা কর– ইহাই ধর্ম। ... মনুষ্য সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলো না, তাতে তোমার ধর্ম থাকবে না। এই জগৎকে স্বর্গে পরিণত করাই হচ্ছে প্রকৃত ধার্মিকের কাজ'।

ধর্মকর্ম প্রতিপালনের সামাজিক রীতি-নীতি এবং জীবিত মানুষের প্রতি মানুষের অবহেলা দেখে তিনি একথা বলার আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন যে, মরণোত্তর ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাহুল্য-মাত্র। 'জীবনের জন্য ধর্ম, মৃতের জন্য নয়।' 'জীবনে বেঁচে থাকতেই ধর্ম করে যাও'। দেশের আর্ত-পীড়িতের জন্য ফাতেহার পরিবর্তে বরং হাসপাতাল স্থাপন কর। পীড়িতের সেবা করা– এই হচ্ছে ধর্ম। শুষ্ক লবণহীন রোজা-নামাজে কোনো ফল হবে না। জীবনকে বেদনা দেয়ার স্বীকৃতি কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। অথচ ধর্মের ধার না ধরে মানুষ ধর্মের নামে মারামারি করে। লুৎফর রহমানের মতে যারা অধার্মিক তারাই ধর্মের নামে বড়াই করে বেশি। 'জীব মাত্রই শিব' একথা কোন্ হিন্দু এবং 'মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি'একথা কোন্ মুসলমান মেনে চলে? আল্লাহর জন্য বড়াইকারী কোন্ ধার্মিক আল্লাহর নির্দেশসমূহ যথাযথ মেনে চলেন– তিনি এই প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন: কেবল নামাজ পড়ে মানুষ ধার্মিক হয় না। কারণ নামাজই আল্লাহর নির্দেশিত একমাত্র ধর্ম-কর্ম নয়। তিনি লিখেছেন: 'নামাজের দ্বারা নয়, কার্যের দ্বারা ধার্মিক হবে।'

পাপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'মানুষকে কোনো রকম দুঃখ দেওয়া পাপ, জগতে দুঃখ সৃষ্টি করা পাপ। আল্লাহ মানে সত্য, হক, ন্যায়বিচার।' তিনি আরও লিখেছেন: সত্যকে অপমান করা, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো মানেই হচ্ছে আল্লাহকে অপমান করা, ধর্মের উদারক্ষেত্রে সকল মানুষকে তিনি সমান গুরুত্বে ও মমত্বে গ্রহণ করে লিখেছেন: স্রষ্টা অভিন্ন; ঈশ্বর এক, যে নামেই ডাকা হোক, সকল সৃষ্টির ধর্মই এক। ধর্মজীবন গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: 'মানবজাতির একটি সাধারণ ধর্ম আছে। ধর্মের উদার ক্ষেত্রে সকল মানুষই সমান।'

আধুনিক কালের উপযোগী ধর্ম সম্পর্কে এমন মহান উদার, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি সমাজে হিন্দু ও মুসলিম বা অন্য যে কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই কম দেখা যায়। তিনি লিখেছেন: 'ইসলাম মানে কাজ'। ধর্ম অর্থ কর্ম।

'মানব জীবন' গ্রন্থের 'আল্লাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে 'আল্লাহ কী'– এই অনন্ত জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে লুৎফর রহমান আল্লাহ্‌কে দুর্জ্ঞেয় মনে করেননি।

তিনি প্রচলিত ব্যাখ্যায় আস্থা স্থাপন না করে লিখেছেন: আল্লাহ অনন্ত, তাঁকে কেউ জানে না– এই ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্র আশার কথা নহে। 'আল্লাহ অনন্ত' শুনে আমাদের মন বিন্দুমাত্র বিচলিত ও চঞ্চল হয় না। এই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই নয়। বস্তুত আরও অনেকে আল্লাহর ব্যাখ্যা অনেক কথায় দিয়ে থাকেন, তাতে আল্লাহ্‌র পরিচয় মানুষ একটুও পায় না– মানুষ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

তিনি আল্লাহকে বাস্তব জগতের নিত্যকাজের চলার শক্তির সহায়ক প্রেরণারূপে দেখতে চেয়েছেন।

এই জগৎ এই অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত জীবনের যিনি উৎস যিনি আছেন এবং থাকবেন– যিনি চিরসত্য, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি আমাতে আছেন ... আমি তাঁকে দেখতে চাই, হৃদয়ে ধারণ করতে চাই। ... অনন্ত সৃষ্টি তিনি বুকে ধারণ করে আছেন, তিনি নর-নারীর অঙ্গ-শ্রীতে লীলায়িত হন ... তাঁকে পাবার জন্যে মানবচিত্ত ব্যকুল হয়ে ছুটছে ... তাঁকে চুম্বন করতে চাই। মানবচিত্তের চির-প্রেয়সীর আঁচল ধরে অনন্ত সোহাগে আমি বাসরের আনন্দ অনুভব করতে চাই।

মহাজীবন গ্রন্থের মহামানুষ ... 'মহামানুষ কোথায়?' শীর্ষক প্রবন্ধে আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য যাঁরা কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় ব্যস্ত তাঁদের সম্পর্কে লিখেছেন: তোমায় মৃত অনুভূতিহীন উপাসনায় রত দেখে আমি সুখী হইনি। পাপ অগৌরবের লজ্জায় যখন তুমি অনুতাপের অশ্রু ফেলেছো, তখন আমি তোমায় সম্মান করেছি– এখানেই তুমি জাগ্রত, সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ।

বস্তুত আল্লাহ্‌কে মানবচিত্তে অধিষ্ঠিত করার সাধনা লুৎফর রহমানের মানবের কল্যাণ-সাধনার বহু পন্থার এক উপায় মাত্র।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান আল্লাহ এবং ধর্ম সম্পর্কে এসব কথা লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ঐসব ধার্মিকদের মূর্খতা দেখে, যারা আল্লাহকে নিয়ে বৃথা তর্ক করে, যারা ধর্ম নিয়ে মারামারি-হানাহানি-কাটাকাটি করে, অথচ আল্লাহ কী এবং প্রকৃত 'ধর্ম'ই বা কাকে বলে, তা জানে না।

তিন

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রামমোহন ধর্ম সম্পর্কে যুক্তিবাদী আলোচনার সূত্রপাত করেন, কিন্তু তিনি ধর্মযাজকের ভূমিকা পালন করেননি। তাঁর ভূমিকা ছিল সমাজ-সংস্কারকের। সেজন্য তিনি ধর্মাশ্রয়ী আলোচনার প্রয়োজন অনুভব

করেছিলেন তবে তা করেছিলেন গোঁড়ামীতে আচ্ছন্ন বাঙালির চিন্তাকে বন্ধনমুক্ত করার অভিপ্রায় থেকে। অনাচারের বন্ধন থেকে ধর্মকে মুক্ত এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন– সে কথা আজ সবারই জানা। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি ধর্মের মানবিক দিকগুলোকে সম্মুখে এনে মানবজীবনকে ধর্মানুসৃত প্রেম ও মানবতার অবলম্বনে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদর্শও ছিল মানবসেবা ও মানবের ঐহিক কল্যাণসাধন। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষ পর্যায়ে ইহজাগতিকতার ওপর থেকে আস্থা হারাননি। (যদিও তাঁর শেষ জীবনের ধর্মাবেগ বিতর্কিত বিষয়)। ধর্মবোধ ও আস্তিকতার প্রতি আস্থা স্থাপন করলেও আজীবন তিনি গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন ইহজাগতিকতার ওপর, তথা মানবের সুখ-দুঃখময় বাস্তব জীবনের প্রতি। তিনি বলেছেন: 'সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরের ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। হিন্দু লেখক বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমকে বড় করে দেখেছেন সর্বত্র। তিনি লিখেছেন: 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশ প্রীতি, ইহা হইতে বিস্মৃত হইও না। তাঁর মতে ধর্ম ও দর্শনের একান্ত লক্ষ্য ব্যক্তির সর্ববিধ উন্নতি ও সুখ-সাধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ধর্ম বলতে গতানুগতিক আচার-সর্বস্ব মোক্ষ-সাধনা কিংবা পরলোক-চর্চাকে বোঝেননি। একজন সমালোচক লিখেছেন: 'ধর্মকে তিনি অবলম্বন করেছেন মানবমুক্তির উৎস ও আকর হিসেবে। তাই তাঁর ধর্ম মানবধর্ম। এ ধর্মের লক্ষ্যও কোনো অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর নয়, বরং সেই ঈশ্বর, যাঁকে পাওয়া যায় মানুষের গভীর সত্তায় ভক্তি, প্রেম ও কর্ম দিয়ে। ঈশ্বর মানুষেরই সীমাহীন বিস্তৃতি, মানুষের মধ্যে উপস্থিত মহামানব অন্যকথায় জীবনদেবতা।' কবি নিজেই 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক রচনায়, (রবীন্দ্র রচনাবলি ২০তম খণ্ড, পৃ.-৩৬৯) লিখেছেন:

আমার বুদ্ধি মানব বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয়,
আমার কল্পনা মানব কল্পনা।

স্বামী বিবেকানন্দেরও দর্শন-চিন্তার সারকথাও প্রায় একই রূপ : জীবন মানেই ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মের সাকার অভিব্যক্তি। প্রতিটি জীবই যেহেতু ব্রহ্মের অংশ এবং প্রত্যেকের মধ্যেই যেহেতু ব্রহ্ম উপস্থিত, সেহেতু সেই জীবকে ভালোবাসা ও সেবা করার অর্থই হল প্রকারান্তরে ব্রহ্মকেই ভালোবাসা ও সেবা করা। তাঁর সেই সেবাধর্মে কোনো ভেদাভেদ রইল না ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা হিন্দু ও মুসলমানে। এ-মানবধর্মই বিবেকানন্দ প্রচার করলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অগণিত নিপীড়িত জনগণের পক্ষ থেকে।

বেগম রোকেয়া ধর্মকে মানুষের কল্যাণ সাধকমাত্র রূপে দেখেছিলেন। ঘুমন্ত, ধর্মাচ্ছন্ন জাতিকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন: 'ধর্ম মানুষই সৃষ্টি করেছে। অতএব ধর্মের থেকে মানুষ বড়। তাই ধর্মের নামে মানুষের উপর নির্যাতন চালানো ঠিক নয়। বরং ধর্মের নামে মানুষকে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবরূপে, হেয় দাস ভাবাই বড় অধর্ম।'

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রধান পরিচালক আবুল হুসেন মানুষের বড় হবার সম্ভাবনায় ছিলেন অত্যন্ত আস্থাবান। প্রতিবাদী, বিপ্লবী, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী এই মনীষী হযরত মোহাম্মদের পবিত্র, বিখ্যাত হাদীসের সেই বাণী – 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' উদ্ধৃত করে এক সময় লিখেছিলেন: 'আল্লাহর গুণাবলীতে বিভূষিত হও।' তাঁর ব্যাখ্যা ছিল: আল্লাহর গুণাবলিতে বিভূষিত হওয়ার অর্থ অনন্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হওয়া। কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই। আবুল হুসেন 'আদর্শের নিগ্রহ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন: এ ও দেখতে হবে, সপ্তম শতাব্দীর আরব মরুর ইসলাম বিংশ শতাব্দীর শস্য-শ্যামল-উর্বর দেশে কতখানি কার্যকরী হতে পারে। ... ইসলাম যে মানুষের জন্য, মানুষ যে ইসলামের জন্য নয়– একথা বুঝার মতো বুদ্ধি তাদের (মুসলমান বাঙালির) আজও হয় নাই। তাই দেখি শুধু অনুষ্ঠান পালনে দৃঢ় অথচ মানুষ হিসাবে পাষণ্ড নরাধম এমন মুসলমানও মাত্র বাহ্যিক নিদর্শনের বলে সমাজে বেশ খ্যাতি পায়।

ইসলামের কঠোর অনুশাসন সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন:
'কালের পরিবর্তনে অবস্থার বিপর্যয়ে ধর্মশাস্ত্রের কথা মানুষ পুরোপুরি পালন করতে পারে না।'[২]

না বুঝে, না চিনে আল্লাহ, ধর্ম তথা ইসলাম এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন সম্পর্কে সারহীন তর্ক করে যারা মাথা ফাটায়, তাদের উদ্দেশ্যে কাজী আব্দুল ওদুদ 'কোরআনে আল্লাহ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে আল্লাহ্‌কে দৈনন্দিন জীবনে সকল প্রকার কাজের প্রেরণাদায়ী মহাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে এবং প্রকৃত ইসলামের পথে মুসলমানকে প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র কী যোগ, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পান : আল্লাহ্‌র স্বরূপ জিজ্ঞাসা কোরআনে অনভিপ্রেত। অথচ কোরআনে যদি কোনো একটি ব্যাপার অত্যুগ্ন হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা– আল্লাহর মহিমার অন্ত নেই, করুণার অন্ত নেই, চিরজাগ্রত তিনি, অন্যায়ের কঠোর শাস্তিদাতা তিনি– এসব কথা বারংবার কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভালো মন্দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, এ বিষয়ে কোরআন নিঃসন্দেহ– যেমন নিঃসন্দেহ, তিনি দুর্জ্ঞেয়, সে সম্বন্ধে।

যাকে জানা যায় না অথবা অতি সামান্যই জানা যায় তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবলম্বন হবে কেমন করে?[৩] এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য লেখক কোরআনের মর্মার্থ গ্রহণ করে দেখাতে চেয়েছেন, কোরআনের নির্দেশই হচ্ছে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজিতে বিভূষিত এবং সেইসব মহান শ্রেষ্ঠতম গুণবাচক নামে আল্লাহ্‌কে ডাকতে। অর্থাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। কিন্তু কোরআনের ব্যাখ্যাতা মৌলানা-মৌলভিগণ আল্লাহ্‌র স্বরূপ জিজ্ঞাসার অবদমন করেন এইসব আয়াতের বক্তব্য দ্বারা, যেমন: সূরা বণী ইসরাইল-এর ৮৫ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে: 'তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।' কিংবা সূরা বাকারার ২৫৫

সংখ্যক আয়াতের বক্তব্য: তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। এই ধরনের আয়াতে আল্লাহর স্বরূপ জিজ্ঞাসা কোরআনের অনভিপ্রেত; এই ব্যাখ্যাদানের যুক্তি সরবরাহ করলেও এটা কোরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়; মানবিক, জাগতিক ও আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা তো নয়ই। কোরআনের অপরাপর আয়াতের, তথা সার্বিকভাবে কোরআনের মর্মার্থ কিন্তু তা নয়। যাঁর মাধ্যমে কোরআন বা ওহী নাজেল হয়েছে (হযরত মুহম্মদ স.) তাঁর ব্যাখ্যা ও নির্দেশে এই বক্তব্যই সমর্থন পায় যে, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর সকল কিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। সূরা হাশ্‌র-এর ২৪ সংখ্যক আয়াতেও বলা হয়েছে: তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

সূরা আ'রাফ-এ ১৮০ সংখ্যক আয়াতের অর্থ: উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌রই; তোমরা তাঁহাকে সেইসব নামেই ডাকিবে। সূরা ইবরাহীমের ৩৩ সংখ্যক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে : তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের কল্যাণে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।

এই সব আয়াতের মূল কথা হচ্ছে– 'আল্লাহর সদগুণের অধিকারী হয়ে মানুষ এমন ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হতে পারে যে, চন্দ্র-সূর্য এবং দিবস ও রজনীকে সে তার নিজ সেবায় ও কল্যাণের কাজে লাগাতে পারে। এই সদগুণে গুণান্বিত হবার নির্দেশই আল্লাহ মানুষকে কোরআনে দিয়েছেন। তাঁর বান্দাদিগকে উত্তম নামসমূহ ধরে তাঁকে ডাকার নির্দেশদানের তাৎপর্যই হল যে, সদগুণ বা উত্তম নিরানব্বই নামের উচ্চারণ ও মহিমাই এর অন্তর্গত তাৎপর্য কী তা বলে দেয়; যেমন দয়া ও প্রেমময়, অসীম ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী, মালিক তিনি – ইত্যাদি নামসমূহ কামনার সীমা অতিক্রম করে যত বড় ও মহৎ হতে পারে, তা সবই আল্লারই নাম; যে সদগুণাবলি অর্জনের সাধনায় হযরত মুহম্মদ (দ.) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছেন। আর যে কোনো মানুষই ঐরূপ মর্যাদা অর্জনে প্রয়াসী হতে পারেন।

অবশ্য এই ধরনের চিন্তায় অহমিকা থাকলেও ধর্মদ্রোহিতা নেই। কারণ আল্লাহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইহকাল বা পরকালের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শুধু কোরআনই নয়, সকল ধর্মগ্রন্থ, শাশ্বত বাণী ও মনীষীদের চিন্তাধারায় আল্লাহ সম্বন্ধে (ঈশ্বর, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা যাই হোন্ না কেন) এই ধরনের মনোভাবই পোষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ স্বরূপে দুর্জ্ঞেয়, আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষই নিবিড়ভাবে যুক্ত।

মানুষ কি আল্লাহর গুণের অধিকার অর্জন করে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা বলে সৌরজগৎ, সাগর, পর্বতের অনেক রহস্য উদঘাটন করেনি?

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে মুসলমান লেখকেরা কোরআনের জীবনবাদী ব্যাখ্যার সামাজিক প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিলেন। মুসলমান সমাজকে রেনেসাঁসের মন্ত্রে উদ্দীপিত, জাগরিত করে তুলবার দায়িত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই মুসলিম লেখকেরা তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে আবির্ভূত কয়েকজন মুসলিম কবি-সাহিত্যিক ধর্ম সম্পর্কে আরও বিপ্লবী, প্রতিবাদী তথা মুক্তচিন্তার পরিচয় দিয়ে মানবতাবাদী ধর্মীয়-দর্শন চর্চার ধারাকে বর্তমান কালের সঙ্গে সংগ্রথিত করে দিয়েছেন। মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্ (১৮৯৮-১৯৭৪);, কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪)-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কবি নজরুল ইসলাম ধর্মের নামে অধর্ম ও ভণ্ডামির সমালোচনা করে মানুষ, মানবতা, সাম্য-মৈত্রী ও প্রেম-প্রীতির জয়গান গাওয়ার কারণে 'কাফের', 'নাস্তিক', 'ঈশ্বরদ্রোহী', 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'বিদ্রোহী', 'বিপ্লবী', প্রভৃতি নানান ভাষায় চিহ্নিত-নিন্দিত হয়েছেন। কারাগারে এবং সামাজিকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন পর্যন্ত ভোগ করেছেন। এসব সকলেরই জানা তথ্য। তারপরও 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু', 'মানুষ' প্রভৃতি কবিতা ও গানে ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ মূল্যায়নের ও প্রতিষ্ঠার ভূমিকায় তিনি ছিলেন সোচ্চার।

কবি নজরুলের কাব্য ও সুর মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেও আবুল হাশিমের ন্যায় ইসলামী চিন্তাবিদদের বক্তব্যও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাঁর 'দি ক্রিড অব ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়, মানুষ কেবল জড়বস্তু সীমিত জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির অথবা খেলনা-পুতুলের ন্যায় দম- দেয়া যন্ত্র কিংবা অবস্থার দাস নয়। মানুষের মধ্যে নিহিত আছে পরম সত্তা আল্লাহ্র গুণাবলি অর্জনের অসীম ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা, যে শক্তি ও সম্ভাবনার বলে সে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে নূতন প্রাণশক্তি তথা মাত্রা যোগ করতে পারে। কোরআনের সেই আয়াত এখানে দ্রষ্টব্য: 'তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে।' (১৪:৩৩)

আবুল হাশিমের মতে: 'আল্লাহ্ জগৎ-সংসারের পরমসত্তা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই জগৎ ও জীবন মায়া, প্রপঞ্চ। পরম বাস্তব সত্তা আল্লাহ্র সৃষ্টি বলেই জগতের প্রতিটি জিনিস সেই বাস্তবতার অংশীদার। মানুষ সৃষ্টির সেরা তার নৈতিক গুণাবলীর কল্যাণে, এবং তার মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক গুণ অর্জনের ক্ষমতা। এ ক্ষমতাবলেই মানুষ নতুন প্রাণ ও দর্শন যুক্ত করতে পারে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে, গড়ে তুলতে পারে এক নতুন মানবতা।'

গোবিন্দচন্দ্র দেব ধর্ম-দর্শন চিন্তাকে জীবনের কাজে ব্যবহারের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। মানবের কল্যাণ ও মানবতাবাদের সম্প্রসারণের সাধনায় ধর্মকে জীবনের সহায়ক

প্রেরণাই ভেবেছেন; নিষ্ঠুর প্রভুর কষ্টদায়ক হুকুম মনে করেননি। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে লুৎফর রহমানের চিন্তাধারার সঙ্গতি লক্ষ্য করার মতো।

চার

মুসলিম রেনেসাঁর প্রাণপুরুষগণ ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং বেঙ্গল রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র 'বুদ্ধির মুক্তি' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'ধর্ম কী', আর 'অধর্ম' বা মনুষ্যত্বহীনতা কাকে বলে, কিংবা মানুষের কাছে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা কী হওয়া উচিত– এসব নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্যই তাঁরা তা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন 'মানবতাবাদ' ও 'মানববাদ' আর মানবিক চাহিদার বিচারের ভিত্তিতে, বাস্তব জগতের সহায়ক দার্শনিক চিন্তার ও বিবেচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে। ফলে এইসব সাহিত্যিক-দার্শনিকদের রচনাবলিতে মানবতাবাদী চিন্তা রূপায়িত হয়ে বাংলার নবজাগরণ বাংলা-সাহিত্যে এবং বাঙালি-সমাজে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকতর ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

মানুষকে, মনুষ্যত্বকে এবং মানবের আত্মাকে ধর্মের কারাভ্যন্তর থেকে মুক্তিদানের জন্য এইসব বাঙালি মুসলমান মনীষীগণ তাই সাহিত্যকর্মে উৎসর্গ করেছিলেন পুরো জীবন। মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে বা হতে পারে, সেই পন্থা অন্বেষণের কালে ধর্ম কী, এর স্বরূপ কী হওয়া উচিত– এসব তাঁরা উপলব্ধি করবার ও করাবার চেষ্টা করেছেন। মুসলমান লেখক হিসেবে এঁরা কোরআন, হাদীস ও হজরত মুহম্মদের মহান জীবনাদর্শের মানবিকতাপূর্ণ, সম্ভাবনাময় সদর্থক দিকগুলোকে মূল্যবান পাথেয় বা উপাত্তরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের চিন্তাধারার প্রতি মনোযোগী হলে দেখা যায়, তাঁরা আধুনিক মানবতাবাদ ও মানববাদ-এর সার্থক রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে রেনেসাঁসের মর্মবাণী মুসলমান সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এঁদের রচিত সাহিত্যের কোনো কোনো অংশে যুক্তিবিচারের প্রবণতা আনন্দদায়ক উদাহরণের সৃষ্টি করেছিল। এ সময় মানবিক সম্পর্ক অতি উচ্চমূল্য লাভ করেছিল এবং শিল্প-চিন্তায় এদের মূল প্রেরণা ছিল ইহজাগতিকতা। মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে যিনি উদারপন্থী, তিনি জ্ঞানানুশীলন ও সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদী হতে বাধ্য। ফলে তাঁদের চিন্তায়, কর্মে, আচরণে ও উচ্চারণে নির্বিচার-বিশ্বাস ও অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার স্থান লাভ হয়নি। কারণ এঁরা যুক্তিবাদী, আর যুক্তিসঙ্গত কারণেই তাঁরা মানবিকতাবাদী ও উদারপন্থী।[৪]

উনিশ ও বিশ শতকে শত শত মুসলমান লেখক আবির্ভূত হয়ে অশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও বাঙালির রাজনীতি ও সমাজনীতি আধুনিক, সাম্প্রাদায়িক চিন্তামুক্ত হতে পারেনি। এ দেশের রাজনীতিতে ভাষা কিংবা ভৌগোলিক অবস্থান-ভিত্তিক জাতীয়তার আদর্শ 'পুষ্টি লাভ করে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি'। গোটা উনিশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) এবং নওশের আলী খান

ইউসুফ জায়ী ব্যতীত এমন আর কোনো লেখককে খুঁজে পাওয়া যায় না, যাঁরা নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যুক্তিবাদী অসাম্প্রদায়িক লেখক হিসেবে সমাজ-সমালোচনার দায়িত্ব নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। যে দুজন মুসলিম চিন্তাবিদকে মানবতাবাদী লেখক হিসেবে সম্মান দেখানো হয়, সেই হুগলির দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩) এবং সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)-এর চিন্তাও আচ্ছন্ন ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক ধর্মচিন্তার দ্বারা।

দেলওয়ার হোসেন আহমদ মনে করতেন, স্থিতিশীল ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। যে সব বিধান মৌলিক ধর্ম-গ্রন্থ এবং ধর্মীয়-বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এবং যেগুলো প্রগতি-পরিপন্থী সেগুলোকে তিনি সংস্কার, এমনকি পরিত্যাগ করার সুপারিশ করেছিলেন। আমীর আলী বলেছিলেন : ইসলামের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান যুক্তিবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।... যে সব আচার-অনুষ্ঠান উপাসকের মনে কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না সেগুলোকে পরিহার করা আবশ্যক।[৫] কিন্তু এ কথাও বিবেচনাযোগ্য যে, 'যুক্তিবাদী মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং আরবের গৌরব ও ঐতিহ্য তুলে ধরে মুসলিম চিন্তার উৎকর্ষ বিধান, আত্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধন এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণ সম্ভাবিত করার উদ্দেশ্যেই' সৈয়দ আমীর আলী তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'স্পিরিট অব ইসলাম' (১৮৯১) এবং 'এ শর্ট হিস্টরি অব দি স্যারাসিন' (১৮৯৮)-এর বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণরীতি বেছে নিয়েছিলেন।[৬]

মুসলমানদের জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা এবং উচ্চবোধ সংস্কার-প্রচেষ্টার পেছনে কাজ করেছিল খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস। ফলে ভাষা এবং রাষ্ট্রকাঠামোভিত্তিক জাতীয়তাবাদ উনিশ শতকে বিকশিত হতে পারেনি। বিশ শতকে যে সকল প্রচারক, লেখক, চিন্তক ও রাজনীতিক সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিল, সে সকল মানবতাবাদীদের চিন্তা তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারাকে পরাভূত করে বিকশিত হয়েছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা। একবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে এসেও বাঙালি, ধর্মীয় রাজনীতি থেকে মোহমুক্ত হতে পারেনি। ওহাবী আন্দোলনের চেতনা উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলার রাজনীতিতে যে পথে প্রবেশ করেছিল, সেই পথে এখনো আসছে সম্পূরক সাম্প্রদায়িক, প্যান-ইসলামিজমপুষ্ট রাজনৈতিক প্রেরণা। ফলে ভারতে কিংবা বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশের পক্ষে ওহাবী চেতনা, ধর্মীয় গোঁড়ামি কিংবা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা এবং আন্তর্জাতিক মৌলবাদী রাজনীতির উস্কানির কথা উল্লেখযোগ্য। গোটা বিশ্বই এখন ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে রাজনীতিতে মত্ত। অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদকে টিকিয়ে রাখার

জন্য পাশ্চাত্য, উন্নত জগৎও রেনেসাঁসের মর্মবাণীকে পাশ কাটিয়ে অমানবিকতাবাদী ধর্মীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে ভারতে কিংবা বাংলার মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুরাও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত হতে পারছে না।

কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অন্তত লেখকগণ মানবতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তার পিছনে অবশ্য কারণ ছিল, ছিল উনিশ শতকের রেনেসাঁস, আধুনিক শিক্ষা এবং স্বদেশী আন্দোলন সৃষ্ট বীর্যবন্ত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার একটি অনুকূল পরিবেশ। বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের উদার মানবিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অপরাপর সাহিত্যিকদের মানবতাবাদী দর্শন, সাহিত্যচিন্তা ও জাতীয়তাবাদের বীজ রূপায়িত হয়েছিল। ফলে সমাজ-মানসকে তাঁরা নতুন চেতনার রঙে রাঙাতে সক্ষম হয়েছিলেন । তাই কিভাবে ভবিষ্যতের বাঙালি সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত উদার মানবিকতাবাদী ইহলৌকিক চেতনাসমৃদ্ধ সমাজ-ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে অগ্রগতির ধারাকে পুষ্টিদান করবে এবং জাগতিক মূল্যবোধের সহায়ক ধর্মচিন্তার ধারাকে জয়যুক্ত করবে– সে বিষয়ে আমাদের এখনই গভীর মনোযোগী হওয়া দরকার। [৭]

তথ্য নির্দেশিকা

১। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'মহাজীবন', ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৫৪।

২। আবুল হুসেন, 'আদর্শের নিগ্রহ', শান্তি, ১৩৩৬; উদ্ধৃতি: রফিকুল ইসলাম 'প্রতিবাদী বিদ্রোহী চিন্তার

একদিক', ওয়াকিল আহমেদ সম্পাদিত, বাঙালীর চিন্তাধারা: আধুনিক যুগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

১৯৯০, পৃ. ১২৫।

৩। কাজী আবদুল ওদুদ, 'কোরআনের আল্লাহ', শাশ্বতবঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮৩, ২য় সং, পৃ. ৩৬-৩৮।

৪। আমিনুল ইসলাম, 'বাঙালীর উদারপন্থী ও যুক্তিবাদী চিন্তা', ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, বাঙালীর

চিন্তাধারা: আধুনিক যুগ; পৃ.৮২।

৫। ঐ, পৃ. ৯২।

৬। ওয়াকিল আহমদ, 'মুসলিম বাংলার জাতীয়তাবাদ', প্রাগুক্ত, ৫৭।

৭। প্রবন্ধে উল্লিখিত বাঙালি চিন্তাবিদদের ধর্মচিন্তা-সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক

প্রকাশিত বাঙালীর চিন্তাধারা: আধুনিক যুগ (১৯৯০) শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত আমিনুল ইসলাম প্রণীত

'বাঙালীর উদারপন্থী ও যুক্তিবাদী চিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

প্র ব ন্ধ

কবির বিশ্বাস ও কবিতার বস্তুভিত্তি

শা ন্ত নু কা য় সা র

কবিতার পাঠক নন এমন অনেকে এবং কবিতার পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ কবিকে সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক এক ব্যক্তি বলে বিবেচনা করে থাকেন। এক দিক থেকে তাঁদের এই বিবেচনা সঠিক এবং অন্য দিকে থেকে সঠিক নয়। যে-কেউ ইচ্ছে করলেই কবিতা লিখতে পারেন না, যে ক্ষমতা থাকলে একজন মানুষের পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব হয়, তা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই থাকে না, এমনকি যিনি এক কিংবা একাধিকবার এই ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তিনিও যে আবারও এই ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবেন, তাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই দিক থেকে একজন কবি নিশ্চয়ই অন্য মানুষ থেকে পৃথক, এই অর্থে যে, সাময়িকভাবে হলেও তাঁর যে ক্ষমতা আছে তা অন্যদের নেই। কিন্তু একজন কবি সার্বক্ষণিকভাবে কবি নন – তিনি তাঁর বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই কাব্য-রচনার জন্য ব্যয় করেন না। যখন তিনি কবিতা লেখেন, শুধু সেই সময়ে এবং শুধু সেই সময়টুকুর জন্যেই তিনি কবি এবং অন্য মানুষ থেকে পৃথক। কবিতা লেখা ছাড়া বাকি সময়ে তিনি অন্য মানুষের মতো জীবনযাপন করেন, জীবিকার প্রয়োজনে কিংবা অবসর বিনোদনের জন্য নানা কাজে ব্যাপৃত থাকেন। দেশ, সমাজ ও কাল-কর্তৃক তিনি নিয়ন্ত্রিত হন নানা শারীরিক কষ্ট ও মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে; এমনকি অনিবার্যভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হন। তাঁর এই জীবন অন্য পাঁচজনের জীবনের মতোই, যদিও এই জীবনের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া মৌল চারিত্রগত এবং আবেগের গুণগত দিক থেকে অন্য মানুষের প্রতিক্রিয়া থেকে ভিন্ন। জীবনে স্থিত বলেই কবির পক্ষে কাব্য-রচনা করা সম্ভব হয়, কেননা কবিতা জীবন থেকে উপাদান আহরণ করে, কবিতার মাধ্যম যা, অর্থাৎ ভাষা, জীবনই তা গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। সৃষ্টির মুহূর্তে কবি অন্য সবার থেকে, এমনকি নিজের সাধারণ সত্তা থেকে পৃথক হলেও অন্য সময় তিনি অন্য সবার মতোই সমাজবদ্ধ, প্রকৃতিবদ্ধ, সময়বদ্ধ সাধারণ মানুষ।

এক স্তরে কবি অন্য সাধারণ মানুষের মতো এবং সমাজের একটি সামান্য অংশমাত্র বলে মানুষের মতো তিনিও বিভিন্ন সময়ে নানা চিন্তা-ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত হন এবং নানা বিশ্বাস তাঁর মনে দানা বেঁধে ওঠে। মার্কিন দেশীয় একজন কবি যদি ধনতন্ত্রে এবং রুশ কিংবা চীন-দেশীয় একজন কবি যদি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হন, একজন আরব-মুসলমান কবি যদি ইহুদি-বিদ্বেষী এবং একজন আরব-ইহুদি কবি যদি মুসলমান-বিদ্বেষী হন, তা হলে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। এই বিশ্বাসসমূহ ভালো কি মন্দ, যথার্থ কি অযথার্থ, যৌক্তিক কি অযৌক্তিক, মানুষের জন্য কল্যাণকর কি কল্যাণকর নয়, এটি ভিন্ন প্রশ্ন। যা বিবেচ্য তা এই যে, বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার মাধ্যমেই হোক বা অন্যভাবেই হোক, অন্য পাঁচজন মানুষের মতো কবির মনেও কিছু কিছু বিশ্বাস গড়ে ওঠে, এবং এক স্তরে কবি অন্য পাঁচজন মানুষের মতো জীবনযাপন করে থাকেন বলে, এই বিশ্বাসের হাত থেকে তাঁর মুক্তি নেই। সেইসঙ্গে এও সত্য যে, অন্য পাঁচজন মানুষের বিশ্বাস যেমন পরিবর্তিত হয় কিংবা হতে পারে, একজন কবির বিশ্বাসও তেমনি পরিবর্তিত হয় কিংবা হতে পারে। উদাহরণ, একজন মার্কিন কবি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবশত জীবনের এক পর্যায়ে তাঁর পিতৃপুরুষের বাসভূমি ইংল্যান্ড ফিরে আসার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন এবং দেশান্তরিত হওয়াকে তাঁর কাব্য-রচনার জন্যে অনিবার্য বিবেচনা করতে পারেন। তাঁর বিশ্বাস কিংবা বিশ্বাসের পরিবর্তন তাঁকে এই ব্যবস্থা নিতে উদ্বুদ্ধ কিংবা বাধ্য করতে পারে। আবার এমন হওয়াও অসম্ভব কিংবা বিচিত্র নয় যে, একজন মানুষের মধ্যে এবং ফলত একজন কবির মধ্যেও একই সময়ে এমন কিছু কিছু বিশ্বাস একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে, যেগুলো একে অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী। কবি যেহেতু জীবনের কথা বলেন এবং যে-জীবনের কথা তিনি বলেন, তা যেহেতু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু সাধারণ মানুষ হিসেবে, কবির মনে যে-সব বিশ্বাস ও ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে থাকে, সেগুলোও তিনি যে-জীবনের কথা বলেন, সেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। এর তাৎপর্য এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে কবির বিশ্বাস ও ধারণার পরিবর্তন ঘটলে, সে–পরিবর্তন তাঁর রচনাতে প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা থাকে কিংবা সেই পরিবর্তনের অভিঘাত তাঁর রচনাতেও কোনো-না-কোনোভাবে অনুভূত হতে পারে।

বিশ্বাসের এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে একজন কবির কবিতা, অর্থাৎ তাঁর রচিত শিল্পকর্ম, শিল্পকর্ম হিসেবে কিভাবে পরিবর্তিত কিংবা প্রভাবান্বিত হয়–

যে বস্তুভিত্তি ও দর্শনের ওপর নির্ভর করে কবি নিজেকে লালন ও বিকাশ করেন, তা-ই তাঁর কাব্যবিশ্বাস। কাব্যবিশ্বাসের মধ্যে জীবন ও শিল্প উভয় বিষয়েই চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত। অন্য কথায়, সাধারণ মানুষ হিসেবে যে বিশ্বাস কিংবা বিশ্বাসসমূহ কবির মনে প্রোথিত থাকে অথবা কবি নিজ চেষ্টায় যে-বিশ্বাস অর্জন করেন অথবা

বহিঃস্থ কোনো কারণে তাঁর মধ্যে যে-বিশ্বাস গড়ে ওঠে, সে-বিশ্বাসও কাব্যবিশ্বাসের অঙ্গ হতে পারে, যদিও কাব্য-বিশ্বাসের মধ্যে কবিতার প্রকরণগত ও শিল্পের প্রয়োজনীয়তা, ভূমিকা ও সম্ভাবনাগত ধারণাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রথম ধরনের বিশ্বাস এই দ্বিতীয় ধরনের বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে– যেমন, একটি বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী একজন কবি তাঁর ব্যক্তিগত-আচরণ ও কবিতা লেখা এই উভয় ক্ষেত্রেই সেই সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় কর্মী হতে পারেন এবং কবিতাকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন। এই ধরনের ব্যবহারের ফলে তাঁর কবিতার বিশেষ আঙ্গিক গড়ে উঠতে পারে, কবিতায় বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে এবং সেই কবিতা বিশেষ ধরনের পাঠককে মনে রেখে রচিত হতে পারে। এই বিশ্বাসের যদি কখনো পরিবর্তন ঘটে, তা হলে কবিতার আঙ্গিক ও প্রকরণের, অর্থাৎ কবিতার শৈল্পিক উপাদান ও শিল্পকৌশলের পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। পরিবর্তিত বিশ্বাসটি যদি সৎ ও গভীর না হয়, তাহলে কবির শিল্পচর্চায় তা নানা দ্বন্দ্ব, সংকট ও কূটাভাস সৃষ্টি করতে পারে। আবার কবির সততা সত্ত্বেও বস্তুভিত্তি ও বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হতে পারে কিংবা যথার্থ নয় তাঁর এমন বিশ্লেষণের কারণে তাঁর শিল্পচর্চায় ঐ বিশ্বাসটি হয় আরোপিত বলে মনে হতে পারে, নয়, যথার্থ শিল্পলাবণ্য ও প্রেক্ষিত আবিষ্কারে ব্যর্থতা আসতে পারে।

উপন্যাসের দর্শন

সৈয়দ আজিজুল হক

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। আধুনিক কালের জীবনজিজ্ঞাসাকে ধারণ করেই শিল্পপ্রকরণ হিসেবে উপন্যাসের যাত্রা শুরু। সুতরাং আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্যকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারলে উপন্যাসের মর্ম অনুধাবনও সহজ হয়।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগকে পৃথক করেছে রেনেসাঁ। রেনেসাঁর মূল কথা মানববাদ। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাস যে-কথা বলেছিলেন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য,

তাহার উপরে নাই।' – এটিই রেনেসাঁর মর্মবাণী। মধ্যযুগের কবির ওই বাণীটি মধ্যযুগের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এটি আধুনিক কালেরই সারকথা। কেননা মধ্যযুগে 'সবার উপরে ঈশ্বর বা ধর্ম সত্য' ছিল, মানুষ নয়। রেনেসাঁ রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে দিয়েছিল। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের উপর ছিল ধর্মের সর্বময় কর্তৃত্ব। ফলে বিজ্ঞান, দর্শন ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। যেমন, 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে' বা আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি-সংক্রান্ত ধারণা ব্যক্ত করার জন্য বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে দণ্ড পেতে হয়েছিল। রেনেসাঁ এই কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছিল ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাতে ত্বরান্বিত হয়েছিল দর্শন-বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সকল শাখার বিকাশ। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর আস্থাশীল হয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার ব্যাপারে অদম্য হয়ে ওঠার ফলে সূচিত হয়েছিল যন্ত্রসভ্যতার, আর সফল হয়েছিল ইওরোপের শিল্পবিপ্লব। কলম্বাস ও ভাস্কো-দ্য-গামা যে-অসীম সাহস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সমুদ্রপথে এবং আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা ও ভারত, তার পেছনে ছিল বিজ্ঞানীদেরই অনুপ্রেরণা। বিজ্ঞানীরাই এসব নাবিককে অকুতোভয় করে তুলেছিলেন এই বলে যে, পৃথিবী গোলাকার, সুতরাং বেরিয়ে পড়ো, হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। আরেকটি কথা বলেছিলেন দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন। তা হল: 'নলেজ ইজ পাওয়ার' অর্থাৎ 'জ্ঞানই শক্তি'। আধুনিক কালের ইওরোপের জিজ্ঞাসু মনের কাছে এই কথাটিও অসাধারণ আবেদন সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর জ্ঞানের সব শাখার উন্নতিসাধনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইওরোপের শিক্ষিত সমাজ। জ্ঞান আহরণে তারা হয়ে উঠেছিল অদম্য। রাষ্ট্রের ওপর থেকে ধর্মের কর্তৃত্বের অবসান ঘটায় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দানে রাষ্ট্রের আর কোনো বাধা ছিল না। ফলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল বাধাহীনভাবে।

অতঃপর জ্ঞানের শক্তি দিয়েই ইওরোপ পৃথিবী জয় করেছে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব করেছে, অন্যান্য অঞ্চলকে শাসন ও শোষণ করেছে। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আস্থাশীল হতে পেরেছে। যদিও ধর্মগ্রন্থেও মানুষকে 'সৃষ্টির সেরা জীব' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার দেওয়া হয়নি। রেনেসাঁ, তজ্জাত সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিল্পবিপ্লব প্রভৃতি মানুষকে সেই শ্রেষ্ঠত্বের ও শক্তি প্রয়োগের অধিকার দিয়েছে। প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক-কোষ সবচেয়ে উন্নত, এবং তারই রয়েছে অসীম কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা– এই বিজ্ঞানচেতনার সূত্র ধরেই মানুষ তার অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনাকে বারবার পরীক্ষার সম্মুখীন করে প্রমাণ করেছে তার অজেয় বৈশিষ্ট্যকে। এভাবেই মানুষ হয়ে উঠেছে সর্বাধিক শক্তিমান।

আধুনিক কালের এই সর্বাধিক শক্তিমান মানুষই উপন্যাসের আরাধ্য। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ, কামনা-বাসনা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নপূরণের উল্লাস ও তার অচরিতার্থতাজনিত যন্ত্রণা– এসবই উপন্যাসের অন্বিষ্ট। মানুষের জীবন যেহেতু বৈচিত্র্যময়, রহস্যপূর্ণ এবং সীমাহীন জটিলতার সমাহার আর এ-কারণেই তা

কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থের মাধ্যমে নয় বিশ্লেষণসাধ্য, সেহেতু এই জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা উপন্যাস নামক শিল্পপ্রকরণটিকেও কোনো বিশেষ সংজ্ঞার্থ দ্বারা মূল্যায়ন করা বা সার্বিকভাবে তার রসোপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মানুষের বিপুল বৈচিত্র্যঋদ্ধ জীবনকে উপন্যাস-কাঠামোয় যথাযথভাবে রূপায়িত করার জন্য ঔপন্যাসিককে হতে হয় সর্বসংস্কারমুক্ত, উদারনৈতিক ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী। ঔপন্যাসিককে হতে হয় সর্বগ্রাহী ও সর্বত্রচারী। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-গোত্র ও জাতিগত যে-কোনো প্রকার ক্ষুদ্রতা-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হয় তাকে। ওইসব বাইরের পরিচয়কে সরিয়ে দিয়ে ভেতরের মানুষটিকে যথার্থভাবে উন্মোচন করাই ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। এই সর্বগ্রাহী বৈশিষ্ট্যের কারণেই উপন্যাসে অন্বিষ্ট হয় পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবীসহ সব ধরনের পেশার সব মানুষ। সেখানে রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান, শিল্পপতি, পুঁজিপতি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিক্ষাবিদের পাশাপাশি অবস্থান করে কৃষক, শ্রমিক, মুটে, মজুর, জেলে, তাঁতি, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, নাপিত, ধোপা, বারবনিতা, ডোম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ থেকে অস্পৃশ্য সবাই। অর্থ, বিত্ত, পেশা, শিক্ষা, বংশ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এগুলো মানুষের প্রকৃত পরিচয়ের মাপকাঠি নয়। মানুষ ক্ষুদ্র কি মহৎ তা মনুষ্যত্ববোধের মানদণ্ডেই বিচার্য। আসল কথা, বিশ্ব মানবাত্মার স্পন্দন যদি ঔপন্যাসিকের হৃদয়ে যথার্থভাবে বাজে তাহলেই তিনি হয়ে ওঠেন সার্থক।

মানুষের জীবনকে সামগ্রিকভাবে রূপায়িত করাই ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ফলে একপেশে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে তাকে প্রয়োগ করতে হয় বহুমাত্রিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিবিন্দু। মানুষের জীবন যে প্রগাঢ়ভাবে দ্বন্দ্বময়, সে-সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হয় তাকে। এই দ্বন্দ্বময় সত্তার একপিঠে যদি থাকে সততা তাহলে আরেক পিঠে থাকে অসততা, একপিঠে যদি থাকে নীতিনিষ্ঠা তো আরেক পিঠে থাকে নীতিহীনতা, একপিঠে যদি থাকে শুভবোধ তো অন্য পিঠে থাকে অমঙ্গলের হাতছানি। প্রকৃতঅর্থে মানুষ শুধু নীতিবানও নয়, শুধু নীতিদুষ্টও নয়; শুধু দেবতা নয়, শুধু দানবও নয়। দেবতা ও দানবের সমাহার মানুষ। মানুষের এই বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বাক্রান্ত বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে পারলেই ঔপন্যাসিকের পক্ষে জীবনকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, পরিহার করা সহজ হয় একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।

উপন্যাসে জীবন সম্পর্কে সামগ্রিকতার বোধ সৃষ্টি করা হয় আরো একভাবে। উপন্যাসে কেবল জীবনই চিত্রিত হয় না, চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনও প্রতিফলিত হয়। সুতরাং চিত্রিত জীবন ও জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের দর্শন এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি হয় জীবনসম্পর্কিত এক সামগ্রিক বোধ।

উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচার-আচরণ-উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি চরিত্রকে তার স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তুলতে হয়। প্রতিটি মানুষ যে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সৃষ্টির সেই বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করা ঔপন্যাসিকের জন্য জরুরি। প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে তার রুচিবোধে, সৌন্দর্যচেতনায়, তার

ভাষাভঙ্গিতে। চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যকে রূপায়িত করার জন্য উপন্যাসে ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টির বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, ঔপন্যাসিকের নিজের একটি ভাষা থাকে, তা থেকে চরিত্রের ভাষাকে পৃথক করে তুলতে হয়। এ-কারণেই উপন্যাসের বিবরণ-অংশের ভাষার সঙ্গে চরিত্রের সংলাপের (dialogue) ভাষায় কিংবা চরিত্রের আত্মকথনের (monologue) ভাষায় পার্থক্য সূচিত হয়। দ্বিতীয়ত, একটি উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী-স্তর-অবস্থান ও অঞ্চলের চরিত্র থাকে। চরিত্রের উচ্চারিত সংলাপের ভিন্নতা দিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এভাবে কোনো অঞ্চলবিশেষকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসের ভাষা হয়ে উঠতে পারে সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিকতামণ্ডিত।

মনুষ্যজীবনের সীমাহীন বৈচিত্র্যকে নিজ প্রকরণ-কাঠামোয় ধারণ করার আন্তঃগরজেই উপন্যাস হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিভিন্ন অভিধায়। যেমন: সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, রোম্যান্সধর্মী উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস প্রভৃতি।

জন্মকালীন এসব প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে করতেই উপন্যাস অগ্রসর হয়েছে। পার করেছে কয়েকটি শতক। এরই মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সূচিত বিভিন্ন মতবাদ বা আন্দোলনের তরঙ্গেও আলোড়িত হয়েছে উপন্যাসের শরীর। তাতে আপন বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয় নি উপন্যাস, বরং কালের ধারায় উত্থিত নানা নতুন চিন্তা-চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়েছে। উনিশ শতকে বাস্তববাদী ও যথাস্থিতবাদী আন্দোলনের অভিঘাত উপন্যাসের যাত্রাকে বেগবান করেছে, ঔপন্যাসিকদের চিন্তা-চেতনার ধারাকে করেছে সুতীক্ষ্ণ। উপন্যাসকে সেই জীবনের সঙ্গে আরো লগ্ন করেছে, যে-জীবন যুগ-যুগ ধরে নানা অবজ্ঞা-অবহেলা-বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার।

উনিশ শতক যেমন বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পুঁজিবাদী বিকাশের স্বর্ণযুগ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণেরও সবচেয়ে উর্বর সময়। উপন্যাস কালের এই জয়যাত্রা ও নির্মমতারও উত্তম সাক্ষী হয়ে আছে। উনিশ শতকে ডারউইনের বিবর্তনমূলক তত্ত্বের আবিষ্কার এই গ্রহের মানুষের চিন্তাজগৎকে বদলে দিয়েছে আমূলভাবে। এই তত্ত্ব জীবন সম্পর্কে মানুষের এ-যাবৎকালের ধারণায় এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। রেনেসাঁ সবকিছুর ওপরে মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যে-আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল মানুষের মনে, তাকে সর্বতোভাবে পূর্ণ করে তুলল ডারউইনের তত্ত্ব। সবচেয়ে বিকশিত মস্তিষ্ককোষ নিয়ে মানুষ যে প্রকৃতঅর্থেই সৃষ্টিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রমাণিত হল। মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রবলভাবে বাড়িয়ে তুলল ব্যাপক জীবনাগ্রহ ও জীবনতৃষ্ণা। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও তীব্রতর করে তুলল জীবনসম্পর্কিত কৌতূহল।

বিশ শতকের শুরু থেকে মানুষের মনোজগৎ নিয়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ আরেকবার বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করল ঔপন্যাসিকদের চিন্তনপ্রক্রিয়ায়।

ফ্রয়েড-উদ্ভাবিত চেতন, অবচেতন ও অচেতন-মনের এই ত্রিস্তর সম্পর্কিত নতুন ব্যাখ্যা, স্ব-বিশ্লেষণ, লিবিডো, অবদমন, ইড-ইগো-সুপার ইগোসম্পর্কিত ব্যাখ্যা, মনোবিকলন প্রভৃতির আলোকে মানবমনকে ব্যবচ্ছেদ করার এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল ঔপন্যাসিকদের সামনে। অতঃপর জীবনের বহির্বাস্তবতা অপেক্ষা উপন্যাসে প্রাধান্য পেতে থাকল মানুষের অন্তর্বাস্তবতা বা মনোবাস্তবতা। ঔপন্যাসিকদের সামনে ক্রমে উন্মোচিত হতে থাকল মানবমনের বিচিত্র, জটিল ও গভীর রহস্যময় প্রান্তসমূহ। এভাবে উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসে আগমন ঘটল চেতনাপ্রবাহ (stream of consciousness) রীতির, তাতে ভেঙে গেল কালপরম্পরা, প্রাধান্য পেল চিন্তা বা কল্পনার উল্লম্ফনধর্মিতা। একই প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসে সূচিত হল চরিত্রের আত্মকথন রীতি। বিশ শতকে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহ, শিল্প-সাহিত্যে নানারূপ মতবাদের (যেমন: কিউবিজম, ফবিজম, ডাডাইজম, ফিউচারিজম, এক্সপ্রেশনিজম, এক্সিস্ট্যান্সিয়ালিজম, সুররিয়ালিজম প্রভৃতি) আবির্ভাব এবং দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের নেতিবাচক ঘটনার যৌথ সমবায়ে ভেঙে পড়ল উনিশ শতকে গড়ে-ওঠা উপন্যাসশৈলীর ধারণাসমূহ। সংকুচিত হল গল্প বলার প্রবণতা, রদ হল আখ্যানের বিস্তার, কাহিনীবয়নে আরাধ্য হয়ে উঠল সংক্ষিপ্ত কালপরিসর। পরিহৃত হল ঘটনামুখ্যতা। পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মানবমনে ঘটনার প্রতিক্রিয়াবিশ্লেষণ। এসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল anti-novel ধারণার। একই প্রক্রিয়ায় anti-hero, anti-romantic ধারণাসমূহেরও উৎপত্তি ঘটল। পাল্টে গেল দীর্ঘকাল ধরে গড়ে-ওঠা প্রতিষ্ঠিত সব রীতি-নীতির কাঠামো।

মানব-মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় প্রান্তসমূহ ব্যবচ্ছেদের এই বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনার মধ্যেই সংঘটিত হল রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) মতো দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা। রুশ বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মানুষ ও তাদের প্রতি সহমর্মী মধ্যবিত্তের মনে যে আশার সঞ্চার ঘটাল তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ল উপন্যাসেও। ঔপন্যাসিকেরা সচেতন হলেন শোষণ সম্পর্কে, শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মনে যে-হতাশা, নৈরাশ্যবোধ, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, অনিকেতচেতনা তীব্রতর করেছিল, সভ্যতার সদর্থক অগ্রগতি সম্পর্কে জাগ্রত করেছিল এক প্রবল প্রশ্ন, রুশ বিপ্লব সেক্ষেত্রে নিয়ে এল এক নতুন বাণী। সূচনা ঘটাল বলিষ্ঠ, ইতিবাচক ও আশাবাদী জীবনভাবনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন এক যুগের। ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল চির অবজ্ঞেয়, শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের ওপর। সভ্যতা নির্মাণে পরিশ্রমজীবী মানুষের ভূমিকাই যে-গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্পর্কে বৃদ্ধি পেল ঔপন্যাসিকদের সচেতনতা। ওই জীবনের মধ্যেই দৃষ্টিভূত হল সুস্থতার সকল বীজ। একটি কল্যাণময় সমাজ গঠন করতে হলে প্রচলিত শোষণমূলক রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন যে-অবশ্যম্ভাবী, এবং তা সাধনে শ্রমশীল মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির যথাযথ প্রয়োগও

যে-অনিবার্য সে-সম্পর্কেও সৃষ্টি হল নতুন ধরনের উপলব্ধি। অতঃপর নিম্নশ্রেণীর মানুষের জয়গানে মুখরিত হল উপন্যাস। শোষণমূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তারা যতই হোক বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার, উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে তারা অধিষ্ঠিত হল দেবতার রাজকীয় মর্যাদায়। উপন্যাসে সৃষ্টি হল নতুন এক বাস্তবতা, যার নাম সমাজবাস্তবতা, এবং তারই উচ্চতর রূপ : সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।

এভাবে বিশ শতকের উপন্যাসে এই দুই ধারার উপস্থিতিই প্রবলভাবে আমরা লক্ষ্য করি। একদিকে মনোবাস্তবতা, আরেকদিকে সমাজবাস্তবতা। কখনো এই দুই ধারা সমান্তরালভাবে অগ্রসরমান, আবার কখনো একই ঔপন্যাসিকের নানা রচনায় লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এই দুই ধারার উপস্থিতি, আবার কখনো একই উপন্যাসে ঘটে এই উভয় ধারার সার্থক সমন্বয়।

অতঃপর বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে এসে বাখতিনের উপন্যাস-ভাবনার কথা প্রকাশিত হলে তা ইওরোপ-আমেরিকায় রীতিমতো ঝড় তোলে। যদিও বাখতিনের চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব ঘটে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে, কিন্তু দীর্ঘকাল তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ছিল অপ্রকাশিত। রুশ চিন্তাবিদ মিখাইল বাখতিন দস্তয়েভস্কির উপন্যাস বিশ্লেষণসূত্রে উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে এমন কিছু মৌলিক চিন্তার জন্ম দেন যা উপন্যাসের উদ্ভবসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। উপন্যাসে বিধৃত চরিত্রের সংলাপে ভাষার যে-বহুমাত্রিকতা তিনি আবিষ্কার করেন তার নাম দেন 'বহুস্বরিকতা'। তিনি বলতে চান, এই বহুস্বরিক ভাষা সৃষ্টির মধ্যেই একটি সার্থক উপন্যাসের প্রাণবীজ নিহিত। এই বহুস্বরিক ভাষাসূত্রেই তিনি আধুনিক কালে উপন্যাসের সৃষ্টিসংক্রান্ত ধারণাকে ভ্রান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। আঠারো শতকে ফিলডিং-রিচার্ডসন প্রমুখের রচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক অর্থে উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবসংক্রান্ত ঐতিহাসিক সূত্রকে বাখতিন অগ্রাহ্য করেন। বরং উপন্যাসের মধ্যে এমন একটি প্রক্রিয়ার সন্ধান তিনি পান, যার কালসীমা বিস্তৃত প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে বর্তমান অবধি। এই ধারণাসূত্রেই প্লেটো-সৃষ্ট সক্রেটিসের সংলাপের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। বহুস্বরসংগতির (পলিফনি) পাশাপাশি তিনি উপন্যাসতত্ত্ব গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে সাহিত্যের কার্নিভালাইজেশনের ধারণা তুলে ধরেন। কার্নিভাল লোকসংস্কৃতিরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং তা এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে রঙ্গমঞ্চ, অনুষ্ঠানকারী, তার পাদপ্রদীপের আলো ও দর্শকদের মধ্যে থাকে না কোনোই পার্থক্য বা আড়াল, প্রত্যেকেই হয়ে ওঠে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ঘটে চিন্তা-ভাবনা-আবেগ-অনুভূতির। কার্নিভালাইজেশনের ধারণার সঙ্গে ডায়ালজিক ইমাজিনেশন যুক্ত হয়ে বহুস্বরিকতার বিষয়টি হয়ে উঠেছে আরো তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাস প্রসঙ্গে বাখতিন ব্যবহার করেছেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা-তত্ত্বের অংশ ক্রোনোটোপ বা কাল ও পরিসরের ধারণাকেও। এতে তাঁর উপন্যাস-ভাবনা হয়েছে আরো সমৃদ্ধ।

সন্দেহ নেই, বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব উপন্যাসের স্বরূপ-উপলব্ধির ক্ষেত্রে উন্মোচন করেছে সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত। উপন্যাস-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্লট, কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র-চরিত্রায়ণ, দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যারীতির ব্যবহারসংক্রান্ত যে-রীতি প্রচলিত সেই গতানুগতিকতাকে অনেকটা পরিহার করে তিনি জোর দেন ভাষার ওপর। বাখতিন উপন্যাসকে গ্রহণ করেন মূলত ভাষাগত রচনারূপে। ভাষা তাঁর দৃষ্টিতে নিয়মতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা নয়, তা একটি সামাজিক ক্রিয়া তথা সংলাপ, যার রয়েছে একটি স্বকীয় সৃষ্টিশীল বাধাহীন গতি। বাখতিন প্রাধান্য দেন বাচনকেই। তাঁর বিচার-বিশ্লেষণে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির এই গভীর সত্যই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যে, ভাষা ও জীবন বা দ্যোতনা ও দ্যোতিতের পারস্পরিক সম্বন্ধই নির্ধারণ করে দ্যোতকের অস্তিত্ব।

এভাবেই নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার আলোকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ ও গতিশীল হয়ে চলেছে উপন্যাসের দর্শন। একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন পেছনে ফিরে তাকাই তখন দেখতে পাই যে, সৃষ্টিকাল থেকেই উপন্যাস হয়ে উঠেছে সবচেয়ে শক্তিশালী সাহিত্য-মাধ্যম। দিন যত এগিয়েছে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে তার শক্তি ও বৈচিত্র্য। শিল্পের এই প্রকরণটি সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনের সকল প্রান্তকে দৃঢ় ও গভীরভাবে স্পর্শ করার পাশাপাশি দর্শন ও বিজ্ঞানের সকল অগ্রগতিকে নিজ নান্দনিক কাঠামোয় আত্মস্থ করে হয়েছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। আশা করা যায়, একুশ শতকেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে প্রবলভাবেই।

স্থাপত্যশিল্পের দর্শন

র বি উ ল হু সা ই ন

মানুষের প্রধান পাঁচটি মৌলিক চাহিদার ভেতর বাসস্থান তিন নম্বরে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মোটামুটি সুব্যবস্থা মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আসে। বাসস্থানের পথ-পরিক্রমা এককালের পাহাড়ের গুহা, গাছের কোটর থেকে পাথর, কাঠ, ইট, লোহা, কাচ হয়ে এখন সাম্প্রতিকতম

গ্লাসফাইবারের ক্যাপসুলে রূপান্তরিত হয়েছে অনেকটা টেবিলের ড্রয়ারের কায়দায়। বাসস্থান বলতে শুধু বসবাসের অবস্থা বোঝালেও এর ভেতর কাজকর্ম, বিনোদন, মানুষের জীবনের সপক্ষে সব কর্মকাণ্ডকে বোঝানো হয়। যে শিল্পের মাধ্যমে এই ফলিত কলার চর্চা হয়ে থাকে, তাকে স্থাপত্যশিল্প বলা হয়। সভ্যতার আদিতে এর প্রথম স্ফুরণ বাসস্থানের মাধ্যমেই। এই শিল্পের অভ্যন্তরে এখনকার অন্য সব শিল্পমাধ্যম যথা চারুকলা, ভাস্কর্য মিলেমিশে ছিল। এর ভেতরে স্থাপত্যকলার অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত পরিকল্পনাবিদ্যাও।

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের মিসরীয় সভ্যতায় প্রথম স্থাপত্যকলার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রাচীনতার দিক থেকে অবশ্য আমাদের উপমহাদেশের সিন্ধুসভ্যতার মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা-ও উল্লেখযোগ্য। ফারাও সম্রাটদেরও আগে জোসের সম্রাটদের প্রধান উপদেষ্টা ইমহোটেপ, জানা মতে, পৃথিবীর প্রথম স্থপতি। তবে তিনি শুধু স্থপতিই ছিলেন না, একাধারে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, রাজনীতিজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। ইমহোটেপের পরিকল্পনায় সিঁড়িভাঙা পিরামিড, মিশরের সাককারাতে যেটি অবস্থিত সেটি পিরামিডের আদি রূপ। কিন্তু বেশি পরিচিত গিজাবস্থিত তিনটি পিরামিডের দল। আগে যেমন স্থাপত্য, চারুকলা, দেয়ালচিত্র, ভাস্কর্য সব শিল্পকলা একই দালানে গ্রথিত থাকত, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই একই পরিকল্পকদের মাঝে এইসব গুণের সমাহার হত এবং এজন্যই তখন স্থপতিকে একাধারে পরিকল্পক, স্থপতি, ভাস্কর, শিল্পী সবই হতে হত এবং তাই গ্রীক স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ ভিট্রুভিয়াস তাঁর স্থাপত্যকলা-সম্বন্ধীয় পুস্তকে ভবিষ্যতের স্থপতিদের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য থেকে ভূগোল, ভূগঠনশাস্ত্র থেকে চিকিৎসাবিদ্যা পর্যন্ত আয়ত্ত করতে বলেছেন। আমাদের এই ভূখণ্ডের স্থাপত্যকলা-সম্বন্ধীয় সবচেয়ে প্রাচীন পুস্তক 'বাস্তুশিল্প'তেও একই ধরনের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

পলিমাটির এই দেশে কঠিন ও স্থায়ী নির্মাণ-উপকরণ সামগ্রী (যেমন পাথর, পাহাড় ইত্যাদি) নেই বলে প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি স্থায়িত্ব লাভ করেনি এবং এই কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত উৎকর্ষ সাধনও হয়নি এদেশে; আর সেই জন্যে অনেকে বলে থাকেন, চিরকাল স্থাপত্যশিল্প এদেশে লোকজ শিল্পের আওতায় থেকে গেছে। কিন্তু একথা ভ্রান্ত। লোকজ শিল্প সব দেশেই প্রধান ও মৌলিক শিল্পধারা যা জনগণের ভিতর অন্তঃস্রোতের মতো কালে কালে প্রবাহিত হয়, দৃশ্যমান সব উন্নত শিল্পকলাসমূহ এই ধারা থেকে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশের শক্তিশালী লোকজ শিল্প সবসময়ই আমাদের অহঙ্কার। তাই প্রাচীন মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতির দুর্লভ স্থাপত্যনিদর্শন এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল এবং কালের গহ্বরে সে-সব কীর্তি তলিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তার যে ছিটেফোঁটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা জলকণা দেখে বিশাল সমুদ্রের দেখা পাওয়ার মতো।

দারিদ্র্য আর রোদে শুকোনো বা আগুনে পোড়ানো নির্মাণ-উপকরণ লাল রংয়ের ইট আমাদের ঐতিহ্য। প্রায় ২৩০০ বছর আগেকার মহাস্থানগড় ও পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মানুষের হাতে তৈরি স্থাপত্য নির্মাণ-উপকরণ এই ইট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। যেমন বিভিন্ন বৌদ্ধ, হিন্দু মন্দির, রাজাদের প্রাসাদ, নাচঘর, গুমঘর ইত্যাদি। প্রধান মন্দিরের চূড়া প্রায় দু'শ ফুট উঁচু ছিল। সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাং সেটির বর্ণনা করে গেছেন। নদী, নাব্য জলাভূমি, অসংখ্য নদীর জালে জড়ানো এবং মৌসুমী-ভেজা-আবহাওয়া আর ক্রমাগত বৃষ্টির এই দেশে যে-কোনো স্থাপত্য কীর্তি স্বাভাবিকভাবেই কালের গর্ভে তলিয়ে যায়। আমাদের বহু কীর্তি তাই নদী আর আবহাওয়ার শিকার হয়ে গেছে, সেগুলো থাকলে এই দেশের মানুষ যে ঐতিহ্যহীনতা গূঢ়ৈষায় ভোগে সেটি বোধ হয় হত না এবং বোধ হয় এই সব প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণ-সম্বলিত মৌসুমী আবহাওয়ামণ্ডিত সব দেশের মানুষের একই রোগ –ঐতিহ্যহীনতা। সব দেশের স্থাপত্যশিল্পের মূলকথা দেশের প্রকৃতি, আবহাওয়া, নির্মাণ-সামগ্রীর প্রতুলতা এবং সেই দেশের মানুষের ইচ্ছা, রুচি, জীবনযাপন-প্রণালী ইত্যাদির সাথে একীভূত হওয়া। মূলত ব্যবহার্য বিষয় ও করণকার্যের সাথে নির্মাণউপকরণের গঠনপ্রণালীর সুসামঞ্জস্যতা। আমাদের দেশে আবহমান কাল থেকে ব্যবহৃত লোকজ স্থাপত্যকলা অর্থাৎ খড়ের ঘর যা প্রধানত বাঁশ, মাটি, খড়, পাট বা বেতের দড়ি মাত্র এই চারটি নির্মাণ-সামগ্রী দিয়ে নির্মিত। এই খড়ের ঘরের স্থাপত্যউৎকর্ষ একসময় এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যা এখনকার এই শ্রমবিমুখ ও সততাহীন যুগে ভাবতে বিস্ময়কর লাগে। মাটির দেয়াল ও খড়ের চালের ঢালু এমনভাবে মসৃণ করা হত অভিজ্ঞ ও কুশল কারিগরদের দিয়ে যে তা পরীক্ষার জন্যে দেয়ালে পিঁপড়ের ঝাঁক আর চালে পয়সা ছেড়ে দেওয়া হত, সেই দেয়াল বেয়ে পিঁপড়ে উঠতে পারত না আর সেই চালে পয়সা কখনও আটকে থাকত না, সড়সড় করে নিচে গড়িয়ে পড়ত।

খনার বচনের দক্ষিণদুয়ারী নিমের গাছ-বাহিত দক্ষিণের হাওয়া, পূর্বে রোদ আর বাতাস যুগ যুগ ধরে দেশের বাসগৃহের আদর্শ ও প্রকৃত অবস্থানকে নির্দেশ করে গেছে, এবং তা এই যুগের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কালেও অব্যর্থ ধন্বন্তরী। আসলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয় বরং প্রকৃতির সপক্ষে তাকে কেন্দ্র করে, মানুষের স্বভাব, আচার-আচরণ, জীবন-প্রণালী ও ইচ্ছার অপর বিন্দুতে নয় বরং মানুষের কেন্দ্রবিন্দুকে সাথে নিয়েই প্রকৃত স্থাপত্যকলা সৃষ্টি হয়। এবং সেই জন্যেই এদেশের পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহার সেই প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনুপম স্থাপত্যনিদর্শন হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল যা পরবর্তী যুগে কম্পুচিয়ার এ্যাংকর ওয়াট, এ্যাংকর খম্বু বা সুদুর জাভা দ্বীপের বরোবুদুর মন্দির পর্যন্ত তার গঠনশৈলী বিস্তৃত হয়েছিল। আর এদেশের খড়ের চালের বাঁকা ছাদ মোগলদের ফতেপুর সিক্রির প্রায় প্রতিটি দালান হয়ে অসংখ্য স্থাপত্য-উৎকর্ষ-সমৃদ্ধ নগরে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল।

দুই

ক.

স্বাধীনতার তিনযুগ পরেও ইংরেজি ভাষার ভূত আমাদের বিবেক থেকে নামল না। তথাকথিত চটপটে করিৎকর্মা মানুষের ইংরেজি বচন অবশ্যই থাকতে হবে, এমনি আমাদের ধারণা। জ্ঞানী ও বিবেকবানদের এই ভাষা না থাকলে তারা ঐসবের পদবাচ্য নয়, যে-কোনো শিক্ষা বা শিল্প-মাধ্যমে এই কথা আজ এদেশে সমূলে প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজির স্যার, ফরাসির মঁসিয়ে কিংবা জার্মানির হের– এই সবের ভেতরে ওপারের মহাশয়, আমাদের জনাব, সাহেব ছাড়া সুধি বা মহাজন পর্যন্ত এসে দাঁড়ায়নি– এমনি যখন অবস্থা, তখন নিজেদের ভাষায় সবকিছুকে আয়ত্তে আনা আজ অসম্ভব মনে হয় যদি ওদের দিকে সর্বদাই তাকিয়ে থাকি। হীনমন্যতা-প্রসূত এই সব কৃত্রিম বোধানুভব একটি স্বাধীন দেশের মানুষদের সাজে না, একথা আমরা সবাই জানি, বুঝি; কিন্তু বাস্তবে করতে পারি না বা করতে পারার প্রয়াস আমাদের মধ্যে নেই।

আসলে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই আমাদের বাধ্যবাধকতা নেই; বাঁধ বাঁধলে যেমন জল ফুলে-ফেঁপে ওঠে, তেমনি একটি শক্ত বাঁধের গোড়াপত্তন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতিগতভাবে হয়ে ওঠেনি। এই অবস্থাটা যতদিন পর্যন্ত-না নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে ততদিন পর্যন্ত সঙ্কর ঐতিহ্য চলতেই থাকবে।

একদা আমাদের নিজস্ব অনেক কিছুই ছিল; আমাদের মসলিন দিয়ে গ্রীক সুন্দরীরা তাদের স্বচ্ছ-যৌবনোদ্দীপক তনুদেহ আবৃত করে রাখত, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ছাত্ররা পড়তে আসত, নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মুখের দর্শনগত কথাবার্তা শুনে ভিনদেশের শিক্ষিত মানুষেরা অবাক হয়ে যেত এবং তদানীন্তন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহর ও তার লোকসংখ্যা তদানীন্তন লন্ডন শহরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধিশালী ও বেশি ছিল। এখনকার সময়ে এই পঙ্গু স্মৃতিসভায় এসবের কোনো মূল্য নেই। তবু হীনমন্যতার বিরুদ্ধে সাহস যোগানোর উপচারে এর মূল্য বোধ করি একটু আছে। প্রথমে সংস্কৃত, তারপর ফারসি এবং তারপর ইংরেজির ক্রমবহমান দাপট আমাদের ভাষাকে সর্বদাই দুর্বল করে রেখেছিল; তাই এতদিন পর নিজেদের চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেদেরই ভয়াবহ দৈন্যদশা চোখে পড়ছে। প্রতি পদে হোঁচট খেতে-খেতে নগ্ন পদযুগল আঙুলহীন হয়ে পড়েছে, পরিবর্তে পশ্চাদ্দেশে আবির্ভাব হয়েছে ইংরেজি এবং অন্যান্য ভিনদেশীয় লাঙুলসদৃশ ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির। এবং উল্টো-বিবর্তনে মানুষ এখন শাখামৃগে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

মানুষের স্বভাবই স্বাধীন ও স্বাভাবিক, ঠিক প্রকৃতি যেমন। প্রকৃতি থেকে সে আলাদা কোনো বস্তু নয়, প্রকৃতিগতভাবে তার কাছে চিন্তাশক্তি ও অনুভবের ক্ষমতা আছে বলেই সে একটু ভিন্ন গোছের; তাই বলে সে প্রকৃতির গোত্র-বহির্ভূত কোনো কিছু নয়। বরং এই ক্ষমতা আছে বলেই সে বেঁচে ও টিকে থাকার সমস্যায় জর্জরিত। তাকে

তাই প্রকৃতির ওপর প্রতিপদে নির্ভরশীল হতে হয়; এভাবেই তার ক্রমোন্নতি ও পরিবর্তিত একেকটি স্তরের ভেতর দিয়ে ক্রমশ সভ্যতা, শিক্ষা, ভাষা নিজের মতো ক'রে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যে আবিষ্কার করতে হয় এবং সেইমতো এজন্যে বিভিন্ন প্রকৃতিগত অবস্থা, ভৌগোলিক পার্থক্য থেকে মানুষেরা নিজেদের পৃথক পৃথক সীমারেখা তৈরি করে থাকে। সেইহেতু মানুষেরা তার আপন আপন সৃষ্ট ভাষাতে ও সংস্কৃতিতে বেশি সাবলীল সৃষ্টিশীল এবং জীবনবোধের স্বাভাবিক উষ্ণতায় সাধারণত পারঙ্গম হয়। এখন একটি মানুষকে তার সৃষ্ট আপন জগৎ থেকে বিচ্যুত করে অন্য আরেকটি ভিন্ন জাতের পরিবেশ ও কৃষ্টিতে জোরপূর্বক নিয়ে এলে সে স্বাভাবিক কারণেই হয়ে উঠবে নির্জীব, জড় ও বীর্যহীন যেমনটি আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে।

খ.

স্থাপত্যের ভাষা সাধারণত আঁকাআঁকি। আঁকাআঁকি বা অঙ্কন-পদ্ধতি যেখানে অপারগ বা অনুপযুক্ত সেখানে সাধারণত ভাষার দরকার হয়। এখন মজা হচ্ছে, অঙ্কনের রীতি সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক, সব দেশ ও ভাষাতে এর রূপ একই; কারণ তিনটি মৌলিক আকার যথা ত্রিভুজ, বর্গ, বৃত্ত এবং সব ব্যঞ্জনের হলুদমণি বিন্দু ও রেখা সব আকারেরই মূল গঠন-উপকরণ যা সর্বজায়গাতে, সর্বপরিবেশে একই। এসব কারণে হয়তো স্থাপত্যের মূল শিক্ষা বাংলাভাষায় সেইমতো সরাসরি প্রয়োগে কোনো ভূমিকা রাখছে না ঠিকই, তবে প্রয়োগ-কৌশলের জন্যে ভাষাকে গতিশীল ও কমুনিকেটিভ হওয়া জরুরি, যা দিয়ে শিক্ষানুরাগীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, তা প্রাঞ্জল ও যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। আর এ জন্যে আমাদেরকে মাতৃভাষার পদপ্রান্তে যাওয়া ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে? এখন যেহেতু স্থাপত্যশিক্ষা এবং অন্যান্য অগ্রসর আধুনিক বিষয়াবলি আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় একেবারেই নতুন সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু স্থাপত্যের বিশেষ করে যথোপযুক্ত সংজ্ঞা, বিবরণ, বিষয়ের বিভিন্ন মূল প্রয়োগপদ্ধতির দিক-নির্দেশনা ও চিহ্নিতকরণ বিদেশী ভাষায় লালিত ও পরিচালিত। আমাদের একদা ঐতিহ্যশালী গরিমাময় শত শত বৎসরের স্থাপত্যশৈলী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে পরিচর্যার অভাবে আজ ছিন্নসূত্র। স্বাধীনতা পাওয়ার পরপরই এইসব নিজস্ব ফেলে-আসা ঐতিহ্যের স্বরূপসন্ধানে আমরা আত্মনিয়োগ করেছি। এমতাবস্থায় প্রায় সবকিছু আধুনিক চলতি হাওয়ারই পন্থী; এবং সমসাময়িক বিষয়াবলি নিতে হবে অন্যান্য ভাষা ও দেশ থেকেই; এটা আমাদের জরুরি ও আশু কর্তব্য।

স্থাপত্যশিল্প একটি সামাজিক ও ব্যবহারিক শিল্প। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অভ্যাস ও সামাজিক রূপের মূল কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন স্থাপত্য গঠিত হয়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গঠন-উপকরণ দিয়ে স্থাপত্য আকার পায়; তাই তার ভাষা ও যোগাযোগের কর্মকাণ্ডও মানুষের ভাষা ছাড়াও নির্মাণসামগ্রী, নির্মাণপদ্ধতির ভাষার ওপর নির্ভর করে থাকে। স্থাপত্যদিক দিয়ে বিচার করলে সেই ভাষাই আসল স্থাপত্যের

মাতৃভাষা যা দিয়ে দেশ, সমাজ, সংস্কৃতিরূপের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। এখনকার আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ-ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ সাধনের ফলে স্থাপত্যের রূপ দেশে দেশে প্রায় একই। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে যে দেশগুলো বহুদিন পরাধীন থাকার পর সদ্য-স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেইসব দেশের মানুষেরা নিজেদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নিজস্ব ভাষা খুঁজে পেতে সজাগ হচ্ছে ধীরে ধীরে।

আজ আমাদের দেশে স্থাপত্যশিল্পের ভাষা হিসেবে দু'টি সমস্যা; এক, শিক্ষালাভের মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার; আরেকটি, স্থাপত্যের নিজস্ব দেশীয় ভাষা। প্রথমটির প্রয়োগে শুধুমাত্র বাধ্যবাধকতা দরকার, আর কিছু নয়। এবং কার্যক্ষেত্রে প্রেক্ষিতরূপ, উন্নতি, চ্ছেদ, পরিকল্পনা– এই ধরনের ভাষা যা প্রায়শ ব্যবহার হয় স্থাপত্যশিক্ষায়, তার প্রচলন অনেক স্থপতিই তাঁদের আঁকা কাগজে অনেক আগে থেকেই ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু দ্বিতীয়টির রূপ খুব কঠিন, জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। এর রূপ সঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হ'য়ে বহু অভ্যাস ও ব্যবহারের পর সাধারণত রূপ নিয়ে থাকে এবং সেটিই স্থাপত্যের মূল মাতৃভাষা।

তিন

বাংলাদেশে এখন যে স্থাপত্যরীতি ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে এককথায় মিশ্ররীতি বলে অভিহিত করা যায়। স্থপতিদের ব্যবহার্য মাধ্যমে এবং তাদের কর্মে তা-ই প্রকাশ পাচ্ছে। বর্তমানে স্থাপত্যশিল্প আধুনিকতা, ঐতিহ্য, স্থানীয় রীতি-কৌশল এবং বহুবিধ অংশগ্রহণের সঙ্গে মিশেল বা অমিশেলে নির্মিত হচ্ছে। এই পটভূমিতে স্থপতিদেরকে তাদের কাজের মাধ্যমে সজাগ হতে হবে সঠিক পথটি খুঁজে বের করার লক্ষ্যে যা অর্জিত হবে জনগণ, মাটি, প্রেক্ষিত, সমাজ ও ঐতিহ্য অনুসারে এবং তা অর্জন করতে হবে এই আধুনিক ও সাম্প্রতিক বিশ্ব-পরিবেশের মধ্যে বসবাস করেই। বাঙালি সংস্কৃতি, পশ্চিমা আধুনিকতা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভেতরে থেকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেই অনিষ্ট পথকে।

বাংলাদেশের স্থাপত্য, সাহিত্য, শিল্প-বিষয়াদিতে একসময় গৌরবময় ও সোনালি ঐতিহ্য ছিল যা মহাস্থানগড়ে খৃ: পূ: তৃতীয় শতাব্দী এবং পাল আমলের ৭৫০ – ১১৬১ খৃস্টাব্দে বিকশিত হয়েছিল। এরপর সুলতানী আমলে, যদিও তারা এদেশের মূল অধিবাসী ছিল না তবুও সেই কাল বাঙালি শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্যের সোনালি যুগ হিসাবে পরিচিত। ইলিয়াস শাহী আমলে ১৩৪২ – ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে বাঙালি শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই যুগ সত্যিকারের মূল বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি ও আর্থ-রাজনৈতিক সভ্যতা বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে তোলে।

এই সোনালি সূত্রের পরম্পরা ইংরেজ আমল থেকে ধীরে ধীরে ছিন্ন হতে থাকে এবং তা পাকিস্তানী আমলের দীর্ঘ সামরিক শাসনকালে আরো তীব্রতর হয়। ইংরেজ

আমলে প্রথমবারের মতো ঢাকায় ইউরোপীয় স্থাপত্যের সূচনা হয়। একধরনের মিশ্র স্থাপত্যকলা অনুসরিত হতে থাকে। মোঘল থেকে শুরু করে গ্রীসীয়, রোমক, ভিক্টোরীয় বিভিন্ন স্থাপত্যরীতির মিশেলে ইংরেজরা স্থাপত্যকর্ম করতে থাকে। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে কার্জন হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, সেক্রেটারিয়েট ভবন, বর্তমানের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পুরনো হাইকোর্ট এবং কিছু আবাসিক এলাকায় বাড়ি-ঘর নির্মিত হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ১৯১৭ সালে পরিকল্পনাবিদ প্যাট্রিক গেডেস এবং উদ্ভিদবিদ প্রাউড উডলকের পরামর্শে ঢাকা শহরের নগর পরিকল্পনা করা হয় যেখানে রাস্তা-ঘাটসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনোদন কেন্দ্র, আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ে রমনা পার্ক এলাকাও পরিকল্পনার অধীনে আসে। ইংরেজদের উদ্ভাবিত ঐ মিশ্র স্থাপত্যরীতি দেশের অন্যান্য স্থানে দালান-কোঠায় অনুসরিত হতে থাকে, বিশেষ করে রেলওয়ে স্টেশন, কোর্ট ভবন, সার্কিট হাউজ, সরকারি অফিস, আবাসিক গৃহ, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি ভবনসমূহে। উল্লেখ্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ইংরেজরা ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে বলবৎ করে এবং এর ফলে, এক শ্রেণীর নব্যধনী সম্প্রদায় জমিদারি প্রথায় বাবু-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুধু কোলকাতা নয় দেশের সুদূরতম প্রান্তেও বিভিন্ন ধরনের দালান-কোঠা নির্মিত হয়। এসবের মধ্যে প্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির, বাগানবাড়ি, শিক্ষালয় উল্লেখযোগ্য এবং এগুলোতে মিশ্র স্থাপত্য ভিক্টোরীয় আর ইন্দো-সারাসেনিক রীতি দেখতে পাওয়া যায়। তবে একথা ভুললে চলবে না যে কালের নিয়মে এসব আমাদের স্থাপত্য ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্বকালের চব্বিশ বছর (১৯৪৭–১৯৭১) সময়ে ঢাকা শহরে প্রথমবারের মতো আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের সূচনা হয় এবং তা শুরু হয় দুটি ভবনের মধ্য দিয়ে। এর একটি হচ্ছে আর্ট ইনস্টিটিউশন ভবন এবং আর-একটি হচ্ছে বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার ভবন, যেগুলোর নকশা করেছিলেন স্থপতি মাজহারুল ইসলাম ১৯৫৪ সালে, যিনি দেশের প্রথম আধুনিক স্থপতি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। সেই সময়ে দেশে কোনো উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন স্থপতি ছিল না এবং এর ফলে ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে অনেক ভবন বিদেশি স্থপতিদের নকশা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। পাকিস্তানি আমলের প্রথম দিকে সরকারি গণপূর্ত বিভাগে প্রধান স্থপতি হিসাবে মি. হিক্স ও মি. ম্যাককোরেল ছিলেন। তারাও বিদেশি। বিদেশি স্থপতিদের দ্বারা নকশা করা অনেক উল্লেখযোগ্য ভবন পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছিল, সেসবের মধ্যে নিম্নোক্ত ভবনসমূহের নাম করা যেতে পারে:- ড্যানিয়েল ডানহাম কর্তৃক কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, বুয়েটের ছাত্রাবাস করেছেন বব বুয়ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ঢাকার হোম ইকনমিক্স্ কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লার গ্রাম উন্নয়ন একাডেমি করেছেন ডক্সিয়াডিস, ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস করেছেন পল রুডলফ, একই জায়গার একাডেমিক ভবন রিচার্ড নস্ট্রা, বুয়েটের

স্থাপত্যবিভাগ ভবন রিচার্ড ভ্রুম্যান, একই জায়গার শিক্ষকাবাস ড্যানিয়েল ডানহাম ও ওয়ালডেন, দেশের পাঁচটি শহরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর নকশা করেছেন স্ট্যানলি টাইগারম্যান ও মাজহারুল ইসলাম।

স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সেই সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, একটি হচ্ছে ১৯৬১ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ স্থাপত্যশিল্পের শিক্ষাক্রম আর অন্যটি হচ্ছে পৃথিবীখ্যাত স্থপতি লুই আই কান কর্তৃক শেরেবাংলা নগর পরিকল্পনা এবং সংসদ ভবনের নক্সানুযায়ী নির্মাণ কাজের শুভারম্ভ। এই প্রকল্প স্বাধীনতাপূর্বকালে শুরু হয়েছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পর শেষ হয়। কিছু বছর আগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দুটি প্রধান স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষালয়ের সূচনার মাধ্যমে এদেশে স্থাপত্যপেশা এবং স্থাপত্যচর্চার ক্ষেত্রে অতি উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ-সব কারণে আমরা স্থাপত্যশিল্পের বেলায় দিন-দিন স্বাবলম্বী হচ্ছি তা প্রমাণিত হয়। এই সঙ্গে বেসরকারি প্রায় ৬/৭ টি স্থাপত্য-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খুব জোরেসোরে এই শিক্ষাপরিক্রমা চলছে। এতে বোঝা যায় দেশে স্থাপত্যশিল্পে স্থপতিদের মাধ্যমে সেবাপ্রদান কার্যক্রমের অনেক সুযোগ এখনো বিদ্যমান। স্থাপত্যশিল্প হচ্ছে অন্যান্য সব শিল্পের সূতিকাগার বা মাতৃসমা এবং তা জমে-যাওয়া সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনীয়। ঢাকার শেরেবাংলা নগরে নির্মিত সংসদভবন কালজয়ী স্থাপত্য যা দেখে স্থপতিরা সব-সময় অনুপ্রাণিত বোধ করেন এবং বিংশ শতাব্দীতে নির্মিত বিশ্বের বিশটি শ্রেষ্ঠ ভবনের মধ্যে এটি হচেছ তার নিজ-স্থাপত্যগুণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভবন। এই ভবনটি সাধারণ মানুষ এবং স্থপতি ও ছাত্র-শিক্ষার্থী সবার জন্য একটি অনুপম উদাহরণ যার মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সামনে আধুনিক স্থাপত্যেরই সনাতন যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্যের সমন্বিত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে আধুনিক স্থাপত্যের প্রারম্ভকাল ছিল অপূর্ব। পঞ্চাশ দশকে আধুনিক বাঙালি স্থপতি কর্তৃক স্থাপত্যশিল্পের প্রচলন শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে বিদেশি স্থপতিরা সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে মোটামুটি সবাই দেশে আধুনিক স্থাপত্যের প্রয়োজনের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। ফলে স্থাপত্যশিল্প অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তরুণ প্রতিভাবান স্থপতিদের নক্সাকৃত ভবন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং খুব গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে, প্রায় সকল ভবন অর্থাৎ যা এখন নির্মিত হচ্ছে দেশে, সেগুলোর নক্সার মূলে আছে এই তরুণ সৃষ্টিশীল প্রতিভাদীপ্ত স্থপতিবৃন্দ এবং তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী।

মোটামুটি স্থাপত্যশিল্প বিবেচনায় সব ধরনের ভবন এদেশের স্থপতি কর্তৃক করা হচ্ছে। যদিও স্থাপত্যপেশা এখন পর্যন্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়নি। এখন পর্যন্ত 'স্থপতি আইন' সংসদে পাশ হয় নি। তবুও এতসব প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও এদেশের

স্থপতিরা একাগ্রভাবে তাদের সৃষ্টিশীল কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। একথা সত্যি যে, স্থপতিরা এখন পর্যন্ত তাদের নিজস্ব স্থাপত্যভাষা খুঁজে পাননি, তবে তারা মনপ্রাণ দিয়ে সেটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাদের কাজের মাধ্যমে। এবং এই একাগ্রতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরই জাগ্রত হয়েছে যেখানে তারা নিজের অস্তিত্ব শিকড় ও ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন সামগ্রিক পরিবেশের কারণে।

ঐতিহ্য, আধুনিকতা এবং ভবিষ্যৎ– এই ত্রিভুজ টানাপোড়েনের মধ্যে থেকেও অরাজক কোনো পথে না-গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে সেই পথ, যে পথে শত মিশেলের মধ্যেও সৃষ্টিশীলতার কারণেই ফুটে উঠবে নিজস্বতা। সেই লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার এখন সকল স্থপতির ব্রত হওয়া প্রয়োজন। এবং এ-কথা অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বাংলার শিল্পচর্চা: গীতি, নাট্য ও দর্শন

সা ই ম ন জা কা রি য়া

আজকের নিবন্ধে বাংলার শিল্পদর্শন আলোচনার অবলম্বন হিসেবে মূলত এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকে আশ্রয় করা হয়েছে। যার প্রথম বাক্যেই লিখতে হচ্ছে– বাংলার মানুষ চিরদিনই গীতিনাট্যপ্রবণ শিল্পচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই প্রাচীনকাল থেকে সাধারণ জনতার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-শিক্ষা, ধর্ম-উপাসনা, জীবনসংগ্রাম ও রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনে বাংলার মানুষ শিল্পাঙ্গিক হিসেবে গীতিনাট্য পরিবেশনার সরস ধারাকে অবলম্বন করেছিল। প্রাচীন যুগের সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক' তো নাট্যগীতির আঙ্গিকেই বৌদ্ধসহজিয়াদের সাধনপদ্ধতির কথা ব্যক্ত করেছিল, মধ্যযুগে স্বয়ং চৈতন্যদেব নাট্যাভিনয় করেছিলেন বৈষ্ণবধর্ম-উপাসনা ও 'ব্রাহ্মণ-মুসলমান শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধে'র তাগিদে। এছাড়া, প্রকৃতির শুভ ও অশুভ শক্তির সঙ্গে সহাবস্থানের তাড়নায় মধ্যযুগ থেকে অদ্যাবধি পরিবেশিত হয়ে আসছে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত বিচিত্র নাট্যধারা। এমনকি,

এদেশের ধর্মসঙ্করকালে তান্ত্রিক সাধকদের হাজার বছরের চর্চিত তত্ত্বকথার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মমতের মিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছিল নাথ নাট্যগীতি। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এ সকল তত্ত্বকথা-নির্ভর সরস নাট্যরীতির কিছু কিছু নিদর্শন নানা প্রকার ধারা-উপধারায় নবরূপে প্রবহমাণ রয়েছে। এ সকল শিল্পিত নাট্যরীতিকেই ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বলা যেতে পারে। শিল্পিত কৌশলে সরস নাট্যগীতির আশ্রয়ে তত্ত্বকথা পরিবেশন করার নিপুণতা অন্য কোনো দেশের মানুষের আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই। তবে, এ কথা সম্ভবত ঠিক, অন্যান্য জাতির মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসা যেমন দর্শনশাস্ত্রের নীরস সূত্রের রূপ লাভ করে, এদেশের মানুষের মধ্যে তা অতি সহজেই নাট্যগীতি বা গীতিময় নাট্যরীতিতে রূপ লাভ করে। তার প্রমাণ এদেশের ধর্মীয় গীতি ও ধর্মীয় আখ্যাননির্ভর নাট্যরীতির মধ্যে প্রায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। আগেই বলা হয়েছে, চর্যাপদের গানগুলো মূলত বৌদ্ধসহজিয়াদের সাধনাপদ্ধতির গূঢ় কিছু নির্দেশ মাত্র; কিন্তু এদেশের ভাবুকের জীবন-দৃষ্টি আধ্যাত্ম-চিন্তার বিশেষত্বের গুণে এটা অতি সহজেই গীত বা নাট্যগীত হয়ে উঠেছে। এমনই দৃষ্টান্ত বিবেচনায় এনে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এদেশের মানুষ প্রথম থেকেই ঐতিহ্যগতভাবে নাট্যগীতির আশ্রয়েই তার চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছে। অতএব এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার পরিচয়ের ভেতর দিয়ে এ ভূখণ্ডের সামগ্রিক পরিচয় ব্যক্ত করা সম্ভব।

আসলে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিকগণ এদেশের সামগ্রিক পরিচয়কে খণ্ড খণ্ড ভাবে ব্যক্ত করে থাকেন, তাঁদের এই অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এদেশের সামগ্রিক পরিচয় কোনোদিনই প্রকাশ পায়নি। কিন্তু যে নাট্যধারার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের ধ্যান-মানস একটি অখণ্ড পরিচয় লাভ করেছে, তার ভেতর দিয়ে একটি দেশের সামগ্রিক পরিচয় কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। চর্যাপদের এক একটি পদের ভেতর দিয়ে যেমন এদেশের মানুষের আধ্যাত্ম-পরিচয় অখণ্ড হয়ে ধরা দিয়েছে, তেমনি যুগীর গান, গাজীর গান, মানিক পীরের গান, মাদার পীরের গান, রামকীর্তন, পদ্মাপুরাণ গান, কালী কাচ, কবিগান, বিচার গান ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এদেশের মানুষের আধ্যাত্ম-হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে। সারকথা হল, ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার ভেতর দিয়ে এদেশের মানুষের ভাব-জগতের যে অখণ্ডতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা আর কোথাও সম্ভব হয়নি। সেই জন্য এদেশের ভাব-সাধনার ক্রমপরিণতির সূত্র অনুসরণ করার জন্য এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা অনুশীলন একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেবল ভাব-সাধনা ও রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে নয়, নানা ধরনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা এদেশের মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে। সুতরাং এর অনুশীলন ভিন্ন এদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের সামগ্রিক পরিচয় কোনো দিক দিয়েই লাভ করা যাবে না।

ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার একটি বড় বিশেষত্ব এই যে, নতুন নতুন যুগে উত্তীর্ণ হয়ে এর মধ্যে নতুন নতুন উপাদান-উপকরণ সংগৃহীত হয়। ফলে জীর্ণতা তাকে খুব একটা স্পর্শ করতে পারে না। এর প্রধান কারণ, ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় প্রতিদিন প্রতিটি আসরে নতুন কিছু ঘটানো হয়। যে জন্যে একই আখ্যান বারবার অভিনীত হলেও দর্শকের কাছে তা প্রতিটি আসরে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। তাই দর্শকগণ বারবার একই নাট্য দর্শনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রতিটি আসরে নতুন কিছু ঘটানোর জন্য ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অভিনেতা ও কলাকুশলীগণ সাধারণত 'দর্শকের সামগ্রিক ছন্দ, মেজাজ, ভাব ইত্যাদি' বুঝে অভিনয়ক্রিয়া করে থাকেন। এর ফলে শুধু নতুন কিছু ঘটে না, একই সঙ্গে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এক ধরনের বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। যে প্রবাহের ওপর দাঁড়িয়ে দর্শক ও অভিনেতাগণ পারস্পরিক মানসিক ঐক্যে উল্লাস, আনন্দ, শোক, দুঃখ, বিষাদ ইত্যাদি ভাব ও রসের একটি বৃত্ত তৈরি করতে সক্ষম হন, আর তখনই অভিনেতার আবেগ-কল্পনার সঙ্গে দর্শক একাত্মবোধ করেন এবং অভিনেতাও দর্শকের আগ্রহ অনুযায়ী তার অভিনয়ের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা পদাবলী কীর্তন, রামকীর্তন, ইমামযাত্রা, জারি গান, গাজীর গান, কুশান গান, রয়ানী, ভাসান যাত্রা, মাদার পীরের গান, যুগীর গান, কিচ্ছা গান, আলকাপ, সঙযাত্রা ইত্যাদি পরিবেশনার সর্বত্র এই চিত্র প্রায় একই রকমভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

আধুনিক নাট্যতাত্ত্বিকদের নাট্যসংগঠন সূত্র থেকে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই; কেননা দর্শক, অভিনেতা এবং ত্রিমাত্রিক আয়তন ছাড়া কোথাও ঐতিহ্যবাহী নাট্য উপস্থাপন করতে দেখা যায় না। এমনকি পরিবেশনামূলক শিল্প হিসেবে এর 'পরিচালক, মঞ্চপরিকল্পনা, পাণ্ডুলিপি, নাট্যকার, পোশাক সবই, সবাই গৌণ' হয়ে পড়ে। তাই তো একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার নাট্যকার ও তাঁদের রচিত পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব কম থাকে। সম্ভবত এ কারণেই আমরা হাতে পাইনি চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক'-এর পাণ্ডুলিপি, পাইনি মধ্যযুগে চৈতন্যদেব অভিনীত লীলানাট্যের পাণ্ডুলিপি। এর ব্যতিক্রম যে কখনো ঘটেনি তা কিন্তু ঠিক নয়, কেননা আমরা হাতে পেয়েছি আদিমধ্যযুগে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। গবেষকগণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অভিনয়ার্থে রচিত নাটকেরই পাণ্ডুলিপি হিসেবে একমত প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিককালে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাতেও কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি রচিত হতে দেখা যায়, তবে দু'একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন অভিনয়ের সময় তা সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয় না, প্রয়োজন পড়লে দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী তাকে বদলে নেওয়া হয়। আসলে, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত কোনো গানই হোক আর নাটকই হোক তা প্রথমে কোনো 'ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা রচিত' হবার পর 'সমষ্টিগতভাবে পুনরায় রচিত হয়।' মূলত দেশের গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত জনসমষ্টির উদ্দেশ্যেই ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা অভিনীত হয় বলেই তা সমষ্টিগতভাবে

পুনরায় রচনার প্রয়োজন পড়ে এবং এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এক-একটি নাট্যধারা সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে সজীব হয়ে থাকে।

এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার শ্রেণীকরণে ধর্মনির্ভর নাট্যের প্রসঙ্গ বেশ বিস্তৃতভাবে আসে। কিন্তু এদেশীয় ধর্মনির্ভর নাট্য প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায়–তাতে কোনো একক ধর্মমতের কথা আসে না, অন্যান্য ধর্মমতের প্রসঙ্গও ঘুরেফিরে আসে। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো, বৃহত্তর ধর্ম মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান– এ সকলের অন্তরালেও এদেশের মানুষের একটি নিজস্ব ধর্মবোধ আছে, যেখানে প্রায় সকল দেশবাসীই একাকার হয়ে আছে; সেই সূত্রে এর ভেতর দিয়ে এদেশের মানুষ এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করে থাকে। তাই যে কোনো ধর্মকেন্দ্রিক নাট্যই হোক না কেন তা এখানকার জলবায়ুতেই পুষ্টিলাভ করে এদেশের মানুষের জাতীয় রসচেতনার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই দেখা যায় কোনো-একটি ধর্মমত নির্ভর পরিবেশনা অন্য ধর্মমতের মানুষ কর্তৃক অবলীলায় অভিনীত হয়ে থাকে। যেমন, হিন্দুধর্মীয় সর্পদেবতা পদ্মাপুরাণের আখ্যান-নির্ভর নৃত্যপ্রধান ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বেহুলার নাচাড়ি ও পদ্মার নাচন যথাক্রমে টাঙ্গাইল ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের মুসলমানেরাই পরিবেশন করে থাকেন; অন্যদিকে কারবালার ময়দানে মুসলমানদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা:)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসান– ইমাম হোসেনের শহীদ হবার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মহররম মাসে উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুদেরকেও জারি গান পরিবেশন করতে দেখা যায়।

এদেশের জাতীয় রসচেতনার পরিচয়বাহী ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভব নয়। কারণ, যেভাবেই হোক দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার একটি নিজস্ব রূপ সবসময় রক্ষা করে চলে; নাগরিক জীবনে তা নানাভাবে বিপর্যস্ত হলেও গ্রামীণ জীবনের সংস্কার তা হতে সম্পূর্ণ দূর হয় না। সুতরাং এর প্রাণশক্তি যত ক্ষীণই হোক না কেন, তা কখনো সম্পূর্ণ বিনাশ হবার নয়। প্রাচীন যুগের বহু নাট্য, নৃত্য ও গীতরীতির ধারা নানাভাবে কোনো-না-কোনো রূপে এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের মধ্যে পরিবর্তিত আকারে প্রবাহিত হচ্ছে বৈকি। এছাড়া, সাম্প্রতিককালেও আমরা নাগরিক জীবনের মধ্যে বাস করে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের কথা থেকে বিস্মৃত হতে পারি কি; না-কি যে কোনোভাবে এর আস্বাদ গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি? সম্ভবত নগরজীবনেরও ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রতি নিগূঢ় এক প্রীতি আছে, তা না হলে সঠিক প্রচারণা পেলে অদ্যাবধি নগরে মঞ্চস্থ এ ধারার নাট্যরীতির দর্শক সমাগম কখনো তো কম দেখা যায় না। এ সকল চিত্রের ওপর ভিত্তি করে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এদেশ হতে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রতি অকৃত্রিম প্রেরণা কোনোদিনই সম্পূর্ণ লুপ্ত হতে পারে না, সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে মাত্র। আরো বলা যায়, ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অনুশীলনের ভেতর দিয়েই এদেশের আত্মমর্যাদাবোধের

পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব। কেননা, এর ভেতর দিয়ে বহু পূর্বকাল থেকে এদেশের মানুষের নিগূঢ় অন্তরের যোগ স্থাপিত হয়ে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সেই প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে চলমান যে প্রাণবন্ত নাট্যধারা, বিবর্তনের অশেষ স্রোত তাকে দিয়েছে অকৃত্রিম এক গতিবেগ, যে গতির ওপর ভর করে হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীর স্রোতধারার মতো এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা সময়ের মহাসমুদ্রের দিকে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে। আর এই গতিময় নাট্যধারার সম্মুখগামী শত সহস্র পদযাত্রা নদীর জীবন্ত স্রোতধারার মতো বৈচিত্র্যময় এবং তা নিত্যই নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পরিবর্তনশীল। সে পরিবর্তন সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু কালের মোচড়ে কখনো কখনো পরিবর্তনটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তখনই একটি নাট্যধারার ঘটে পালাবদল।

এই পরিবর্তনের সূত্র মেনে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বারবার নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। যেমন, কৃষ্ণলীলার আসরে আদিতে রাধাকৃষ্ণ লীলার নাট্যরূপ প্রদর্শিত হলেও, পরবর্তীকালে তা চৈতন্যদেবের জীবনী-মাহাত্ম্য প্রকাশনা-রীতি হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে। একইভাবে গম্ভীরার ধর্মনির্ভর পরিবেশনা ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে এ ভূখণ্ডে উদ্ভব হয়েছে সেই যুগ পরিবর্তনের সূত্র ধরেই। ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ধারায় এখনও এই ধারাবাহিকতা বহমান। যেমন, গত শতকের নব্বইয়ের দশকে কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রচলিত কিচ্ছা পরিবেশনা থেকে আখ্যান ও কিছু গানের সুর ধার নিয়ে গ্রামের সাধারণেরাই উদ্ভব করেছে নছিমন গান বা নছিমন যাত্রা, যা সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

তবে, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কোনো কালেই এদেশে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা অনুশীলনের কোনো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল না এবং এখনও নেই। কীভাবে এটা রচনা করতে হয়, কীভাবে এটা স্মৃতিপথে রক্ষা করতে হয়, কিংবা কীভাবে এর সুর, তাল, নৃত্য, অভিনয়শিক্ষা লাভ করতে হয়, তার সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি আজও নেই এবং আমরা তা অন্বেষণও করিনি। যারা এ নাট্যধারা আয়ত্ত করেন, তারা সাধারণত স্বভাবদত্ত ক্ষমতার গুণে কেবল চোখে দেখে, কানে শুনে এবং নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আপনা হতেই তা আয়ত্ত করে থাকেন। আর এভাবেই এ ভূখণ্ডে সহস্র বছর ধরে ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ধারা প্রচলিত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কোনোদিন কোনো বহির্মুখী পদ্ধতির প্রয়োজন পড়েনি।

নিবিড়ভাবে এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা পর্যবেক্ষণ করলে ইউরোপীয় নাট্যরীতির সঙ্গে এর মৌলিক কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। তার মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হচ্ছে, এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বিধিবদ্ধভাবেই ইউরোপীয় নাট্যরীতির ত্রি-ঐক্যের বন্ধনসূত্রের বাইরে অবস্থান করে। অর্থাৎ ইউরোপীয় নাট্যরীতির ত্রি-ঐক্য (ইউনিটি অব টাইম, ইউনিটি অব স্পেস অ্যান্ড ইউনিটি অব এ্যাকশন) সূত্র আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের কোথাও তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

যেমন–গাজীর পীরের মাহাত্ম্য নিয়ে যে নাট্য, দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রকাশকারী যে নাট্য কিংবা রূপকথা বা সামাজিক আখ্যানমূলক নাট্য ইত্যাদি প্রায় সকল শ্রেণীর নাট্যের চরিত্র, সময় ও অবস্থানের মধ্যে কোনো ঐক্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই হয়তো একটি দৃশ্য স্বর্গে সংঘটিত হল, পরক্ষণেই আরেকটি দৃশ্য পাতালে বা মর্ত্যে সংঘটিত হয় এবং এই সকল নাট্যের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপ্তি হয় একটি চরিত্রের সমগ্র জীবন কিংবা কয়েক পুরুষের জীবন, আর চরিত্র হতে পারেন স্বর্গলোকের কোনো দেবদূত, জিব্রাইল, আল্লাহ ও ফকির-সাধু থেকে শুরু করে রাজা-বাদশা ও সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে বসে দর্শকগণ খুব সহজেই তার কল্পনার জগতের প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে পারেন অভিনেতা-গায়কদের অতি সাধারণ কিছু কৌশল ও অভিনয়ের গুণে। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা সচরাচর গীতপ্রধান ও বর্ণনাত্মক অভিনয়ের আশ্রয়েই পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর ইউরোপীয় নাট্যে সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের নাট্যের মতো বর্ণনাত্মক অভিনয় এবং আখ্যান ও চরিত্রের মর্ম ব্যাখ্যামূলক অর্থপূর্ণ গানের ব্যবহার হয় বলে আমাদের জানা নেই। এই বিবেচনায় আমাদের ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধতম নাট্যধারা বলে উল্লেখ করা যায় বৈকি।

সবশেষে বলা যেতে পারে, আধুনিক বাংলা নাট্যের বিভিন্ন ধারা নানাদিকে যতই বিকাশ লাভ করুক না কেন, এর মর্মমূলে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন, এ কথা বিস্মৃত হলে আমাদের নাট্যসাধনা জয়যুক্ত হবে না। মাটি হতে রস আকর্ষণ করতে না পারলে গাছ যেমন পরগাছা হয়, ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রেরণাকে অস্বীকার করলে এদেশের নাট্যধারা তেমনি পরগাছাতে পরিণত হতে বাধ্য। আমাদের বিশ্বাস, অচিরেই এদেশের নাট্যচর্চা যথাযথভাবে দর্শনাশ্রিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অনুগামী হবে এবং বিশ্বের বুকে এদেশের স্বতন্ত্র নাট্যধারা উজ্জ্বল রূপে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাবে।

প্রয়োজন, সম্পর্ক ও কবিতা

শ ও ক ত হো সে ন

যে-কোনো কাজেরই প্রধান শর্ত প্রেম; নিজের সঙ্গে গভীর প্রেমে উপনীত হওয়া না-গেলে কবিতা লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কবিতাসৃষ্টি নিজেরই দর্শন-বোধ-প্রেমের চর্চা। প্রেম হল কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সে-অনুসারে অব্যাহত চেষ্টা। সাধারণত আগে আকাঙ্ক্ষা, পরে ফল আসে; কখনো ফল চেষ্টার আগেও পাওয়া যেতে পারে; সেক্ষেত্রে ফলকে স্থায়িত্ব দিতে পূর্বে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তার আবিষ্কার এবং একইভাবে চেষ্টা বা সাধনার খালি জায়গা পূরণ করে নিতে হয়। নর-নারীর সম্পর্কও আকাঙ্ক্ষা মাত্র; যার হাত ধরে শরীরে পৌঁছার নাম প্রেম। পৃথিবীর যে-কোনো আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি একই প্রক্রিয়ায় গতিশীল। ...আর প্রেমসৃষ্টি বা প্রেমভঙ্গ হয় কোনো *প্রয়োজন* কিংবা *প্রয়োজনহীনতা* থেকে। কবি তথা শিল্পীর সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক হল দৃশ্যমান জগতেরই প্রতিপাদ্য; এমনকি কবির সঙ্গে তার মা অথবা তার প্রেমিক বা প্রেমিকার যে সম্পর্ক তা-ও পৃথিবীর এই বাতাস, মাটি, ক্ষুধা আর কায়িক শ্রমের মতোই ধর্তব্য। এই সব যাবতীয় সম্পর্কই একটি কেন্দ্রের মধ্যে স্থাপিত– সেই কেন্দ্র হল *প্রয়োজন* কিংবা *প্রয়োজনহীনতা* ।

প্রয়োজন ব্যতীত কোনো কর্ম সংঘটিত হয় না। প্রয়োজনই অস্তিত্বকে গতি দেয়। প্রয়োজন থেকে সম্পর্ক, সম্পর্ক থেকে কর্ম'র পথ চলা। শিল্পের অন্যান্য শাখার তুলনায় কবিতায় (কবির) সততার ছাপ সবচেয়ে স্বাভাবিক রূপ লাভ করে। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, বস্তুর ও প্রাণীর সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যে থেকেও, ক্রম-নির্মীয়মাণ সম্পর্কের ভাঙাগড়া ও তার বিস্তৃতি কবির ভাবচিন্তাজগতের সীমাহীনতা দ্বারা অনির্দিষ্ট। কাজেই কবি কী কী বিষয়কে প্রয়োজনের সুতায় বাঁধেন, কোন্ কোন্ অনুষঙ্গ'র সাথে কী কী সম্পর্ক স্থাপন করেন, কবিসত্তায় বিচরণরত ঘোরের বাইরে থেকে তা অনুধাবন করা অসম্ভব।

ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও কর্ম তার দায়িত্ব দ্বারা নির্ধারিত থাকলেও বারবার ব্যক্তি তা লঙ্ঘন করে প্রয়োজনে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা ধর্ম, নীতি, রাজনীতি– এরা যতই বলে আসুক ব্যক্তির নিজস্ব মূল্য নেই; ধর্ম, নীতি বা রাজনীতির দ্বারস্থ হিসেবেই ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও কর্ম নির্ধারিত– কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনকে কেবল গুরুত্ব প্রদান করে ব্যক্তি নানা-পক্ষীয় সম্পর্ক নির্মাণ করে চলে। ফলে ধর্ম, নীতি বা রাজনীতিকে

কখনো স্বীকারের ভান ক'রে সন্তর্পণে, কখনো অস্বীকার ক'রে ব্যক্তি এদের লঙ্ঘন করে থাকে। আবার ব্যক্তি কখনো মেতে ওঠে এদের পরিবর্তনের নেশায়ও। এমনকি ধর্ম-নীতি-রাজনীতি কর্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত হয়ে পৃথিবীব্যাপী মানুষ যতরকম সম্পর্ক এবং সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি করছে তাও একমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

কবিতায় জীবনের ব্যবহার ছাড়িয়ে মানবীয় যে-অভিজ্ঞতা, তারও হাতছানি নিশ্চয়ই জীবনের সাথে সম্পর্কিত থেকে; কিন্তু শেষতক দৃশ্যত ব্যবহার্য উপলব্ধির বাইরে এসেই কবিমানস গতি পায়। প্রাণী হিসেবে নিজের পদচারণাকেও অস্বীকার ক'রে যাবতীয় শূন্যতাকে বিকল্প জ্ঞান করেন কবি। সময়ের সকল স্থান থেকে তিনি জানান পেতে থাকেন বিস্ময় নয় নিজ মানসের স্বাভাবিক রূপ এটি।

যে-কাজের সাথে কর্তার এমন সম্পর্ক যে, সে-কাজ ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই, সে-কাজ কর্তা সবচেয়ে মনোযোগের সাথে সম্পাদন করেন। কারণ তার প্রয়োজনই সে-ক্ষেত্রে এমন হয়ে ওঠে– উক্ত কাজ সম্পাদনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব, স্বস্তি ও মুক্তির পথ খুঁজে পায়। আবার ব্যক্তি সৎ হয়ে ওঠে সৎ হওয়া ব্যতীত তার উপায় না থাকলে। অর্থাৎ অসৎ হওয়ার চেয়ে সৎ হলে যে-ক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও প্রশান্তি অধিক সেখানে প্রয়োজনই সৎ হওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির মূল কারণ হয়ে ওঠে। অতএব কবিতা লেখা ছাড়া কবির যখন বিকল্প থাকে না, মরিয়া হয়ে-ওঠা কবি তখনই একনিষ্ঠ ছাপ রেখে চলেন নিজের কবিতায়।

পূর্ব-নির্ধারিত কোনো আদর্শই কবির কল্পনায় স্ফূর্তি পায় না। যা পায় তা অনির্ধারিত কোনো-না-কোনো ক্রম-পরিবর্তনীয় প্রয়োজনে। মানুষ কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিমণ্ডলের বিষয় ও বস্তুকে কল্পনায় আনতে পারে, যা-কিছু অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সংশ্লেষে উদ্ভূত, মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় কেবল সে-সবই লব্ধ হয়। অন্যদিকে অভিজ্ঞতানির্ভর মানুষের পূর্ব-ধারণা এবং কল্পনারও অসম্পূর্ণতা অনিবার্য; কেননা মানুষ তার অতীত সম্পর্কে কতটাই বা জানে! ওই জানা কতটাই বা নিশ্চিত! পক্ষান্তরে পূর্বনির্ধারিত অসরল, আত্মবিভক্ত, বহুশাখ যে কল্প-বিশ্বাস-অস্তিত্ব সহস্র শতাব্দীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেছে, ঋণাত্মক ওই লক্ষ্য অনুসন্ধান করা প্রকৃত কবির সামর্থ্য। কেননা কবিতার সত্য দর্শনের গূঢ় সত্য নয় ঠিকই কিন্তু এ-সত্য আপেক্ষিক হয়েও অভিজ্ঞতানির্ভর সকল তাৎক্ষণিকতা অতিক্রান্ত জরুরি জগৎ। তবে কবির চিন্তা ও হৃদয়াবেগ নির্গতের উৎস অবশ্যই কোনো-না-কোনো প্রয়োজন অথবা প্রয়োজনহীনতার ওপর ভর ক'রে সৃষ্টি হয়। যা আবার পূর্বনির্ধারিত কিংবা পূর্ব-ইচ্ছাবশত নয়। পূর্বোক্ত কালের কবিরা এ-অজ্ঞাত কারণকে দৈবক্রিয়া, প্রকৃতির ধারা ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। একে আমি বলি কবিতার দাবিপূরণ। যে দাবি একমাত্র মনুষ্যত্বের নয়, শ্রেণী-দ্বন্দ্বেরও। কবিতার চরিত্রবলেই বোঝা যায় যে-দাবি পূর্বে থাকে সেটা কবির পক্ষ থেকে নয় কবিতার পক্ষ থেকে। যা আবার পূর্ব-কল্পিত বা পূর্ব-উত্থাপিত রীতি বা নীতি ভেবে সামাজিক কিংবা অসামাজিক চাওয়ার সাথে গুলিয়ে

সমাজ ও রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষের ওপর চাপানো অলীক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মাত্র! অন্তত ধর্মপ্রবর্তকরা তাই করেছেন। কোনো কোনো আধুনিক কবিকেও তা করতে দেখা গিয়েছে কিন্তু সেটা আবার ধর্মপ্রবর্তক বা আধুনিক কবিদের আত্মচরিতার্থ বা অপ-প্রয়োজনের তাগিদেই তারা এটা করেছেন। কাজেই কবিমানসকে কারো নির্দেশ পালনে ব্রত হ'তে হয় না ঠিকই কিন্তু এ বিশ্বাসের গভীরেও তদন্ত চালিয়ে দেখা গেছে– প্রতিটি কবিতা সৃষ্টির পেছনে থাকে অবশ্যই মানবতা ও শ্রেণী-দ্বন্দ্বের নির্দেশ। পৃথিবীতে যে-মানুষগুলোর মধ্যে এই প্রেমময় নির্দেশ সবচেয়ে বেশি তারাই কবিসত্তা ধারণ করে থাকেন। আবার ধারণকৃতদের মধ্যে যারা প্রকাশযোগ্য কোনো উপায়ে ওই সত্তার প্রকাশ ঘটাতে সমর্থ নন, তাদের মানবীয় তীব্র বোধগুলো প্রকাশিত হয় কবিতার বাইরের ভিন্ন কোনো উপায়ে। কবিত্বকে এরা ধারণ-লালন করেন কিন্তু কবি-পরিচয়ে এরা স্মর্তব্য নন। সার্বিক অর্থে কবিত্ব হচ্ছে সেই সত্তা যিনি মানুষের ভেতরে থেকেও মানুষের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন প্রেম তথা মানবতা ও শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নির্দেশিত প্রয়োজন।

দুই

যে-কোনো বিচ্ছিন্নতা হল সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি; কেননা বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকেই কেবল সম্মিলিত হওয়া সম্ভব। সম্মিলিত অবস্থা থেকে আরো গাঢ় সম্মিলনের অথবা বিচ্ছিন্নতা থেকে আরো তীব্র বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা যদিও অমূলক নয়। কিন্তু এরই যে-কোনো একদিকের চূড়ান্তরূপএর বিপরীত উদ্দীপনার ভিত্তি। তবে বিচ্ছিন্নতা কিংবা সম্মিলন এদের কোনোটি-ই স্থায়িত্বের দিক থেকে ধ্রুব নয়। শুধু এক অবস্থান থেকে তার বিপরীত অবস্থানে এর পরিবর্তন ধ্রুব বা চিরন্তন। কাজেই মানুষ তার প্রয়োজনেই একদিকে বিচ্ছিন্ন হতে গিয়ে আরেকদিকে সম্মিলিত হয়ে পড়ে। আবার একদিকে সম্মিলিত হতে গিয়ে অন্যদিক থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন ।

সৎ প্রেমিক ও ভালো মানুষ যেমন আমিষভোজী হতে পারে আবার হিংস্র-ঠকবাজও নিরামিষভোজী হতে পারে স্বতন্ত্র প্রয়োজনে; শক্তি কোনো শক্তির বিপক্ষে অহিংস হ'লে বিপক্ষ শক্তিরও অহিংস হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলে হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসা কখনো অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে না। এই একটি মাত্র দিক থেকে অহিংসা অবাস্তব ধারণা। অন্যদিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শোষণমুক্ত হোক– এটি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। কাজেই শোষণ ও হিংসার প্রতিকার ও প্রতিরোধের চেষ্টা মানুষই করে। আর মানুষকে ঘিরে কোনো কর্মকাণ্ড-মাত্রই তো রাজনীতি! ফলে রাজনীতিকে মানুষ আবার শোষণমুক্ত ও অহিংস করতে চায় তাদের সুপ্ত ওই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে। এক্ষেত্রে কবিতা হৃদয়কে যে-উপায়ে ক্রমশুদ্ধ ক'রে তোলে, তা প্রচল সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলকর নয়! কবিতার ঐতিহ্যকে স্বীকার একইসাথে অস্বীকার ক'রে আমি এর সংসর্গে এসে

বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছি, দৃশ্যগত চরিতার্থের গভীরে কবিতা যা দেয়– সমাজ ও রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষের কাছ থেকে (আপাত অর্থে) নেয় আরো বেশি। কারণ, কবিতার প্রকৃত দাবি বাস্তবে সবসময়ই পূরণ না-হয়ে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডিত প্রয়োজনের 'ব্যাহত-স্রোত' হয়ে গন্তব্যে শেকড় বসাতে অপারগ; ফলে কবিতার অতিচুম্বন কিংবা চপেটাঘাতে ক্রমশুদ্ধ মানুষ, পুনরোদয়ের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকেই পরিণত সূর্যের অস্তাচল দ্যাখে।

তিন

প্রযুক্তির যান্ত্রিক প্রশ্রয়ে যত ধরনেরই উল্লম্ফন-শিল্পের উপস্থিতি ঘটুক এতে অবাক হওয়ার অথবা ভয়ের কিছু নেই। পৃথিবীর নারী-পুরুষ অনেক আগেই উলঙ্গ সময় কাটিয়ে এসেছে। ফলে কল্পনা ও চিন্তা চরম অশিল্প এমনকি উত্তাল উলঙ্গপনাসহ যতদিকেই উৎসাহী হয়ে উঠুক, মানুষ শেষপর্যন্ত সকল দিক ধ'রে রাখে না। মানুষের জন্মকাল থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত যা-কিছু মানুষ ছুড়ে ফেলেছে তার সবই তো গ্রহণ করার কথা ছিল! অথচ বিচক্ষণ চালুনিতে ছেঁকে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোই সে ধরে রেখেছে। আর সুন্দরের কাছাকাছি হতে হলে অসুন্দরের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়েই যায়। এরপরও এর অর্থ অসুন্দরের প্রতি ঘৃণা না হয়েও সুন্দরের প্রতি প্রেম। সেক্ষেত্রে অসুন্দরের সাথে দূরত্বকে নৈকট্যে পরিণত করা থেকে বিশেষ সৌন্দর্য'র জন্ম হয়; অর্থাৎ অসুন্দরকে বুকে টেনে নেয়া এবং একে সুন্দরের উৎকর্ষে ব্যবহারযোগ্য করতে পারা আরো উৎকৃষ্ট প্রেম, যা নিশ্চিতভাবে প্রচলিত সুন্দরের প্রতি অনুভূত বোধের অনেক উর্ধ্বে। অথচ পুঁজিবাদী ওরফে পুঁজবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র মাত্রই কুৎসিত বীভৎস বৈষম্যহেতু নির্যাতনী ক্ষমতা কুক্ষিগত ক'রে রাখে; যদিও এধরনের সমাজ আর রাষ্ট্রের নিপীড়ন-ক্ষমতা আলাদা; রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যত দ্রুত সংযুক্তি ঘটাতে পারে, সমাজ তত দ্রুত পারে না; ফলে নিপীড়ন ও যন্ত্রণাকে সমাজ তার নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে ঘন ক'রে তোলে আর রাষ্ট্র তার দ্রুত বিস্তৃতির ক্ষমতা দিয়ে আত্মনির্গত আগুনকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করে। সে বিচারে প্রয়োজনের তাগিদেই 'সমাজ' মানব সম্প্রদায়ের নিপীড়নগত গভীরতার এবং 'রাষ্ট্র' যন্ত্রণার বিস্তৃতির দিক ক্রম-সুরক্ষা করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবিতা লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ভাষার উৎকর্ষের চেষ্টা না-হলেও এ-কাজে আবশ্যিকভাবে ভাষার প্রয়োজন হয়। আর সমাজ ও রাষ্ট্রের পর মানুষকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে এই ভাষা। কখনো কবিতার বদৌলতে কোনো ভাষা উর্বর হয়ে উঠতে পারে, সেটা কবির অন্য আরেকটি ভাষাতাত্ত্বিক-গুণ। কবি কেবল নিজের অস্তিত্বের জানান দেন, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, বিন্দুর গভীরে সিন্ধুকে দেখে ফেলে। এই দেখা এবং দেখানো কবির গভীর বোধের সাথে সম্পৃক্ত। ভাষার সাথে নয়। প্রকৃত প্রেমজাত মানবীয় বোধ পৃথিবীর সকল ভাষাতেই সমান মাত্রা পায়। বাস্তবতা হল কোনো কবিই সকল ভাষার অভ্যস্ততার ধারক-বাহক নন, হতে পারেন না। অভ্যস্ত ভাষার জন্য কবিত্ব নিজস্বতা অনুধাবন করে না, যদিও কবি ব্যক্তির সংস্কৃতি-নির্দিষ্ট-

অভ্যাস তা করে। আবার এই ভাষাই সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘাড়ে দীর্ঘকাল বসতি স্থাপনের প্রয়োজনে নির্যাতনের সকলমুখী উদ্যোগে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

অতএব পরিণত এই পৃথিবীর মানুষ বিনাকারণেই গড়াতে গড়াতে ঠেকবে গিয়ে মানবকল্যাণের দোরগোড়ায় এবং সে-সত্তা উত্তরণের মাধ্যমে হয়ে উঠবে আরো পরিণত, এমনকি হয়ে উঠবে সর্বময় 'অপশিল্প ও ধ্বংস' বিরুদ্ধ, তা ভাববারও অবকাশ নেই বরং কালক্রমে একদিনের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সত্য আরেক দিনের মিথ্যায় পরিণত হয়; মানুষের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার মানুষেরই খুন বয়ে আনে! সেক্ষেত্রে যাবতীয় নিষ্ঠুরতার উদ্‌গাতা এ ধরনের সমাজ, রাষ্ট্র ও এদের ভাষা যে-নির্গত-বিষ কবির হৃদয় ও মগজে নিক্ষেপ করে, শক্তিধর কবি মাত্রই তা গলাধঃকরণ করেন শিল্পসৃষ্টির কাঁচামালরূপে।

চার

মা-বাবা ছাড়া সন্তানের জন্ম সম্ভব না। একইভাবে পড়া-লেখা ও বিদ্যা অর্জন ছাড়া কবিতার ভ্রূণ-যাত্রা অসম্ভব। যদিও কবিতার ক্ষেত্রে 'পড়া-লেখা' হল সন্তানের মূর্খ মা-বাবা; এ-ধরনের মা-বাবার কারণে সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহতও হয়; অর্থাৎ অতি পড়া-লেখার অভিশাপে কবিতা অনেক ক্ষেত্রে হীনমন্য ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। প্রায়োগিক অর্থে উৎকৃষ্ট লেখা-পড়া ও মা-বাবা অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু সেটা কোন্ ধরনের কোন্ প্রকৃতির! নাতিশীতোষ্ণ-এর অর্থ না-শীত না-উষ্ণ হলেও এর ভেতরে শীত উষ্ণ দুটোই থাকে। ভারসাম্য এমন এক লৌকিক জোছনা, বহুকাল আকাঙ্ক্ষায় শুয়েবসে লক্ষ্যে পৌঁছতে যা কেবলই প্রেরণা পায়। তবে সকল আয়তনের জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার গভীরে প্রোথিত শেকড় আঁকড়ে যেহেতু কবির পথ চলা, তাই এর সাথে পাঠক-হৃদয় ও চিন্তাকে একসুরে বেঁধে সমস্যা থেকে সর্বকালীন উত্তরণের লক্ষ্যে, গণমানুষের সত্যকে কবি নিজস্ব সত্য দ্বারা চূড়ান্ততা দেন। অন্যদিকে কবিতাসহ সকল শিল্পের প্রশ্নেই রঙ্গভঙ্গ হয় তার অঙ্গ নিয়ে বেশি টানাটানি করলে, কখনো আবার সস্তারসের আয়োজন থেকে; এর পুরোটাই ঘটে পাঠক-প্রত্যয়সীমা জনিত; একই শিল্পের সাথে বিভিন্ন রসভোক্তার সম্পর্ক বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনই যার কারণ। প্রায়ই লক্ষ করা যায় কবি তথা শিল্পী, পাঠক তথা শিল্পভোক্তাকে বুঝতে নারাজ। এমনকি সমালোচক গবেষকও এদের বুঝতে গিয়ে এদের ধারণ করে নিতে দ্বিধান্বিত। যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অবজ্ঞাক্রান্ত পাঠকেরা সস্তারসের বই প্রকাশমাত্র হাজার হাজার কপি কিনে যেন তাদের প্রতি অহংকারী লেখক-সমালোচকদের অবজ্ঞারই প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন এভাবে, প্রয়োজনে।

প্রকৃতিগত কারণে কবিকেও বস্তুগতভাবে জন্মগ্রহণ করতে হয় কোনো-না-কোনো মায়ের গর্ভে। খুব ছোটবেলায় নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন কোন্ সন্তানটি কবি হ'য়ে জন্ম নিল; ফলে আর দশটা সন্তানের সমান্তরালে মা তার কবি-সন্তানকেও নিজের

সর্বোচ্চ সামর্থ্যে লালন করেন। ভিন্ন দেশে বিষয়টি ভিন্নরকম হলেও, আমাদের অঞ্চলে সন্তানের জীবনপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাবা ভবিষ্যৎ আর্থিক উৎকর্ষের বিষয়টি যতটা ভাববার অবকাশ পান, মা– সামাজিক ব্যবস্থার কারণে ও-বিষয়ে খুব একটা চিন্তিত থাকেন না; সন্তানের আর্থিক রোজগার বা উচ্চ আসনের চেয়ে মা অধিক চান সন্তানের সমর্থন, উপস্থিতি এবং সর্বোপরি সুস্বাস্থ্য। হয়তো এর ব্যতিক্রমও আছে।

কোনো মানুষ নির্দিষ্ট বয়সের পরে যখন মায়ের প্রদানগুলো ছাড়াই বাঁচার যোগ্যতা অর্জন করে, তখন পৃথিবীর নানা শক্তি তাকে কাছে টানতে চায়। এ-সময় যৌনিক-কায়িক-মানসিক অন্যান্য চাহিদাগুলো খুব বেশি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে; ফলে মায়ের তুলনায় সে অধিক আকৃষ্ট হ'তে থাকে ওসব বিষয়াদি দ্বারা। সন্তানের স্মৃতিতে মায়ের বিশাল ত্যাগের অধিকাংশই থাকে অনুপস্থিত; মায়ের ত্যাগ সম্পর্কে সে অর্জন করে নিতান্ত বিশ্বাস। কবির মা কবি নন; তার পক্ষে সম্ভব হয় না সন্তানের মঙ্গল উপেক্ষা করে অমঙ্গলের মধ্যে অর্থাৎ কবির কঠিন ও নিষ্ঠুর জীবনের সৌন্দর্য আবিষ্কার করা। অতপরঃ কবির মাকে মঙ্গলকামী অথচ প্রকারান্তরে কবিরই যেন প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে দেখা যায়। এবং এরকম শত্রুর কাঠিন্যের সামনে দাঁড়িয়ে কবিকে জয় করতে হয় শত্রুবুকের গোপন শুশ্রূষা আর তার চোখের কোণে লুকিয়ে থাকা অশ্রুকে। অথচ অন্যসব সৌন্দর্য ও প্রেমে মত্ত থেকেও মায়ের ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে কীরকম থাকেন কবি, শব্দের গাঁথুনিতে তা প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের অবস্থান-হেতু, অত্যন্ত বিচলিত হৃদয়ে মৃত্তিকার শরীরকে ভাবেন মা, বাসস্টপের রুগ্‌ণ মুখরাজিকে ভাবেন মা। সন্তানের কাছ থেকে মায়ের আর্থিক প্রাপ্য এবং সন্তানের উপস্থিতিজনিত প্রাপ্য একজন কবির জন্য গুরুতর পিছুটান। মা থাকাটাই তাই অনুচিত–সে কথাও এক অসম্ভব উচ্চারণ। তবে কবির ছোটবেলায়– নির্দিষ্ট কাল পরে, যদি তার মা মারা গিয়ে থাকেন, কথাটা আপাত অর্থে নির্মম হলেও কবি এবং তার মা উভয়ের জন্যই হয়তো একদিক থেকে সেটা ভালো।

পাঁচ

সত্য-সুন্দর জয়ের জন্য যাবতীয় যে লড়াই বিজয়কামী সে জীবন চরম অসহায় হয়ে যখন ভাসতে থাকে কুল-কিনার হারিয়ে উত্তাল সাগরে, তখন প্রেমই হাতড়ে তাকে উদ্ধার করে। আর সাধারণ অতিক্রান্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেমের প্রাসঙ্গিকতা বলাই বাহুল্য। সফল কোনো সৃষ্টিই প্রেমহীন সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই অনন্ত আধুনিক এই মহাশক্তিকে ধারণ করে কবি কখনো সামাজিক ও রাষ্ট্রিক যুক্তিকে অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছতে চান। সৃষ্টি প্রেমহীন হলে সেটি মূলমাত্রা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, ফলে তা হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ ও হৃদ্যতাহীন। কাজেই চরম উৎকর্ষতার প্রয়োজনেই, শিল্পে নারী-পুরুষের জৈবিক প্রেমসহ ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব-জন্তু, বিশ্ব-ব্রহ্মা আদিগন্ত ব্যাখ্যাহীন অজ্ঞেয়বাদী কেন্দ্রিক ভালোবাসার উপস্থিতি তীব্র। তুচ্ছ

প্রাণী আর মানুষের পার্থক্য ঘটে মূলত প্রেমের উপস্থিতির কারণে, কারণ কাম সকল প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তুচ্ছ প্রাণীরা যৌন সম্পর্কের পর পরস্পর থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে কিন্তু মানুষের যৌনতৃষ্ণা মিটে গেলেও পরস্পরের প্রতি টান ও অনুরাগ অনুভব করে।

সাধারণের তুলনায় কবির প্রেমে থাকে অনেক বেশি ডাইমেনশনাল অমেয় সত্য যা তার অস্তিত্বকে জোরালো ঘোষণার দ্বারা অসম্ভব নির্মাণকাজে প্রতিনিয়ত ব্রতী করে তোলে। কবিও রক্তমাংসের মানুষ তাই জৈবিক কামনা তার থাকেই। পক্ষান্তরে কবি যেখানে পুরুষ সে-ক্ষেত্রে কোনো নারী যে-গুণগুলো কখনই অর্জন করতে পারে না– কবি তার ওপর সে-গুণ, অবস্থা, প্রতীক ও উপমা প্রয়োগ ক'রে কবিতায় সার্থক হয়ে ওঠেন। আবার কবি নারী হলে তার প্রেম-নির্দিষ্ট পুরুষের ক্ষেত্রে কিংবা সমকামী কবির পারস্পরিক সম্পর্কিত পক্ষের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তাই কবি হিসাবে তুখোড় প্রেমের বানে যদি তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় একান্ত কাছে টানতে ব্যর্থ হন– সেটা বিশেষ দিক থেকে কবি এবং উক্ত উদ্দিষ্টপক্ষ উভয়ের জন্য মঙ্গল। শারীরিক কামনার কাছে প্রেম, সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই ঋণী। বাউল বৈষ্ণব সহজিয়ারা প্রেমের সাধনায় কামের ওপর জয়ী হ'তে চেয়েছিলেন, কতটা পেরেছেন আজকে সে পদ্ধতির রুগ্‌ণ অবস্থা দেখে সহজেই পরিমাপ করা যায়। আবার একচ্ছত্র শারীরিক তৃপ্তি প্রেমকে হত্যা করে থাকে তা-ও পরীক্ষিত। শরীরিক কামনা কল্পনাজাত হয়েই প্রেমের জন্ম দেয় কিন্তু প্রেম না থাকলেও শারীরিক তৃপ্তি অহরহই আস্বাদন সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। নির্বীর্য প্রেম, যেমন শিশুদের প্রতি কোমল ভালোবাসার স্বরূপ অনুভূতিশীল প্রেমের হাত ধরে নারী-পুরুষের প্রেমের সূত্রপাত হতে পারে কিন্তু শারীরিক কামনার উপস্থিতি না থাকলে তা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোয় না।

প্রেম কখনো একতরফাও হতে পারে তবে লাম্পট্য আর প্রেম এক নয়। ফলে শিল্পের যথার্থ দাবি পূরণের প্রয়োজনেই কবিকে প্রেমে থাকতে হয় নিষ্কলুষ। লাম্পট্য প্রশ্নে প্রকৃত কবি কখনো সামাজিক ও রাষ্ট্রিক যুক্তির কাছে হেরে গেলেও নিজের একান্ত যুক্তির কাছে তার সততা একশত ভাগ রক্ষিত রাখেন। কবি যাকে চান তাকে কতটুকু ও কীভাবে চান তা গণিতের সহজ সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে শরীরের সংগুপ্ত আলিঙ্গন আর যৌন-আর্তির ব্যর্থতা ও ক্লান্তি দিয়েও বোঝাতে পারেন না। ফলে চাওয়ার তীব্রতা সাধারণের চেয়ে বহুগুণ বেশি থাকলেও চাওয়াকে পেয়ে গেলে কাঙ্ক্ষিত পারদর্শিতা প্রদর্শনের ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। যেহেতু প্রেমের সাথে প্রদানের বিষয়টি বিশেষ সম্পর্কযুক্ত কাজেই নির্মম হলেও সত্য যে, বস্তুগত প্রদানে কোনো প্রকৃত কবি সাফল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হন না। অন্যদিকে কবির স্বভাব একের পর এক নতুন সত্যকে আবিষ্কার করা; ফলত কোনো এক সময়ে কবির কাছে তার উদ্দিষ্ট প্রেম-নির্দিষ্ট পক্ষ নিজের পরিসীমা অতিক্রম করতে না-পারার অক্ষমতা থেকে নিজেকে অবহেলিত বোধ করেন।

মানুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনে প্রেমের প্রয়োজন একেবারেই নেই। সেখানে সঙ্গমই মুখ্য। প্রেম সামাজিক বিষয় নয় বরং সঙ্গমের সামাজিক স্বীকৃতি বিবাহ প্রথার মধ্যে নিহিত। কোনো রাষ্ট্র কিংবা সমাজই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম চায় না, চায় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন। স্বামী-স্ত্রী শারীরিকভাবে মিলিত হয়ে সন্তান উৎপাদন ও সামাজিক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে, এর মধ্যে প্রেমের ভূমিকা গৌণ। অথবা একেবারেই নেই। এই অপ্রিয় সত্য প্রমাণে ব্রতী হ'য়ে প্রেম, মানুষ সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই সমাজ-নির্ভর কর্তব্যের সাথে পরাজিত হ'য়ে অনন্ত সংসারচ্যুত হয়ে আছে।

কবি শুধু বাইরের সৌন্দর্যে মোহিত না থেকে সকল সম্পর্কের অন্তর্গত সৌন্দর্য কদরের মাধ্যমে প্রেমকে ক্ষণস্থায়িত্বের ফাঁড়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন; শারীরিক সৌন্দর্য ছুঁয়ে ফেলার পর প্রেমের উপস্থিতি হয়ে পড়বে শূন্য আর অন্তর্গত সৌন্দর্যের কাল্পনিক নির্মাণ বাস্তব সত্যের নিকট হয়ে পড়বে পরাজিত, সেই ভয়ে কবিকে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনে সোনার মাছি খুন করতে হয় কখনো।

যদিও কবি জানেন, পৃথিবীর সকল প্রেমজাত কর্তৃত্বও পক্ষপাতপূর্ণ; কল্পনা ও চিন্তায় সমগ্রকে ধারণের পরিকল্পনা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত বাস্তবে পক্ষপাতের উর্ধ্বে থাকা সম্ভব হয় না। প্রয়োজনে কোনো-না-কোনো পক্ষ, ব্যক্তি বা দলকে সমর্থন করতে গিয়ে আরেক পক্ষ, ব্যক্তি বা দলকে অসমর্থন করতে হয়। কালে কালে এই অক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েও জানা গেছে এর চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব না হলেও, এর সমাধানের পক্ষে একটি ভারসাম্যের জায়গা তৈরি করা অবশ্যই সম্ভব। ...কেননা সাম্য মানে ফ্ল্যাট বা সমতল নয়, সাম্যেরও বাস্তবরূপ ভারসাম্য-ই। ...

শিল্প নিজেই একটি দর্শন

আ হ মা দ মো স্ত ফা কা মা ল

[আজ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে কথাশিল্পী আহমাদ মোস্তফা কামালের মুখোমুখি হয়েছি, 'শিল্পের দর্শন' নিয়ে তার ভাবনাগুলো জানতে। আহমাদ মোস্তফা কামালের জন্ম ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯, মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরে। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা সাত। গ্রন্থসমূহ: গল্প: দ্বিতীয় মানুষ ১৯৯৮, আমরা একটি গল্পের জন্য অপেক্ষা করছি ২০০১, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে ২০০৪, ঘরভরতি মানুষ অথবা নৈঃশব্দ ২০০৭, ভোর অথবা সন্ধ্যারা নামছে বেদনায় ২০০৮; উপন্যাস: আগন্তুক ২০০২, প্রবন্ধ: সংশয়ীদের ঈশ্বর ২০০৬। এ সময়ের কথাশিল্পীদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় এবং জনপ্রিয়। ...বিশ্বের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো আমাদের মধ্যেও শিল্পদর্শন নিয়ে রয়েছে নানা মত ও ভ্রান্ত ধারণা; শিল্প যে শুধু নিছক আনন্দ বা খেয়ালের বিষয় নয়, শিল্পেরও রয়েছে ক্ষমতা কাঠামো, পক্ষ-বিপক্ষ এমনকি প্রতিবাদ-প্রতিরোধী স্পর্ধাজ্ঞান– সেই পয়েন্ট অব ভিউ থেকে 'হালখাতা' কিছু প্রশ্ন রেখেছে জনাব কামালের কাছে। 'হালখাতা'র সঙ্গে নানা ধরনের প্রশ্নের জবাবে তাকে আমরা কী রূপে পাই, সেটা পরিষ্কার হয়েছে তার প্রদত্ত জবাবে। শিল্পের মানবতাবাদী দর্শন কোনোভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমন ভাবনা আমাদের দেশের অনেক শিল্পীরই, তা সত্ত্বেও এবিষয়ে তাদের পক্ষপাত এক ধরনের লুকোছাপার মধ্যে বহমান; আহমাদ মোস্তফা কামাল সেখানে শিল্পদর্শন প্রসঙ্গে তার চিন্তা অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেছেন।]

হালখাতা
আপনি কি বলবেন, শিল্পের দর্শন বলতে আমরা আসলে কি বুঝব?

আহমাদ মোস্তফা কামাল
শিল্প নিজেই একটি দর্শন। শিল্প যখন সফল হয়ে ওঠে, তা সে যে ধরনের শিল্পই হোক না কেন, তার মধ্যে আপনি একটি দর্শন খুঁজে পাবেন। একটি সফল কবিতা বা গল্প বা

উপন্যাস বা নাটক বা চলচ্চিত্র বা চিত্রকলা বা সঙ্গীত ভোক্তার মনে এক দার্শনিক উপলব্ধির জন্ম দেয়। সেই অর্থে শিল্প নিজেই দর্শনকে ধারণ করে রাখে। কিন্তু সাধারণভাবে শিল্পের দর্শন বলতে যা কিছু বোঝানো হয়, বা এ সম্বন্ধে যে সব কথাবার্তা বলা হয়, তাকে বলা যেতে পারে শিল্প-ব্যাখ্যার দর্শন। শিল্পকে ব্যাখ্যার জন্য যত ধরনের তত্ত্ব, বা দর্শন ব্যবহার করা হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি সেগুলোকে শিল্পের দর্শন বলে মনে করি না। বরং শিল্পটিকেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন হিসেবে বিবেচনা করতেই আগ্রহী আমি।

হালখাতা

শিল্পের ভাষা, রঙ, ছন্দ, প্রতীক, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি নিয়ে বাংলাভাষায় কম-বেশি লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু শিল্পের দর্শন নিয়ে সেই অর্থে লেখালেখি হয়নি বললেই চলে। শিল্পের দর্শন নিয়ে এই নিরুৎসাহের কারণ কী বলে আপনি মনে করেন? শিল্পের দর্শন নিয়ে আদৌ আলোচনার দরকার আছে কি?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

ওই যে বললাম, শিল্পের দর্শন বলতে সাধারণভাবে যা কিছু মিন করা হয় সেগুলো মূলত শিল্প ব্যাখ্যার দর্শন। ভাষা বা ছন্দ বা রঙ বা প্রতীক বা ব্যঞ্জনা বা এককথায় শিল্পের করণকৌশল কিন্তু শিল্পের অংশমাত্র, শিল্পের পুরোটা নয়। ওগুলোকে ব্যাখ্যা করে যদি আমরা শিল্পকে বুঝতে চাই তাহলে ভুল হবে। শিল্প সবমিলিয়ে অনুভব ও উপলব্ধির বিষয়। কেউ যদি অনুভবকে ব্যাখ্যার সাহস ও যোগ্যতা রাখেন তাহলে তিনি তা করতেই পারেন। শিল্পদর্শন নিয়ে আলোচনার দরকার নেই, তা আমি বলব না। কিন্তু একজন মানুষ, ধরা যাক তিনি খুবই প্রতিভাবান মানুষ, যে ব্যাখ্যা দেবেন সেটি তার নিজস্ব উপলব্ধিজাত ব্যাখ্যা। অন্য একজনের কাছে ওই একই শিল্প একই উপলব্ধিতে ধরা না-ও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়জন ব্যাখ্যা করবেন ভিন্নভাবে। এবং সেটিকে ভুল বলে খারিজ করে দেবারও কোনো উপায় নেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিল্পের কোনো ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত নয়। শিল্প সম্বন্ধে কারো কথাই শেষ কথা নয়। এমনকি আমি এইমাত্র যে বাক্যটি বললাম, সেটিও শেষ কথা নয়! তাহলে শিল্পের দর্শন নিয়ে আলোচনার উপায় কী? উপায় হল– এ নিয়ে স্বয়ং শিল্পীই কথা বলবেন। একটি শিল্প কীভাবে জন্ম নেয়, কোন অনুভব থেকে শিল্পী তাঁর শিল্প রচনা করেন, শিল্পের কাজ কী, মানুষ ও সমাজের কাছে শিল্পের ভূমিকা কী, শিল্পের শক্তি কোথায়, সীমাবদ্ধতাই বা কোথায়, শিল্পীর দায় বলতে শিল্পী নিজে কী বোঝেন– এসব নিয়ে শিল্পীরা যদি কথা বলেন তাহলেই কেবলমাত্র শিল্পের দর্শন সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে পাঠকদের পক্ষে। সমালোচকদের সমালোচনা পড়ে শিল্প খানিকটা বোঝা গেলেও, দর্শন বিষয়টি বোধহয় বোঝা যায় না।

হালখাতা

সাহিত্য, চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প, সংগীত এরকম নানা শিল্পের নানা রকম উপস্থাপন-পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু সকল শিল্পের দর্শন কি একই রকমের? নাকি একেক শিল্পের দর্শন একেক ধরনের? আপনার মতামত কী?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

শিল্পের যে নানা মাধ্যমের কথা বললেন, তাদের দর্শন এক হতেও পারে, না-ও হতে পারে। এক হবে কি হবে না, সেটি নির্ভর করছে শিল্পস্রষ্টার ওপর। দুই মাধ্যমের দুজন শিল্পীর দর্শন যদি একই হয় এবং তাঁরা যদি তাঁদের সেই দর্শনকে তাদের শিল্পে রূপায়িত করতে চান, তাহলে ওইসব শিল্পের অন্তর্নিহিত দর্শনের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মাধ্যমের ওপর আসলে দর্শন নির্ভর করে না। প্রশ্নটা অন্যভাবে করলেই বরং ভালো হত। শিল্পীরা ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম বেছে নেন কেন? এটা বোধহয় স্বাচ্ছন্দ্যবোধের ব্যাপার। কেউ সাহিত্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, কেউ বা চলচ্চিত্রে, কেউ সংগীতে করেন তো কেউ চিত্রকলায়। মূল বিষয়টি হচ্ছে, এই শিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমগুলো দিয়ে কারো-না-কারো সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চান। মাধ্যমগুলো আসলে তাঁদের যোগাযোগের ভাষা। আমরা কবিতার ভাষা নিয়ে কথা বলি, কথাসাহিত্যের ভাষা নিয়ে কথা বলি, চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে কথা বলি, কিন্তু একটি বিশেষ ব্যাপার ভুলে যাই যে, এই মাধ্যমগুলো প্রত্যেকটিই একেকটি ভাষা হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কবিতা নিজেই একটি ভাষা, কবি সেটিকে ব্যবহার করেন তাঁর পাঠককে কমিউনিকেট করার জন্য। চলচ্চিত্র বা চিত্রকলাও তাই। সঙ্গীত অনেক বেশি বিমূর্ত মাধ্যম হলেও এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা। আর সেজন্যই, যে ভাষায়ই রচিত হোক না কেন, সঙ্গীতের সুর যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালে যে-কোনো মানুষকে স্পর্শ করে। সেই অর্থে সঙ্গীতই সবচেয়ে বেশি দেশকাল-নিরপেক্ষ শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে।

হালখাতা

আমরা শিল্পের ইতিহাস নিয়ে সচরাচর যেসব লেখা পাই সেটা সমাজের উঁচু-শ্রেণীর যে শিল্প, তারই ইতিহাস। আপনার কি মনে হয়, নিম্নবর্গের মানুষের স্বার্থ যে সব শিল্পে প্রধান বিষয় হয়ে এসেছে কিংবা নিম্নবর্গের মানুষ দ্বারা যে সব শিল্প রচিত হয়েছে তার ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন? এবং সেটা কিভাবে রচনা করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

প্রয়োজন তো বটেই। নিম্নবর্গের মানুষ দ্বারা সৃষ্ট শিল্পকে (যাকে বলা হয় লোকায়ত শিল্প) কিছু বিশেষ কারণে খুব শক্তিমান বলে মনে হয় আমার কাছে। প্রথম কারণটি হল– লোকজীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে এসব শিল্পে। যে-কোনো দেশের লোকশিল্প আসলে ওই দেশের লোকজীবন রচিত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। লোককাহিনীর কথাই ধরুন। একথা সবাই জানেন যে, এসব রচনার কোনো সুনির্দিষ্ট রচয়িতা নেই। দারিদ্রক্লিষ্ট, সংকট ও সমস্যাবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত যে জনগোষ্ঠী তাদেরই মুখে মুখে রচিত হয় এসব গল্প, আর লোকমুখে যুগের পর যুগ ধরে তা প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রবহমানতাই জনজীবনের কাছে এসব গল্পের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। আবার কোনো সুনির্দিষ্ট রচয়িতা নেই বলে এগুলো সামাজিক সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হয়। নাগরিক সাহিত্য-পরিমণ্ডলে যেমন সাহিত্যের ওপর লেখকের স্বত্ব থাকে, তাই এগুলো তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অন্য কারো অধিকার নেই এসব রচনার পরিমার্জনের। কিন্তু লোককাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি উল্টো। মানুষের মুখ থেকে মুখে ঘুরে ফেরার সময় অনিবার্যভাবেই এ কাহিনীগুলোর রূপ পাল্টায়, পরিবর্ধন ঘটে, পরিমার্জনও। কখনো সময়ের প্রয়োজনে একই গল্পের মধ্যে নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এবং যেহেতু এগুলো সামাজিক সম্পত্তি, এসব পরিবর্তনে তাই কারো কোনো আপত্তি থাকে না, থাকলেও খাটে না। কিন্তু কেনই বা এসব গল্প এত দীর্ঘকাল ধরে জনজীবনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় বা টিকে থাকে? এর একটি কারণ, আগেই বলেছি, এগুলোর মধ্যে দিয়ে লোকজীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে। নিজেদের সমস্যা-সংকট থেকে সহসা যাদের মুক্তি মেলেনা, এসব গল্পের মধ্যে দিয়ে তারা এক ধরনের মুক্তি খুঁজে নিতে চায়। লোককাহিনীর জগৎ এক অর্থে জনগণের ফ্যান্টাসির জগৎ। এখানে অহরহ দেখা মেলে দৈত্য-দানবের, ভূত-পরীর, রাজপুত্র-রাজকন্যাদের। এসব দৈত্যরা আবার নিজেদের প্রায় অসীম শক্তিমত্তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাজিত হয়, পরীরা হয় সহযোগিতাপ্রবণ আর রাজপুত্ররা প্রায় সাধারণ মানুষের মতোই সমস্যা-সংকটে জর্জরিত, এসব সংকট উত্তরণে সাধারণ মানুষদের নানারকম সহযোগিতা তাদের প্রয়োজন হয়। বলাইবাহুল্য, যারা এসব গল্পের রচয়িতা– এ আসলে তাদের আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ, আর প্রায় সমাধানহীন সমস্যা-সংকটগুলোর সমাধান তারা করে এসব ফ্যান্টাসির মাধ্যমে। কিন্তু এ ছাড়াও লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের– লোককথা, লোকছড়া, গান, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি– আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও থাকে। এসবকিছুর মধ্যে এর রচয়িতারা পরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য রেখে যান নানারকম প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় উপাদান। সমাজে প্রচলিত নানরকম সংস্কার-বিশ্বাস-মূল্যবোধ-নীতিবোধ-ঔচিত্যবোধ ইত্যাদি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয় এসবের মাধ্যমে। এই অর্থে লোকসাহিত্য

শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করে। মনে রাখা দরকার– এগুলোর জন্ম এমন এক সমাজে যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় কোনোকিছু রেখে যাবার আধুনিক কোনো পথই তাদের জন্য খোলা ছিলো না। শুধু তাই নয়, লোকসাহিত্য থেকে যে কেউ অন্তত আরো দুটো বিষয় খুঁজে নিতে পারেন– সাধারণ মানুষের কল্পনা-প্রতিভা ও তাদের দার্শনিকতা। যে অসামান্য কল্পনা প্রতিভা দিয়ে রূপকথাগুলো রচিত, তা সম্ভবত একজন আধুনিকতম লেখকেরও থাকে না। অন্যদিকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নানা দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশও ঘটে এসবকিছুতে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির এতসব ভূমিকা খুঁজে দেখেন নাগরিক ও শিক্ষিত জনগণ। যারা এসব রচনা করেন, উপভোগ করেন– তারা যদি বলেন, নিছক আনন্দের জন্যই এসব কিছুর সৃষ্টি, তাহলে সেটাই সম্ভবত এসব রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে সঠিক কথা। যে জীবন দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, সমস্যা ও সংকটে পূর্ণ, যে জীবন পরিবর্তনহীন, প্রায় স্থবির, যে জীবনে আনন্দের বহুবিধ আধুনিক উপকরণ ছড়ানো নেই– সে জীবনে লোকসংস্কৃতির এসব উপাদানের ভূমিকা যদি হয় নিছক আনন্দ দান, তাহলে বলতেই হয়, লোকসংস্কৃতি মহান – কারণ একটি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সে আনন্দ দিতে পারে, অন্য কোনোকিছুই যা পারে না। কিন্তু এই শিল্পের ইতিহাস কিভাবে তা রচিত হবে সেটি একটি জটিল বিষয়। তারচেয়ে বড় কথা– কে বা কারা সেটি রচনা করবেন? আপনার ভাষায় যারা সমাজের উঁচু-শ্রেণীর লোক, তারা তাদের মতো করে শিল্পের ইতিহাস রচনা করেছে। সেটি যে আপনার খুব একটা পছন্দ নয়, তা প্রশ্ন করার ধরন দেখেই বোঝা যায়। তাহলে নিম্ন-শ্রেণীর শিল্পের ইতিহাস রচনা করার দায়িত্ব তো উঁচু-শ্রেণীর লোকদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। তাদের ইতিহাস তাদের হাতেই রচিত হওয়া প্রয়োজন। কাজটি কিভাবে করা যায়, আপনিই ভেবে দেখুন। হয় উঁচু-শ্রেণীর কাউকে শ্রেণীচ্যুত হয়ে কাজটি করতে হবে, অথবা নিম্ন-শ্রেণীর কাউকে ইতিহাস রচনার মতো জটিল কাজের জন্য যোগ্যতর করে তুলে তার হাতে ইতিহাস রচনার ভার দিতে হবে। কথাটা সহজে বলা গেল, কিন্তু করা খুব কঠিন। কেউ করতে পারলে তাকে আমি অভিনন্দন জানাব।

হালখাতা

বাংলা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দেবেশ রায়, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী প্রমুখ প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকগণ উপন্যাসের প্রধান ধারাটি তৈরি করেছেন, যাদের শিল্প-দর্শন শুধু মানবতা দ্বারা নয়, বরং শ্রেণীদ্বন্দ্ব দ্বারাও অবয়ব পেয়েছে। কিন্তু বাংলা কবিতার সে ধারাটি প্রধান হয়ে উঠল না; সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিকে অনেক সময় ন্যূনতম কবির মর্যাদা দিতেও যেন সমালোচকদের বাধে। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

কারণটি সমালোচকরাই ভালো বলতে পারবেন। আমি কবিতার সমালোচক নই, এ নিয়ে কথা বলা আমার সাজে না। তবে কথাসাহিত্য বিষয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো ধোঁয়াটে। 'প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকগণ উপন্যাসের প্রধান ধারাটি তৈরি করেছেন, যাদের শিল্প-দর্শন শুধু মানবতা দ্বারা নয়, বরং শ্রেণীদ্বন্দ্ব দ্বারাও অবয়ব পেয়েছে'– বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইলেন? 'মানবতা' আর 'শ্রেণীদ্বন্দ্ব' কি পরস্পরবিরোধী ব্যাপার? এ ব্যাপারে এটুকুই বলার আছে যে, এই ধরনের উদ্ভট বিভাজনের জন্য কেউ কম বা বেশি গুরুত্ব পান, সে কথা আদৌ ঠিক নয়। যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের লেখায় কি শুধু শ্রেণীদ্বন্দ্বই আছে, অন্য কিছু নেই? তারচেয়ে বড়ো কথা হল– যা-ই থাকুক না কেন, তাঁদের সবার রচনাই শিল্পসফল রচনা। শিল্প যদি শিল্পই না হয়ে ওঠে তাহলে তাকে গুরুত্ব দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কবিতার ব্যাপারে আপনি যাঁদের কথা বলেছেন, তাঁদের ব্যাপারে সমালোচকরা কী মত পোষণ করেন আমি জানি না, তবে পাঠকদের কাছে তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচিত হন, পঠিত হন। একজন লেখকের জন্য পাঠকের চেয়ে কি সমালোচক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ?

হালখাতা

দাস, সামন্ত এবং পুঁজির আমল এই ধারাবাহিকতা যেমন একটি সত্য আবার ব্রিটিশ উপনিবেশও আমাদের ক্ষেত্রে আরেকটি সত্য; এসব পরিস্থিতিরই জাত কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার দর্শন; যে জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বস্ত্রের সমস্যা নেই, তাদেরও এক ধরনের দুঃখবোধ থাকে, নিঃসঙ্গতা থাকে; জীবনানন্দ দাশের কবিতার চিন্তাজগৎ প্রধানত সে ধরনেরই দুঃখবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতাবোধ দ্বারা উর্বরতা পেয়েছে; এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

আপনি একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং বোঝাই যাচ্ছে, আপনার অবস্থান এই স্টেটমেন্টের পক্ষে। আমি যদি বিপক্ষে অবস্থান নিই, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আপনি বিরক্ত হবেন। সৌজন্যের খাতিরে হলেও আপনার পক্ষে অবস্থান নেয়াটাই উচিত আমার। কিন্তু আপনার বিরক্তি উৎপাদনের রিস্ক নিয়েও বলতে হচ্ছে– আমি দুঃখিত, আপনার পক্ষে অবস্থান নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রশ্নটি নিতান্তই ক্লিশে এবং জীবনানন্দ দাশের প্রতি অবজ্ঞাসূচক। জীবনানন্দ কি উপনিবেশের ফল? তাঁর কবিতায় কি কেবল মিষ্টি মিষ্টি দুঃখবিলাস আছে, আর কিছু নেই? মানুষের মৌলিক সমস্যার বাইরেও তো গূঢ়তর দার্শনিক সমস্যা আছে, এমনকি ক্ষুধার্ত মানুষেরও দার্শনিক সংকট ও প্রতীতি আছে। সেগুলো কি কবিতার বিষয় হতে পারে না? তাঁর

কবিতায় জীবন ও জগতের যে বিপুল রহস্যময়তার ইঙ্গিত আছে, দার্শনিক সংকটের অন্বেষণ আছে, দার্শনিক বোধের প্রকাশ আছে, সেটি পৃথিবীর আর কজন কবির কবিতায় ধরা পড়েছে? জগতের সকল কবিই ভাতকাপড়ের সমস্যা নিয়ে লিখবেন, এমন কোনো দিব্যি নিয়ে তো কবিরা কবিতা লিখতে বসেন না! 'যে জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বস্ত্রের সমস্যা নেই' তারা কি মানুষ নয়? তাদের দুঃখবোধ কি দুঃখবিলাস? সমস্যা বলতে কি শুধু ' খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বস্ত্রের সমস্যা'ই বোঝায়? আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে– এদেরকে মানুষ বলেই মনে করেন না আপনি। এই ধরনের ক্লিশে কথাবার্তা বহুদিন ধরেই শুনে আসছি। যেসব তথাকথিত বিপ্লবী 'উপনিবেশ' 'সাম্রাজ্যবাদ' 'পুঁজিবাদ' এইরকম দু-তিনটে শব্দ শিখে জগতের সবকিছু ওই তিন-চারটে শব্দ দিয়েই ব্যাখ্যা করতে চায়, সেইসব 'মহান' ব্যক্তিদের প্রতি আমি কেবল করুণাই বোধ করি, আর ভাবি– তাদের চিন্তাজগৎ কতটা সংকীর্ণ হলে শিল্পকে এভাবে গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলা যায়! আপনাকে বলি, শিল্পে শতফুল ফুটতে দেয়াটাই মঙ্গলজনক। আপনার যদি জীবনানন্দের চিন্তাজগৎ কে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়, তাহলে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁকে খাটো করার জন্য উঠেপড়ে লাগবেন।

হালখাতা

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো সারা পৃথিবীর দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলো থেকে নানা ঐতিহ্য ও শিল্পদর্শনসমূহ চুরি কিংবা ডাকাতি করে নিয়ে যায় এবং সেগুলো তাদের জাদুঘরগুলোতে শোভা পায়, যার পেছনে নিশ্চয়ই রাজনীতি ও অর্থনীতি কাজ করে। আপনি বলবেন কি, কোন ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে তারা এটা করে?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

ঠিক কোন ধরনের চিন্তা থেকে তারা এটা করছে আমি তা পরিষ্কারভাবে বলতে পারব না; হয়তো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য করছে! আমি তো আর ওদের মনের খবর জানি না! বানিয়ে বানিয়ে অনেক বিপ্লবী কথা বলা যায়, কিন্তু সেগুলো যে সত্য হবে তা বোঝার উপায় কী? তবে একটা কথা বলি শুনুন, ওরা যে কাজগুলো করে, সেটি নিজেদের জাদুঘরগুলোকে সমৃদ্ধ করার জন্যই করে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা ওদেরকে সহযোগিতা করি কেন? আমরা কেন আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো প্রদর্শন করার জন্য ওদের দেশে পাঠাই? যদি না পাঠাই তাহলে ওরা কি করতে পারবে আমাদের? যুদ্ধ ঘোষণা করবে নাকি? আসলে আমাদের মধ্যেই গলদ আছে। ওরা চায়, আর আমরা দিয়ে দিই। উল্টোটাও তো হতে পারত! বাংলাদেশের যাদুঘর কর্তৃপক্ষ যদি অন্যদেশ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো

নানা জারিজুরি করে এনে নিজেদের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করে, আমি খুশি হব। এই দিক থেকে দেখলে, ওরা যা করছে তাতে ওসব দেশের মানুষ খুশি হচ্ছে!

হালখাতা

'শিল্পের জন্য শিল্প' এবং 'জীবনের জন্য শিল্প' এই দুটি ধারার আলাদা আলাদা দর্শন রয়েছে। এ ধারা দুটির 'দর্শন' এবং 'মোটিভ' নিয়ে কিছু বলুন।

আহমাদ মোস্তফা কামাল

এই বিভাজনও অহেতুক। সব শিল্পই জীবনের জন্য, আবার সব শিল্প শিল্পের জন্যও বটে। শিল্প যদি জীবনের জন্য না-ই হবে তাহলে সেটি কার জন্য? মরণের জন্য? নাকি মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর জন্য, যাদের জীবনকে আমরা 'জীবন' বলেই মনে করি না? সেটা হলেও অন্য কোনো প্রাণী তো মানুষের সৃষ্ট শিল্প উপভোগ করে বলে মনে হয় না। নাকি ভিন গ্রহের কারো জন্য? এই ধরনের ফালতু কথা বলার তো কোনো মানেই নেই। শিল্পকে সবার আগে শিল্প হয়ে উঠতে হবে, শিল্পীর দায় হল শিল্পকে আগে শিল্প করে তোলা– সেটা 'জীবনের' জন্যই হোক, আর 'শিল্পের' জন্যই হোক। এই দুটো ধারার সৃষ্টি হয়েছে আসলে দুটো চরমপন্থী চিন্তাবিদ দলের দ্বারা। একদল মনে করেন, শিল্পকে হতে হবে মানুষের জন্য। এর মাধ্যমে তাঁরা বোঝাতে চান যে, একজন শিল্পীর কাছে শিল্পের প্রয়োজনের চেয়ে মানুষের প্রয়োজনই বড়ো হওয়া উচিত, মানুষের যে বৈষয়িক সমস্যা-সংকট-বিপর্যয় আছে সেগুলোই শিল্পের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। এই চিন্তার এক্সট্রিম ফর্ম হল– শিল্পকে বিপ্লবের উপাদান হয়ে উঠতে হবে। এই ধরনের এক্সট্রিম চিন্তার প্রতিক্রিয়া হল– 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদ। এই মতবাদীরা বলতে চাইলেন, শিল্পীর আর কোনোদিকে তাকানোর দরকার নেই, কেবল শিল্প নিয়ে থাকলেই চলে। এই দুটোকেই চরমপন্থী মতবাদ বলে মনে করি আমি। শিল্পী কোনো সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীব নন, যে, তিনি কেবল শিল্প নিয়েই থাকবেন; মানুষ-সমাজ-রাষ্ট্র এসবের প্রতি তাঁর কোনো দায় থাকবে না। আবার শিল্পী কোনো বিপ্লবীও নন। তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বা সৃষ্টিকর্ম আশা করাও ঠিক নয়। শিল্প শেষ পর্যন্ত বিপ্লব করতে পারে না, এটা এখন প্রমাণিত সত্য। কোনো তাৎক্ষণিক অভিঘাত সৃষ্টি করাও শিল্পের পক্ষে সম্ভব নয়। শিল্প যা পারে, তা হল খুব ধীরে– হয়তো শত বছর ধরে– একটি জনগোষ্ঠীর মনে একটু একটু করে পরিবর্তন আনতে পারে। শিল্প মানুষকে আশ্রয় দেয়, প্রেরণা দেয়, উচ্চস্তরের বিনোদন দেয়, মানুষের মনের আকার দেয়; কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি ধীর গতিতে ঘটে। চটকদার ভঙ্গিতে কথা বলে বিপ্লবী ভাবমূর্তি নির্মাণের চেষ্টা কেউ কেউ করে থাকেন বটে, আবার কেউ কেউ বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ঝড়ের দাপট এড়াতে চান বটে– এই দুই ধরনের শিল্পীই শেষ পর্যন্ত শিল্পের জন্য ক্ষতিকর।

হালখাতা

বিশ্বখ্যাত পেইন্টিং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা'র মধ্যে অনেক মহৎ শিল্পের মহিমা রয়েছে, কিন্তু আমরা তো তার ভেতরে আমাদের জীবনের যে লড়াই সেটা পাই না। বরং জয়নুলের 'চাকা' পেইন্টিং-এ আমাদের জীবনের কষ্টটা মূর্ত হয়ে প্রকাশ পায়। এরূপ বিখ্যাত শিল্পের সাথে আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং কমখ্যাত দেশজ এমনকি (তুচ্ছ?) লোকায়ত শিল্পের মধ্যেই আমাদের নিজস্ব ইতিহাস ও লড়াইটা খুঁজে পাই, এ বিষয়ে কিছু বলুন।

আহমাদ মোস্তফা কামাল

শিল্পে আমরা কী চাই, এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব জরুরি। আপনিই বললেন, 'মোনালিসার মধ্যে অনেক মহৎ শিল্পের মহিমা' রয়েছে, কিন্তু জীবনের লড়াই নেই। আবার জয়নুলের পেইন্টিংসের মধ্যে সেই লড়াইটা আছে। আমরা কি শুধু লড়াইটাই চাই? এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা দরকার আগে। কেউ যদি শিল্পকে শুধুমাত্র 'লড়াই' করবার হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চান, তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে শিল্পকে এরকম কোনো গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চাই না। কোনো শিল্পী যদি আর কোনোকিছু না ভেবে কেবল শিল্প-সৃষ্টির আনন্দেই 'লড়াই'হীন শিল্প রচনা করেন এবং সেটি যদি শিল্প হয়ে ওঠে তাহলে এর রসাস্বাদন করতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আবার কোনো শিল্পী যদি মনে করেন, জীবনের 'লড়াই'টাকে তিনি তাঁর শিল্পে মূর্ত করে তুলবেন এবং সেই কাজটিও যদি শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে তাহলে সেটিকেও আমি সাধুবাদ জানাব। আমি বরাবরই বলে এসেছি, এখনও বলছি– শিল্পের প্রথম কাজ শিল্প হয়ে ওঠা, লড়াই করা নয়! আপনার প্রশ্নটা বরং বিভেদমূলক। মহৎ শিল্পের মহিমা থাকা সত্ত্বেও যে শিল্পে তথাকথিত 'লড়াই' নেই আপনি তাকে মেনে নিতে পারেন না। এটা ভোক্তা হিসেবে আপনার সীমাবদ্ধতা।

আরেকটা কথা। আপনি বলেছেন– 'এরূপ বিখ্যাত শিল্পের সাথে আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না'– প্রশ্ন হচ্ছে, 'আমাদের মধ্যে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন? কাদের জীবনের সঙ্গে, কীভাবে এই যোগসূত্রটি খুঁজছেন আপনি? আমি যদি বলি, আপনি পান না, কিন্তু আমি তো পাই, তাহলে? শিল্পকে কে কীভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে নেয়, সেটা বলা কঠিন। নিজে সম্পর্কিত করতে না পারলে তার দায়ভার অন্য সবার কাঁধে এবং একইসঙ্গে শিল্প ও শিল্পীর কাঁধে চাপানোটা ঠিক নয়! আর 'কমখ্যাত দেশজ লোকায়ত শিল্পের মধ্যে' তো ইতিহাস ও লড়াইয়ের সন্ধান পাবারই কথা। সেজন্যেই তো ওই শিল্প বিশিষ্ট, শিক্ষিত মানুষের তৈরি শিল্পের চেয়ে আলাদা ও অনন্য। এ সম্বন্ধে আগেই বলেছি, নতুন করে আর কী বলব!

হালখাতা

লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে কিংবা ইরানের চলচ্চিত্রে কিংবা বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে জনগণের শ্রম, সংগ্রাম, কষ্ট ও বঞ্চনা যেমন দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়, পক্ষান্তরে আমেরিকার (ইউএসএ) সাম্প্রতিক সাহিত্য, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা প্রায় সময়ই এক ধরনের ভাঁড়ামো বা সুখী মানুষের এক ধরনের চিন্তাশূন্যতাকে উপস্থাপন করে। লাতিন আমেরিকা, ইরান ও বাংলাদেশে উল্লিখিত জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পের সঙ্গে আমেরিকার চিন্তাশূন্য শিল্পধারার এই ব্যবধান আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

আপনার প্রশ্নের সঙ্গেই তো আমি একমত নই, ব্যাখ্যা করব কীভাবে? এই প্রশ্নটি আপনার তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা' থেকে উদ্ভূত। আপনারা একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে চান না যে, একটি দেশ সাম্রাজ্যবাদী হলেও ওই দেশের শিল্পীরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান করতে পারেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা থাকে, তাদেরকে দিয়ে আপনি শিল্পীকে বিচার করতে চান? কী অদ্ভুত সরলীকরণ! আমেরিকার সাম্প্রতিক সাহিত্য, চলচ্চিত্র বা চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। আপনি যদি সামগ্রিকভাবে আমেরিকার শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা বলে থাকেন, তাহলে এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা ছাড়া উপায় নেই। রবার্ট ফ্রস্ট, সিনক্লেয়ার লিউইস, ইউজিন ও'নীল, পার্ল বাক, উইলিয়াম ফকনার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জন স্টাইনবেক, আর্থার মিলার, এডওয়ার্ড এ্যালবী– এইসব শক্তিমান সাহিত্যিকদের বাদ দিয়ে আমি কীভাবে আমেরিকার সাহিত্য নিয়ে কথা বলব? এই লেখকরা (এরকম লেখক নিশ্চয়ই আরো অনেকে আছেন, যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না), কি কেবল 'এক ধরনের ভাঁড়ামো বা সুখী মানুষের এক ধরনের চিন্তাশূন্যতাকে উপস্থাপন' করেছেন? আপনি যদি এরকমটি মনে করে থাকেন, তাহলে তো আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথাই চলে না! বহু উন্নতমানের শিল্প কি রচিত হয়নি ওখানে? অবশ্য সাম্প্রতিককালে ওখানে কী হচ্ছে, আমি জানি না। তবে আপনি যদি 'হ্যারি পটারকে মানদণ্ড ধরে নিয়ে কথা বলে থাকেন তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর না দেয়াই ভালো। শুধু একটা কথা বলি– সব দেশে সব কালে শিল্পসাহিত্যের দুটো ধারা থাকে। একটি সিরিয়াস অন্যটি জনতুষ্টির জন্য। জনতুষ্টির জন্য যে শিল্প সেটি মাঝে মাঝে ভাঁড়ামো উৎপাদন করবেই। বাংলাদেশেও কি তার উদাহরণ নেই? তাছাড়া, রাষ্ট্রের চরিত্র দিয়ে শিল্পের চরিত্র বুঝতে চাইলে কি আদৌ কিছু বুঝে ওঠা যাবে? ঢালাওভাবে কোনো দেশের শিল্প সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা সমীচীন বলে মনে করি না।

হালখাতা

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাতিসংঘ এরা তো সারা দুনিয়ার শিল্পেরও ইজারা নিয়ে নেবে একদিন, এবং প্রতিনিয়ত শিল্পীর চিন্তাজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করবে (নাকি প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে?)। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

আহমাদ মোস্তফা কামাল

এটা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। যিনি প্রকৃত শিল্পী তাঁকে কখনো কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানই বলুন আর রাষ্ট্রই বলুন, কারো শক্তিই একজন শিল্পীর শক্তির চেয়ে বড়ো নয়। শিল্পীর চেয়েও শক্তিমান তাঁর শিল্প। শিল্পের ইজারা নেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যে সব শিল্পীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যে শিল্পীরা তাদের শিল্পকে ইজারা দেন তাদেরকে আমি শিল্পী বলেই মনে করি না।

হালখাতা

আপনার উপন্যাসে বা গল্পে জীবনের অনুরণন রয়েছে, জীবনের তীব্রতা রয়েছে, কিন্তু অভিযোগ রয়েছে– অধিকাংশ সময়ে আপনার উপন্যাস, গল্প এমনকি প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত চিন্তাকে পলিটিসাইজ করা যায় না– অর্থাৎ আপনার শিল্পের চিন্তাজগৎ কোন রাজনীতিকে ধারণ করে তা বোঝা যায় না, এই অভিযোগ কতটা সত্য? আর সত্য হলে এর পক্ষে যুক্তি কী বলে আপনি মনে করেন?

আহমাদ মোস্তফা কামাল

নিজের লেখা সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি। ওখানে কী আছে না আছে সেটি পাঠকরা খুঁজে নেবেন বলেই বিশ্বাস করি। আপনাকেই বরং জিজ্ঞেস করি, আমার গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে কোন ধরনের রাজনীতির সন্ধান পেলে আপনি খুশি হতেন? তারচেয়ে বড়ো প্রশ্ন– আমার লেখায় রাজনৈতিক সচেতনতা আছে কি না? থাকলে সেটি কীভাবে আছে? তার স্বরূপ কী রকম? আমি সবসময় আমার সময়ের দুঃসহ পীড়ন ও অসহ্য বেদনাকে ধারণ করতে চেয়েছি। কোনো দলের মুখপাত্র হয়ে কাজ করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আদর্শের প্রচারকও আমি নই। মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর, আমি সবসময় তা-ই চেয়ে এসেছি, লেখায় তার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছি। সেটি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনীতির এজেন্ডা না হয়ে থাকে তাহলে আমি আনন্দিত। আমি চেয়েছি– ওগুলো যেন এজেন্ডা না হয়ে ওঠে। ওগুলোতে যদি 'জীবনের অনুরণন, জীবনের তীব্রতা' থেকে থাকে আমি তাতেই খুশি। আপনাদেরকে, অর্থাৎ যারা 'চিন্তাকে পলিটিসাইজ' করতে চান, তাদেরকে খুশি করার দায় আমি অনুভব করি না।

অনুগদ্য

আচরণের শিল্পদর্শন

ফেরদৌসী সুলতানা

আমার কাছে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বা আচরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যম বলে সবসময়ই মনে হয়েছে। যখন থেকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে শিখেছি সে সময় থেকে এই পরিণত বয়স পর্যন্ত যদি বিশ্লেষণ করি– তাহলে মনে হয় আচরণ বিষয়ে হয়তো বিশেষজ্ঞের মতোই একটি মতামত দিয়ে ফেলতে পারব। আসলে আচরণের মধ্যে শিল্পের উপস্থিতি কতটা প্রয়োজন? তাছাড়া এখানে শিল্প বলতে কী বুঝব? সুন্দর, মার্জিত যথাযথ শিল্পিত আচরণের মাধ্যমে একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন; তখন আরেকজনের কাজকে যুক্তির সঙ্গে ঐ শিল্পিত আচরণ দিয়ে সহজেই প্রভাবিত করে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারেন।

কর্কশ ব্যবহার, কদর্য শব্দচয়ন ও ঔদ্ধত্য মহৎ কাজের প্রেষণাকেও ব্যাহত করে। অন্যের কাছে নিজেকে হেয় করার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হতে পারে না।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তি হই আবাসিক ছাত্রী হিসেবে শামসুন্নাহার হলে থাকতাম; এ সময় একটা নিয়ম ছিল গরমের দিনে সন্ধ্যা ৭টা আর শীতের দিনে সন্ধ্যা ৬টায় ঘণ্টা পিটিয়ে হলের গেট বন্ধ করা হত। সর্বকালে সর্বাবস্থায়ই কিছু মানুষ থাকে যারা মোটামুটি নিয়ম ভাঙতে অভ্যস্ত; সেরকম কিছু ছাত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হলে ঢুকতে চাইত না। ফলে প্রতিদিন হাউজ টিউটরদের অফিসে গিয়ে বকাঝকা খেতে হত। হাউজ টিউটরদের মধ্যে কেউই এসব নিয়ে ঝামেলায় যেতে চাইতেন না। এদের মধ্যে দু'জন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো দেখতেন; একজন রেবু আপা, অন্যজন ফাতেমা আপা।

দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল দু'রকম। রেবু আপা যখন রূঢ় কণ্ঠে বকাঝকা করতেন মনে মনে রেগেমেগে অস্থির হয়ে যেত মেয়েরা। মনে মনে গালিও দিত আর জেদ চেপে যেত তাদের। আবার, এরকম করার প্রতিজ্ঞাও করতো কেউ কেউ– ভাবটা এরকম যে– করবইতো, দেখি আপনি কী করেন! আর ফাতেমা আপা? তিনি এমনভাবে তাকাতেন বড় বড় চোখ দিয়ে, যেন কী এক অস্বস্তিকর ব্যাপার-ই-না তাকে

হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। বলতেনও খুব নিচু স্বরে। হিস হিস করে বলতেন, মেয়েদের এধরনের কাজ করা ঠিক হচ্ছে না। তিনি ছাত্রীদের মতো হলে তো লজ্জায় মরেই যেতেন– এরকম ভাবভঙ্গি প্রকাশ পেত তাঁর মধ্যে। মিছরির ছুরির মতো। মিষ্টি, ঝাঁঝালো এবং ধারালো।

আমি দেখেছি, ফাতেমা আপার এই নমনীয় আচরণে অনেকে অনুতপ্ত হত, আর নিয়ম না ভাঙার অন্তত চেষ্টা যে ছাত্রীরা করবে তা বোঝা যেত।

আমি খুব গভীরভারে এ বিষয়গুলো দেখেছি। আমার জীবনের প্রতিটি স্তরে, বিশেষত চাকরি জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাতেমা আপার এই ধরনের আচরণ যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে তা আমি উপলব্ধি করছি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে সে দলেরই এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ফায়দা লুটে নেয়ার চেষ্টা করেছে। এই লুটেরাশ্রেণী খুবই ভয়ঙ্কর। এদের নীচতা এবং হীনতার সাথে কোনোকিছুর তুলনা হয় না।

আমি দীর্ঘকাল ধরে জনসংযোগ বিভাগে কাজ করছি। আমি জানি, মানে জানতে হয়েছে কোন আচরণে মানুষ কতখানি তুষ্ট বা কতখানি ক্ষিপ্ত হয়। নারী হওয়ার কারণে অনেক অনভিপ্রেত কথা বা ঘটনা আমাকে কৌশলে মোকাবেলা করতে হয়েছে। অর্থাৎ নিজের আচরণে শিল্পমান রক্ষা করে চলতে হয়েছে এবং হচ্ছে, যা একজন পুরুষ জনসংযোগ কর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পত্রিকায় জমা দিয়ে কমিশন পেয়ে জীবনধারণ করেন এক শ্রেণীর লোক। তাদের আচার-আচরণ ভাব-ভঙ্গি কথা-বার্তা এক ধরনের। এদের সাথে আচরণের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। এমনিতেই জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে বসে আছি শাঁখের করাতের ওপর; আসতেও কাটে যেতেও কাটে।

বিজ্ঞাপন দেবার অথরিটি তো সুপ্রিম বসের। যখন বিজ্ঞাপনের অনুমোদন কেউ পাবেন তখন আকর্ণ দন্ত বিকশিত করে এমডি সাহেবের গুণগান করবেন আর যখন তা পাবেন না তখন পিআর পারসনের ফরটিন জেনারেশন উদ্ধার করে ছাড়বেন, একথা সবাই জানেন। এসব নিয়ে ভাবি না। ভাবি যখন বাঁশের চেয়ে কঞ্চির দড় বেশি হয়। অর্থাৎ যখন চামচারা ক্ষমতার দাপট দেখায়, সে সময় খুব জেদ হয় আমার, ঘেন্নাও হয়। সৌভাগ্যবশত আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করি; সুতরাং এসব তোয়াক্কা না করলেও চলে; করিও তাই। কিন্তু যখন সুনামি হয় তখন তার এফেক্ট যেমন আশপাশেও লাগে আমাদের সেরকম কিছু ধাক্কা তো সামাল দিতেই হয়। এই সামাল দেয়া নিয়ে আমাকে কখনো কেউ কিছু বলেনি বা আমি কোথাও প্রশিক্ষণও নিইনি। তাহলে যদি প্রশ্ন আসে, শিখলেন কোথায়? আমার সবল উত্তর, ঠেকেছি যেখানে। অর্থাৎ সমস্যাকে সমাধান করা এবং সাফল্যের সাথে সেখান থেকে বের হয়ে আসাই হল স্বার্থকতা।

আচরণের শৈল্পিক দিক আছে বৈকি। কিন্তু আমি যখন কেতাদুরস্ত– কোনো কনফারেন্সে যোগ দিতে যাচ্ছি তখন আমার আচরণ আর আমি যখন অফিসে এক্সিকিউটিভ তখন আমার আচরণে ভিন্নতা তো থাকবেই। যখন পিকনিক, বিয়েবাড়ি, জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যাই সেখানে আবার উৎসবের আচরণ।

অফিসে একজন সহকর্মীর সাথে অন্য সহকর্মীর আচরণ কীরকম হয়? আমি যখন জুনিয়র অফিসার ছিলাম দেখেছি সহকর্মী এক ইমিডিয়েট বসের সাথে প্রতিযোগিতা এবং বন্ধুত্ব দুটোই হয়। আবার কখনো এই প্রতিযোগিতা নোংরা কাদা ছোড়া-ছুড়িতে পর্যবসিত হয়। যা পরিবেশ নষ্ট করে। জীবনের বেশিরভাগ সচেতন সময়ই কাটে অফিসে আর সেখানেই যদি দম বন্ধ-করা পরিবেশ হয় তবে তার প্রভাব এসে লাগে বাড়িতে, পাড়ায়, সমাজে এমনকি রাষ্ট্রে।

আমি দেখেছি অনেকের ম্যানেজেরিয়াল ক্যাপাসিটি প্রশংসনীয়। তারা কাউকে ছোট ভাই বলে, কাউকে বাবা সোনা বলে আদর দিয়ে যাদু-মন্ত্রের মতো কাজ করিয়ে নেন। আর যারা বসিং করেন, কমপেয়ার করেন, প্রতিযোগিতা করেন তাদের কলিগের সাথে সম্পর্কও জটিল হয়। কাজ আদায়েও সমস্যা হয়।

আমার কথাই বলি; কাজ আর অকাজ দুটোই বিস্তর এখানে। মাঝে মাঝে নিজের বাকযন্ত্রের পাওয়ার দেখে নিজেই অবাক হই। কত যে বাক্য প্রয়োগ করি বিভিন্ন বয়সীদের বিভিন্নভাবে সম্বোধন করে; তাদের ভাষায় গ্রহণযোগ্য করে বলা এবং এদেরই দিয়ে কাজ করানোর কৌশল আরো করেছি আমি।

মোদ্দা কথা হল যখন যেখানে যেমন, তেমন আচরণই গ্রহণযোগ্য; বুদ্ধিমান এবং নির্বোধ দুজনের সাথে সমান আচরণ করা সম্ভব নয় উচিতও নয়।

আমরা কি ভদ্রলোক এবং সন্ত্রাসী দুজনের সাথে একই আচরণ করব? এক রকম আচরণ করা হলে দুজন একইরকমভাবে নেবে সেটা আশা করাও ঠিক হবে না।

আমার মনে আছে, আমি যখন ডেলটায় নতুন যোগ দিয়েছি, পাবলিক রিলেশনস'এ সে সময় বয়স এবং অভিজ্ঞতা দুটোই ছিল কম। আমি পোলাইটলি সিনিয়রদের সম্বোধন করতাম। আদর যত্নটত্নও করতাম। এখনো যে করি না তা নয়। আস্তে আস্তে আমি নিজের মাঝে পরিবর্তনের তাগিদ পাই। আমি আবিষ্কার করলাম আমি এখন তো 'যখন যেমন যাকে ' আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যখন শুরু করেছিলাম তখন সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতাম পোলাইটলি; ফলে অনেকে লেট সিটিং দিত, অনেকে দুর্বল মনে করত। আবার অনেকে অন্যরকম অর্থ করত। এতে আমার কাজেরও ভয়ানক ক্ষতি হতে থাকে। আস্তে আস্তে আমি বদলাতে থাকি।

মনে পড়ে ডেলটায় একদিন ৩০-৩২ বছরের এক যুবক আমার চেম্বারে আসে। আমি মুখ তুলে তাকাই। সে অনুমতির অপেক্ষা না করেই ধুম করে বসে পড়ে। আমি ওকে দেখতে থাকি। মাথাভর্তি এলোমেলো চুল। ঢুলু-ঢুলু চোখ যেন এইমাত্র ঘুম থেকে জেগেছে। এইরকম লালচে চোখে সে আমার দিকে তাকাল। কর্কশ গলায় তার

উচ্চারণ: আমার কাজটার কী অইলো? আমি তো হতবাক; কোন কাজ কী বৃত্তান্ত শোনার পর আমি নেতিবাচক জবাব দেই। জবাব শোনার পর সাথে সাথেই হিস হিস করে কী যেন বলল তার পরই নড়ে চড়ে বসে একটি পিস্তল বের করে আনল । আমাকে তাক করে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলে, তুই দিবি না তোর বাপ দেবে। যা সাফাতকে বল্ গিয়ে আমার কথা।

আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি কী হচ্ছে! পিস্তল না দেখলেও খেলনা পিস্তল তো দেখেছি, এজন্যই বোধ হয় ভয়ংকর মনে হল না যন্ত্রটাকে। আমি কী-জানি কী-হল একই সুরে বললাম, এ্যাই কথা কম ক'তোর জন্মের আগে আমি জন্মাইছি জানস। নাক টিপলে দুধ-গলে তার ওপর বড় বড় কথা। দিমু চটকানা ছেমড়া। কে পাঠাইছে তোরে? খাড়া ফোন করতাছি। আমার এই উদ্ভট আচরণ আর রুদ্রমূর্তি দেখে ছেলেটি ভড়কে গ্যালো। নিমিষেই সে তার পিস্তল পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে বিনয়ের অবতার হয়ে যায়। এই রকম কত যে উদাহরণ আছে, যা হাজির করে শেষ করা যাবে না। আবার মনে করা যাক, একজনকে হাসিমুখেই একটি বিজ্ঞাপন দিলাম তার অখ্যাত কাগজের জন্য; তিনি তখন বার বার বিভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে থাকবেন। তখনই ফের ভোল পাল্টাতে হয় আমাকে। সময়ের প্রয়োজনে কোথায় যায় আমার শৈল্পিক আচরণ! কোথায় কী! এমন সব সমস্যার ক্ষেত্রে আমি চেহারা দিয়ে, তাকানোর ভঙ্গি বদলিয়ে, কটকট-মটমট বিভিন্ন ধরনের চাহনি দিয়ে উইদাউট বাক্য ব্যয়ে একটি মুড আনার চেষ্টা করি। এখন মনে হচ্ছে এতে সফলও হয়েছি। এই নিজস্ব ঢংটির কোনো নাম অবশ্য দিইনি এখনো।

বছর চারেক আগে তখন আমাদের এমডি শাহ মো: নূরুল আলম; তিনি ইন্টারকমে ডাকলেন; তাড়াতাড়ি আসো। গেলাম। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন, চশমার নিচ দিয়ে তাকিয়েছিলে কেন ঐ ভদ্রলোকের দিকে? চশমার উপর দিয়ে তাকাতে পার না? বুঝলাম কিছুক্ষণ আগে যে ভদ্রলোকটির কাজ হয়নি তিনি আমাকে ইনিয়ে -বিনিয়ে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছিলেন এবং অবশেষে ইনডাইরেক্ট থ্রেটও...। আমি তখন ফাইলওয়ার্ক করছিলাম। নাকের ডগায় চশমা, এই সময় বিশেষ চাহনি ছাড়া আর কিছু দিইনি আমি। আমি যেহেতু কোনো কথাই বলিনি তখন দোষ তো চাহনি'রই হবে, তাই না?

আর একটা আচরণ আমি করি তার নাম দিয়েছি কাট-টু-কাট। এটি আমার সবচেয়ে পছন্দের আচরণ যা আমি বারে-বারে প্রয়োগ করি। কার কাজ হবে কার হবে না, কেন হবে, কেন হবে না তা আমি ফটাফট বলে দিতে পছন্দ করি। অনেকে কাজটা হবে না জেনেও সাত দিন ঘুরিয়ে বিদায় করে। আমার এটি পছন্দ নয়। আমি মনে করি এই সাত দিনে সে সাতটি অল্টারনেট কাজ করতেই পারে।

আমি আসলে কখন যে কী ধরনের আচরণ করছি তা অনেক সময় আমি নিজেই বুঝি না; আকাশের রং বদলানোর মতো; যখন যে ধরনের চরিত্র আসছে তাকে ফেস

করতে সে ধরনের ব্যবহার করছি। আমার বিরুদ্ধে একটি অর্থনৈতিক কাগজে একজন লিখেছিলেন, 'ভদ্রমহিলা খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির, তার ঠাণ্ডা আচরণ ভাবলেশহীন ব্যবহার আমাকে আহত করেছে'।

আমি এই লেখাটি পড়ে খুবই চমৎকৃত হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমি তাকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারিনি, যদি পারতাম হয়তো ল্যাংগুয়েজ হতো এরকম, 'ভদ্রমহিলা খুবই অমায়িক, তার শান্ত-সৌম্য আচরণ আমাকে বিমোহিত করেছে'।

সব কথার শেষ কথা হল প্রাপ্তি; আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যে পৌঁছুতে চাই। এ জন্য নিয়ামক হচ্ছে মানুষ। এই মানুষই যখন একে অন্যের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হয় তখন তার মধুর আচরণও বিষবৎ মনে হয়। আর যদি ইতিবাচক হয় তবে তার জঘন্য আচরণও মনে হয় ইউনিক।

আচরণ নিজেই এক বিস্ময়। তাই এটি কখন কী রূপে মানুষকে প্রভাবিত করবে তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। আচরণের এই বৈশিষ্ট্যই আচরণকে দিয়েছে শিল্পের মর্যাদা।

জীবন-শিল্পের দর্শন

বিভানূর মুন্সী

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, চিত্র, গান ইত্যাদি যেমন শিল্প, একইভাবে প্রাত্যহিক ব্যবহার্য বিষয়ের মধ্যেও শিল্প বিষয়টি বিদ্যমান। জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় সুন্দর, নিরাপদ ও আনন্দ তাহলে শিল্পকে শুধু নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় বন্দি করে রাখলেই হবে না, শিল্পের সংজ্ঞাই সেখানে পরিবর্তন করতে হবে। ফলে শিল্পের দর্শনও খণ্ডিত থাকবে না; জীবনের সর্বময় পরিব্যাপ্ত হবে শিল্পের আভা। সেখানে জীবনই শিল্প। আবার বলা যায় শিল্পই জীবন!

তবে মানুষের বিমূর্ত বোধ আর চেতনাকে যে জ্ঞান বিশ্লেষণ করে, সে জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময়ের। কারণ মানুষের বোধ বা উপলব্ধি বিবিধ, পাশাপাশি

মানুষের চেতনার যে জগত তাও বহুমাত্রিক। এটি চিরসত্য যে মানুষের ভেতর নিয়ত নতুন বোধের উদয় ঘটে। কোনো মানুষ হয়তো এর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটাতে পারে, অনেকে হয়তো পারে না, কিন্তু পৃথিবীর ফুল, পাখি, নদী, প্রজাপতির মতোই মানুষের বোধ তো সমান বাস্তব। মানুষের পুরো জীবন– ভাবনা আর কর্ম দিয়েই পল্লবিত। মানুষ ইতিহাস বিনির্মাণে সক্ষম। জীবনের প্রতিটি সময়ই মানুষ ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছে। মানব জাতির সব ধরনের বিবর্তনের মূল রূপকার মানুষ নিজে। সেদিক থেকে উল্লেখ্য যে, মানুষের অস্তিত্বের প্রাথমিক ও মৌলিক শর্তগুলোকে কার্ল মার্কস দেখেছেন বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা দিয়ে। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যে সামাজিক পরিবর্তনগুলো করেছে মার্কসের লক্ষ্য সমাজের এই পরিবর্তনগুলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দান করা।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ নিজেকে রক্ষার জন্য গুহা তৈরি করেছিল। তখন তারা আহারের জন্য পশু শিকার করত। পশুর চামড়া পরিধান করত ঝড়, তাপ আর বরফ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য। তারা আগুন আবিষ্কার করেছিল পশুর হিংস্রতা থেকে রক্ষার জন্য। ইতিহাসের ক্রমধারায় শিকারে ফেরা গুহাবাসী মানুষ যেদিন তার গুহার গায়ে পশুর ছায়া দেখেছিল, সে ছায়াকে অবলম্বন করে মানুষ প্রথম গুহার গায়ে ফুটিয়ে তুলেছিল পশুর প্রতিচ্ছবি। সে ছবি হয়তো নন্দনতাত্ত্বিক সুকুমার শিল্প ছিল না। তবে স্বাভাবিকভাবেই সে ছবিতে ছিল চেতনাতাড়িত অনিবার্যতা। স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লাসকো ও আইজিসে পাওয়া গিয়েছে সবচেয়ে পুরনো গুহাচিত্র। মানুষের শিল্পচেতনার পরিচয় তখনই পাওয়া গিয়েছিল পৃথিবীর প্রথম যাযাবর শিকারী মানুষদের মাঝে।

শিকারের মানসিকতায় প্রাণীর ওপর শক্তি স্থাপনের কল্পনা থেকে পৃথিবীর প্রথম শিল্পসৃষ্টি। গুহার দেয়ালে প্রাণীর ছায়া দেখার ব্যাপারটি শিল্পের ইতিহাসে পৃথিবীর মানুষের প্রথম শিল্পদৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'যাহা সুন্দর নহে যাহা সাধারণ তাহার প্রতি আমাদের মনের সহজ আনন্দ ইহাও আর্টের বিষয়। যদি তাহা না হইত তবে আর্ট আমাদের ক্ষতি করিত'। আমাদের সাধারণের একটা ভুল ধারণা, শিল্প এক ধরনের বিলাসসামগ্রী, যা কিনা সাধারণের বোধ ও কল্পনার বাইরের জিনিস। ধারণাটি সঠিক নয়। শিল্প আমাদের নিত্য সহচর। শিল্প দেখা ও বোঝার জন্য প্রয়োজন বোধ ও কল্পনার। যখন কোনো শিশু তার ক্রোধ আর মোহ থেকে চিৎকার করে– সেখানে শিল্প হতে পারে। যখন কোনো নারী তার নির্যাতনের রূপচিত্র তার কথা বা তুলিতে ফুটিয়ে তোলে– সেখানে শিল্প হয়। আবার সদ্যপ্রসূতি মাতা যখন তার নবজাতকের চোখের কোণে অপশক্তির দৃষ্টির ভয়ে কালো তিলক আঁকে সেখানেও শিল্প হতে পারে।

আফ্রিকার শিল্পকলায় একটা কঠিন মেজাজ প্রদর্শন করে; একটা ভয় আর অদ্ভুত গড়ন শিল্পের ইমেজ প্রকাশ পায়, যে জটিল বিন্যাস মানুষের মনে ভীতির

সঞ্চার করে, তারপরও এটি শিল্প। ভয়, ক্রোধ, আনন্দ, প্রতিবাদ, প্রতিকার সব শিল্পের উপকরণ।

শিল্পের সাধারণ চরিত্র নির্মাণ করা কঠিন। কারণ শিল্পের জ্ঞান-কাঠামো-ধরন বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন। সব যুগেই শিল্প তার নিজস্ব আঙ্গিক নিয়ে বিকশিত হয়েছে। শিল্পে তাই তখনও দর্শনগত কোনো বাধ্যবাধকতা গড়ে ওঠেনি। পৃথিবীর প্রথম মানুষের বন্য কল্পনায় রোপণ করে গিয়েছে চিত্রকলার প্রাথমিক বীজ। পৃথিবীর প্রথম শিল্প চিত্রকলা। আদি মানুষের কোনো ভাষাজ্ঞান ছিল না, ছিল না অক্ষরজ্ঞান, বিবর্তনের ধারায় মানুষ এক সময় বলতে শিখেছে, লিখতে শিখেছে। ইট, মাটি, কাঠ, পাথরের বহুমাত্রিক ব্যবহার শিখেছে। রচনা করেছে কল্পনা আর চেতনার মাধুরী দিয়ে বিবিধ শিল্পসমগ্র।

শিকারের পটভূমিতে মানুষ প্রথম শিল্প সৃষ্টি করে। তারা গুহাচিত্রগুলোর সামনে উন্মত্ত নৃত্যক্রিয়া করত এবং উন্মত্ততার এক পর্যায়ে তারা গুহাচিত্রের পশুগুলোকে তীরবিদ্ধ করত। আঘাত করত। এভাবে তারা ধারণা করত পশুকে আঘাত করতে করতে তাদের নিজেদের ভেতরে পশুকে আয়ত্তে আনার আরও অনেক বেশি শক্তি জন্মাবে।

সৌন্দর্যচেতনা আর শিল্পদর্শন কিন্তু এককথা নয়। প্রয়োজন আর বাস্তববাদিতা থেকে মানুষের শিল্পচর্চার পথচলা শুরু। মানুষ শেষপর্যন্ত জীবনই নির্মাণ করে, শিল্প নির্মাণ করে না। জীবনের যে দর্শন তাই শিল্পের দর্শন। জীবন হবে এক রকম, আর শিল্প হবে আরেক রকম– এমনটি কখনোই সম্ভব নয়। জীবন-শিল্পই একমাত্র শিল্প। জীবনের দর্শন যেখানে শূন্য সেখানে আলাদা করে শিল্পের দর্শন খোঁজ করা বোকামি। আমাদের বর্তমান শিল্পের দর্শনশূন্যতার কারণও তাই। কাজেই যেটা প্রয়োজন সেটা হল জীবনের দর্শন খুঁজে বের করা। আর সেখানে গলদ থাকলে সবার আগে প্রয়োজন তাকে নির্মাণ করা ।

সাধারণের শিল্প ও তার দর্শন

মো হা ম্ম দ আ লী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও সাধারণ জনগণের মধ্যে তার শিকড় কতটুকু বিস্তৃত? এর জবাব হতো এভাবে দেয়া যেতে পারে, সাধারণ মানুষ তো শিল্পের কিছুই বোঝে না, তাদের বোঝার মতো করে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেকারণেই তেমন কোনো শিল্পোদ্যোগ গ্রহণও করেননি। এ কথা হয়তো অনেকটা সত্য কিন্তু সাধারণকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না রবীন্দ্রনাথের ভেতর। তাহলে সমস্যাটা এমন কী জটিল যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের সমস্যার কথা ভেবেছেন কিন্তু সেই সমস্যার সমাধানের পথে তিনি আগাতে পারলেন না? জটিলতাটা হয়ত রাজনৈতিক নয়, তবে জটিলতাটা রাজনীতি নিয়ে। সেটা হল রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন কী ছিল, এর যেমন পরিষ্কার জবাব দেয়া কঠিন একইভাবে সাধারণের জন্য কিছু করতে হলে রাজনৈতিক পথে চলা ছাড়া তো দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন যে কারও পক্ষে বিশ্বব্যাপী সাধারণের জন্যে কিছু করার উদ্দেশ্য থাকা মানে সেই উদ্যোগকে অবশ্যই রাজনৈতিক হতে হবে।

যে শিল্প-চেতনা মানুষের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়াবলির প্রতি মনোযোগী এবং নিবেদিত সেটাই শিল্প-দর্শন। যখন এর মর্মগত ভিত্তি হয়ে ওঠে জীবনের সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধানের পথ-নির্দেশক, তখন তাকে জীবনের শিল্প অভিধায় ভূষিত করতে পারি। অর্থাৎ যে শিল্প বেশির ভাগ মানুষের মনোজগতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সক্রিয় থাকে তাকে আমাদের শিল্প বলতে পারি। বিশ্ব-সাহিত্যে টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি, লু সুন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সাহিত্য আবেদনের কথা আমরা জানি––এঁদের সাহিত্য শিল্পমানসম্মত। তবু প্রশ্ন থেকেই যায় তাঁদের এ সব সাহিত্য কতটুকু গণশিল্পের অন্তর্গত? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য : একবার সক্রেটিসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ন্যায় কী? তিনি একটা গল্পের মাধ্যমে প্রশ্নটার সমাধান দিয়েছিলেন এভাবে, একব্যক্তি আমার কাছে একটা অস্ত্র জমা রেখে গেল। কিন্তু সে যখন অস্ত্রটি ফেরৎ চাইল, তখন সে মানসিকভাবে অসুস্থ। এ অবস্থায় যদি অস্ত্রটি ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহলে বিরাট ক্ষতি হতে পারে। আবার যদি জিম্মায় রাখা অস্ত্রটি ফেরৎ না দেওয়া হয়, তাহলে সেটাও নৈতিকতাবিরোধী কাজ বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু সব দিক

বিবেচনা করে দেখা গেল, অস্ত্রটি ফেরৎ না দেওয়াটাই ন্যায়। এখানে ন্যায়ের ক্ষেত্রে যেমন বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, একইভাবে শিল্প-দর্শনের ব্যাপারটিও জনগণের জীবন-ঘনিষ্ঠ হয়েও অনুরূপ ব্যাপার। আবার লু সুনের ভাষায় বলতে হয় :'ভালো গাড়ি থাকলেই হবে না, ভালো রাস্তাও প্রয়োজন।'

অর্থাৎ ভালো মতাদর্শের ওপর শুয়ে-বসে দিন কাটালেই হবে না, সময়মতো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে দিক থেকে পৃথিবীর তাবৎ শিল্পের মোটিভ জনগণের পক্ষের নয়। আবার কত ও কী কীভাবে জনগণের শিল্প হতে পারে সে বিষয়েও সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিল্প-দর্শন চর্চা একটা চলমান প্রক্রিয়া। শিল্প-দর্শন একদিকে যেমন স্বাধীন, অন্যদিকে চলমান ও গতিশীল। শিল্প-দর্শন কোনো সরলরেখা বা একরৈখিক রেল লাইনের মতোও নয়। তাই টলস্টয় সমাধান দিয়েছেন এভাবে : 'জীবনশিল্পই সর্বোচ্চ শিল্প।'

প্লেখানভ সমাজের কাঠামোর ভেতরে শিল্পকর্মের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন, 'সমাজের কাঠামোর সঙ্গে একটি শিল্পকর্ম অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় যুক্ত।' প্লেখানভ ঘটনার আরও গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, একটি শিল্প শ্রেণীমনস্তত্ত্বকে কিভাবে প্রকৃতপক্ষে মানবমস্তিষ্কে প্রতিফলিত করে। প্লেখানভের মতে, 'একটি শিল্পকর্ম, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সর্বদা লেখকের শ্রেণীমনস্তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে। এ বিষয়টি মাওসেতুং আরও সরলীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্প কী আচরণ করে। মাওসেতুং বলেন, সাহিত্য ও শিল্পকলা হল মানবমস্তিষ্কে বিশেষ সমাজজীবনের প্রতিফলনের ফসল। ...সমাজজীবন সব সময় সাহিত্য ও শিল্পের জন্যে কাঁচামালের খনিস্বরূপ...'। হোরেস-এর ভাষায় সাহিত্য হল : 'সাহিত্য একদিকে যেমন আনন্দ দেয়, অন্যদিকে তেমনি দেয় শিক্ষা।' একবার লেনিন বলেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন সমাজবিকাশের নিয়মগুলোর পর্যাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে 'দরকারি স্বপ্ন দেখার' জরুরি প্রয়োজন রয়েছে...' তিনি আরও বলেছিলেন, শিল্পবিজ্ঞানসহ সকল কর্মক্ষেত্রে স্বপ্ন চাই...'

ক্লারা সেৎকিন 'আমার স্মৃতিতে লেনিন'-এ বলেছিলেন, শিল্প কিভাবে বাজারের জন্য সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিমালিকানার সমাজ তাকে কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে ব্যাবহার করে তার স্বরূপ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন : 'ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর যে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত, শিল্পী সেখানে শিল্প সৃষ্টি করে বাজারের জন্য, ক্রেতার প্রয়োজনে।' লেনিন নিজের ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে জনগণের কাছে ফিরে গেছেন। জনগণের ভাবনা সবচেয়ে মূল্যবান সেটা তিনি অকপটে স্বীকার করে নিয়ে তাদের ভাবনার জরুরি গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শিল্প সম্বন্ধে আমরা কী ভাবছি সেটা বড় জিনিস নয়। কোটি কোটি জনগণের মধ্যে

কয়েক শ' অথবা এমনকি কয়েক হাজার মানুষ শিল্প থেকে কী পেল সেটাও জরুরি নয়। শিল্প জনগণের সম্পদ। ব্যাপকতম মেহনতী জনের ঠিক গভীরেই তার শিকড় যাওয়া দরকার।" এখন আর শিল্প রাজকীয় ব্যাপার নয়, এ জনগণের বিষয়ই কেবল নয়, জনগণের সম্পদও বটে। লেনিন-এর ভাষায় বলা যায় : 'শিল্প যাতে জনগণের নিকটতর হয় এবং জনগণ যাতে নিকটতর হয় শিল্পের'...। ফ্রয়েড মন সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেখিয়েছেন, মন তবু ভাগ করা যায়। তবে তাঁর ভাষায়, '...মন এমন জিনিস নয় যাকে ছুরি দিয়ে আপেল কাটার মতো ভাগ করা যায়।' কিন্তু শিল্প ও জনগণকে ভাগ করা একেবারে অসম্ভব। এ দুটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক, আবার সম্পূরকও বটে।

শিল্প-দর্শনকে নানা আঁকাবাঁকা পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। জল যেমন নিচু পথে গড়ায়, আলো যেমন অন্ধকারকে ছাপিয়ে যায়, তেমনি শিল্প-দর্শনও জনগণ ছাড়া অচল, বাকরুদ্ধ। ফলে শিল্প-দর্শন যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাকে সমাজের বাস্তব নির্মম সত্য ফাঁস করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রতি মুহূর্তে নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয়ে অসত্যকে মোকাবিলা করতে হয়।

শিল্পে ভাবনার তাড়না

অমিতা চক্রবর্তী

ভারতীয় গণসঙ্গীত শিল্পী অজিত পাণ্ডে'-র সেই গানটার কথা মনে আছে ? ওই যে যে গানটায় উনি বারবার কিছু বিবরণ শেষে একই কথা বলছেন-'তার পদ্য না লেখাই ভালো, তার পদ্য না লেখাই ভালো'। বিবরণগুলো ছিল এরকম উনি একজন কবি'র দিনযাপন বর্ণনা করছেন যেখানে কবি ঠিক সময়ে অফিস করেন, অফিস শেষে বাজার করেন, বাজার শেষে সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন... অতএব তার এখন আর পদ্য না লেখাই ভালো। উল্লেখ্য আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতাম সেই সময়ে এই গানটার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। এখন আমার অর্থ উপার্জনসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে (সামাজিক বলুন আর সাংসারিক বলুন) অনেকখানি ব্যস্ত থাকতে

হয়। এই সময়ে 'শিল্পের দর্শন' নিয়ে ভাবতে চাইলে বারবার ওই গানটার কথা মনে হয়, কিন্তু না, আমি ওই গানের প্রতি এখন আর কোনো প্রকার সমর্থনই দিতে পারছি না। জীবন, জীবনের লড়াই, কঠিন সংগ্রামের সাথে দারুণ শ্রেণীবৈষম্যের এই সমাজের সমপর্ব কেউ জীবন-যাপন অনুভব করেন, কেউ সুবিধাভোগী শ্রেণীভুক্ত হয়েও একধরনের সহমর্মিতার অনুভূতিতে দেখার চেষ্টা করেন, কেউ ঐতিহাসিক সমাজবাস্তবতার নিবিড় পাঠক, বিশ্লেষক হয়ে বর্তমানের সময়কে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। অতঃপর যারা এই অভিজ্ঞান থেকে শিল্প সৃষ্টি করেন আমরা তাদের শিল্পের দর্শন বা অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বাহ্‌বা দেই, সমালোচনা করি, আলোচনাও করি। সবকিছু ছাপিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয় শিল্পের দায়বদ্ধতা। যে শিল্পের কোনো দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা নেই সেই শিল্পের দর্শন যেমন অবচেতন বা সচেতন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারবে না, তেমনি সেই দর্শন বিদ্যমান পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোকে কোনো না কোনো প্রকারে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে বাধ্য। অতএব শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর দায়বদ্ধতা এবং শিল্পীর সমাজচেতনা অনিবার্য।

ঋত্বিক ঘটকের কথা মনে পড়ল। কোনো-এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, রাজনীতির সকল ধরনের অনুষঙ্গ উপাদান– বক্তৃতা, গণসঙ্গীত, পথনাটক সকল কিছুকে একসঙ্গে চলচ্চিত্রে ধারণ করা যায়, তাই উনি চলচ্চিত্রকার হয়েছেন। শুনতে যতই রূঢ় শোনাক, শিল্পীর রসবোধের সঙ্গে ঠিক এইরকম রাজনৈতিক চেতনা ছাড়া এবং এইরকম দায়িত্ববোধ ছাড়া যে কোনো শিল্পই অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়ে পড়বে। আর দর্শন? সকল শিল্পেরই দর্শন থাকে তা সে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের হাতিয়ার হোক বা পুঁজিবাদী সমাজের প্রকাশ-বিকাশই হোক। দর্শনহীন ব্যক্তি যেমন নেই, দর্শনহীন শিল্পও তাই হওয়া সম্ভব নয়। আলোকপাত করার বিষয় সেই দর্শনের দায়িত্ব কী আর দায়বদ্ধতা কিসের জন্য।

একটা কথা না বলে পারছি না, এক ধরনের শিল্পী আছেন যারা সমাজ বদলের দর্শনকে ফেরি করে বাণিজ্য করেন, নাম কামান, 'লিবারেল ডেমোক্রেট' হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ববান করতে চান। যে কোনো আন্দোলন, সংগ্রাম, বিপ্লবীদের এমন 'বিষয়ভিত্তিক' (ঝঁনলবপঃরাব) উপস্থাপনা করেন, যেন সেই আন্দোলন, সেই বিপ্লবী সমাজবিকাশের কোন অনিবার্য ঘটনার মধ্য থেকে আসেনি, দৈবিক নায়কোচিত এবং ব্যতিক্রম (বীঃৎধ-ড়ৎফরহধৎু) কোনো উদাহরণ। ফলে এই সকল শিক্ষা গণমানুষের মধ্যে নায়কোচিত বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করলেও, নিজেকে ওই একই সমাজের অংশ হিসেবে শিল্পের দর্শক-পাঠক হিসেবে নিজেদের কখনোই ভাবতে পারেন না। বলাই বাহুল্য এই ধরনের শিল্পের দায়বদ্ধতা কোন দিক নির্দেশ করেন।

আমার খুব প্রিয় একটি কবিতার কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে কথা শেষ করতে চাই–

একজন কিশোর ছিল একেবারে একা
ক্রমে একজন বন্ধু হল তার
দুয়ে মিলে একদিন গেল কারাগার
গিয়ে দেখে তারাই তো কয়েক হাজার।
(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

পাঠক, আসুন, বিন্দু থেকে বিশালতার অনুভূতি এক জীবনে ধারণ করি।

শিল্প-ভাবনা: অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামোর নিরিখে

অ প র্ণা হা ও লা দা র

শিল্প-ভাবনা নিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যে আঘাতের শাবল কম চালানো হয়নি। তার কিয়দংশও মনোযোগ পায়নি শিল্পী-মনস্তত্ত্বের প্ল্যাটফর্ম। কোন্ বাস্তব অবস্থাকে সামাল দিতে গিয়ে কোনও একটি আর্টিস্ট-মন কোন্ দিকে আকৃষ্ট হয়; শিল্পের সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনার সআন্তরালে বিপ্লবী দর্শন আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কেন শিল্প-সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি কর্পোরেট বাণিজ্যের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে স্বকীয়তা হারাচ্ছে?

সূক্ষ্ম গবেষণা না করেও চলমান তথ্য স্বীকার করে নিতে প্রেরণা যোগায় যে, শিল্প-ভাবনার শিকড় নিহিত শিল্পস্রষ্টার সামাজিক বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিক চাপ, তার সমাজ-কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক– সর্বোপরি রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে। সবাই ণিল্পী হয় না; কেউ কেউ ণিল্পী। কিন্তু এই 'কেউ কেউ' তো বহিরাগত আগন্তুক কেউ নয়। আর তাকেও তো চিন্তা করতে হয় চাল-ডাল-নুনের দরদাম। প্রাথমিক ঝোঁক কেটে যাওয়ার পর তাই এটা স্বাভাবিক যে, সে তার উদীয়মান প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভাকে আর দশজনের ন'টা-পাঁচটা চাকরির মতোই প্রচল স্রোতে প্রবাহিত হতে হয়, যা থেকে বিরত থাকা কঠিনই বটে।

এর অর্থ এই নয় যে, শিল্পকে নির্দিষ্ট ছকে নিয়ে আসা সম্ভব কিংবা শিল্পীর জন্য ব্যাকরণ বই তৈরি করা সম্ভব। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, শুধুমাত্র বিনোদন ম্যাগাজিনের পরিপূরক হওয়াই কি শিল্পের উদ্দেশ্য? এবং সেটা মেনে কি মৌন থাকা উচিত? তা'হলে কি শিল্প হবে যেমন খুশি তেমন করো এমন দুর্বোধ্য? দায়বদ্ধতার কোনও জায়গা থাকবে না লেখক-কবি-শিল্পী-চলচ্চিত্রকারের? সস্তা, বস্তাপচা উপন্যাস, কবিতা, চিত্র, নাটক, সিনেমা জন্ম দেওয়াই শিল্পের ভবিতব্য?

অবশ্য আমি এই সার্বিক অধঃপতনকে একেবারেই স্বাভাবিক বলতে চাই। কিন্তু এই নষ্ট স্রোত যে অন্যান্য সকল স্খলনেরই পার্শ্ব-প্রতিফলন সেটাই তুলে ধরতে চাই। দোষ কেবল শিল্পীর ঘাড়ে চাপাতে চাই না; বরং দোষ সেই পরিবেশের যা লেখকসত্তাকে এইসবের-ই রসদ যোগাচ্ছে। যিনি লিখছেন বা যিনি ছবি আঁকছেন বা নাটক বানাচ্ছেন তিনিও এই প্রজন্মের আর সবার মতো; তাহলে অন্যান্যরা যদি কোনওভাবে একটি বি.বি.এ. ডিগ্রি যোগাড় করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কেরানি হওয়াকে জীবনের চরম ও পরম পাওয়া মনে করেন; উদ্দেশ্যহীন লেখার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীকে নিছক আনন্দ দিয়ে তিনিই-বা জীবনকে স্বচ্ছন্দ করতে চাইবেন না কেন? বাজার অর্থনীতির এই চূড়ান্ত বিকাশের যুগে লেখক হলেই কেউ ছেঁড়া পাঞ্জাবি, চটের ব্যাগ নিয়ে চলবে– পাঠক হিসেবে এই আকাঙ্ক্ষাও আমার দৃষ্টিতে এক ধরনের স্বার্থপরতা।

প্রকৃত চিত্রটি সাধারণত এরকম–মফস্বল থেকে নতুন ঢাকায় এসে একটু কাব্য করা ছেলে-মেয়েগুলো ভিড়ে যায় পোগোদের দলে; লেখকসত্তার উন্নতির চেয়ে হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার লোভটাই প্রাধান্য পায় এবং নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে লিটল ম্যাগ বের করে। তাতে শিল্প-সাহিত্য কোথায় থাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হলেও, প্রথম পাতায় সম্পাদক-এর নাম তো জ্বলজ্বল করেই। অনেকটা অভিনয়ের অ-আ না জেনে নাটক সিনেমা করার মতো। আবার এখন লেখকদের সিনিয়র অভিভাবক-গোষ্ঠীও আগেকার দিনের মতো তৎপর না; যাঁরা আসলেই সাহিত্যের সমঝদার, তাদেরকে বাইরে রেখে তরুণ লেখকদের গুরু হয়ে যাচ্ছেন এক ধরনের ধান্দাবাজরা। এই পুরো চিত্রটাই পরিস্থিতির শিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর দুর্বলতার ফলাফল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম নেয়ার যুগ হয়তো শেষ। কারণ সে যুগেও সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব ও Cold War-এর বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁদেরকে পরিচালিত করেছিল শ্রমিককূলের জন্য কলম ধরতে। তাঁরা তাঁদের পরিবেশ থেকেই পেয়েছিলেন উপজীব্য। ম্যাক্সিম গোর্কি বা টলস্টয়ও এখন রাশিয়াতে আর জন্মাচ্ছেন না। আবার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা না দেখলে সুকান্তও হয়তো মনোনিবেশ করতেন কোনও একটি নারীর চুলের সৌন্দর্য বর্ণনায়। এখন বাস্তব জীবনের সাথে পাল্লা দিয়ে লেখকসত্তাকে নৈতিকতা ও সময়ের বিপরীত স্রোতে যুদ্ধরত সাহসী সৈনিক করে গড়ে তোলা কঠিন বললে কমই বলা হবে। সাফল্যের তথাকথিত সংজ্ঞাকে

উপেক্ষা করেও কেবলমাত্র ন্যূনতম চাহিদাগুলো মেটাতে চাইলেও নিজেকে জমা রাখতে হয় আদর্শহীনতার একাউন্টে। শিল্প-ভাবনা কুলুঙ্গিতে তুলে শিল্পীর কলম, তুলি বা ক্যামেরা তখন ছুটে যায় যুগের হাওয়ার সাথে। অর্থাৎ, সমাজ কাঠামোর এই দুর্বল ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে; যেখানে এক পাশে বসুন্ধরা সিটি অন্য পাশে বস্তির আবর্জনা; তাল গাছের মতো একপায়ে একা লড়াই করা অর্থনীতির ভাষাতেই Rational Decision নয়। দায়বদ্ধতার জায়গায় আবদ্ধ থাকাকে একজন দূর থেকে বাহ্বা দিতেই পারে, আমিও পারি– কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছি নিজের বেলায় খুঁজে বেড়াই একটি চটকদার চাকরি যেখানে তোষামোদীই দৈনন্দিন রুটিন।

শিল্প-সাহিত্য এবং সৃষ্টিশীল অন্যান্য যে কোনো শাখার লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার যাবতীয় প্রবণতার পেছনে অন্যতম কারণ সমাজ ও ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার অসম সম্পর্ক। গতিশীল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যভিত্তিক উচ্চপ্রবৃদ্ধিনির্ভর অর্থনীতির যুগে শিল্পকে তার মূল্যমানে নির্দিষ্ট সূচকে টিকিয়ে রাখতে হলে সিস্টেমের বাইরে থেকে কাউকে তা এগিয়ে দিতে হবে। শ্রেণীসংঘাত ও সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতার মাপকাঠিকে যথাসাধ্য পরিবর্তন করাটা বাজার অর্থনীতির কাজ নয়। এই কাজটি করতে হলে Adam Smith-এর বিখ্যাত Laisser Faire-এর বৃত্তকে অবজ্ঞা করে যেতেই হবে। এক্ষেত্রে Welfare State-এর ভূমিকাই মুখ্য। কেউ সহায়তা না করলে, অর্থচিন্তা মাথায় নিয়ে এখন আর 'পদ্মা নদীর মাঝি' তৈরি সম্ভব নয়। এখন, demand itself makes it's supply. যদি সার্বিকভাবে পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা হয় অর্থহীন, কাহিনীহীন ৪০ পৃষ্ঠার সাদামাটা উৎস-বহির্ভূত এবং উপসংহার-ব্যতীত উপন্যাস; তবে প্রকৃত ভাবধারার সত্যিকার লেখকেরা মুষড়ে পড়বেনই, যদিও তাঁদের লেখনী অবশ্য সেজন্য বিদ্রোহ করবে। জানি, মানুষ অনুপ্রাণিত হয় মহান লেখকদের দেখে। আর আজকের পাঠকের চোখে, মহান লেখক মানিক, কমল বা গোর্কী নন, ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ুন আহমেদ বা বিল ক্লিনটন। পৃথিবীর শিল্প-অঙ্গনের ওঠানামার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যায়, বিশ্বজুড়ে যে, মোসাহেবী লেখক সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ, এই কর্পোরেট জগতের আস্ফালন। তবে এ স্রোত রোধ করা কঠিন নয় হয়তো সম্ভব-ও। কারণ মানুষ এর বিষক্রিয়া থেকে একদিন মুক্তি চাইবেই; সেই প্রক্রিয়া ইনজেনারেলি শুরুও হতে আর বেশি সময় হয়তো লাগবে না।